কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি



সম্পাদনা

কিরীটি মাহাত • বিশ্বনাথ মাহাত

বাংলার পশ্চিম সীমান্ত, উত্তর উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ডের বৃহত্তর অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রমুখ জনগোষ্ঠী হল কুড়মি। যারা এই অঞ্চলে কুড়মি-মাহাত নামেও পরিচিত। একটি সংস্কৃতিপ্রাণ প্রাচীন কৃষিজীবি সম্প্রদায় হিসেবে এই জাতি আজ সকলের কাছে সম্মানের পাত্র। এই অঞ্চলের অন্যান্য জনজাতিগোষ্ঠী যথাঃ- সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো, খেড়িয়া, শবর, ভূমিজ আদি জনজাতিগুলির সঙ্গে এই জাতি খেরওয়াড় জাতিসংঘের এক অন্যতম সদস্য।

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা
কিরীটি মাহাত
বিশ্বনাথ মাহাত

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি

উৎসর্গ

রেখা মাহাত-র স্মৃতিতে

— সূচীপত্র —

জাতি

ভাষা

সংস্কৃতি

প্রস্তাবনা

বাংলার পশ্চিম সীমান্ত, উত্তর উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ডের বৃহত্তর অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রমুখ জনগোষ্ঠী হল কুড়মি। যারা এই অঞ্চলে কুড়মি-মাহাত নামেও পরিচিত। একটি সংস্কৃতিপ্রাণ প্রাচীন কৃষিজীবি সম্প্রদায় হিসেবে এই জাতি আজ সকলের কাছে সম্মানের পাত্র। এই অঞ্চলের অন্যান্য জনজাতিগোষ্ঠী যথাঃ- সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো, খেড়িয়া, শবর, ভূমিজ আদি জনজাতিগুলির সঙ্গে এই জাতি খেরওয়াড় জাতিসংঘের এক অন্যতম সদস্য। এই অঞ্চলে খেরওয়াড় জাতিগুলি হাজার হাজার বৎসরকাল ধরে বসবাস করে আসছে। অন্যান্য জনজাতিগুলির মতোই কুড়মি জাতিরও রয়েছে আপন ধর্ম, নেগাচার, ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি যা অবিভক্ত খেরওয়াল সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুড়মি জাতি আজও তার নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ও আত্মপরিচয়ের সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। এই জাতির কোন প্রামাণ্য ইতিহাস লিখিত হয়নি আজও। ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। যদিও এই জনগোষ্ঠীর কয়েকজন বিদগ্ধ পন্ডিত এই বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ও বিষয়টি অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। যাঁদের অন্যতম হলেন- ড. বঙ্কিম মাহাত, ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাত, ড. বিনয় মাহাত, ড. বিনয় মাহাতা, ড. বীণাপানি মাহাত, ড. শশীভূষণ মাহাত, ড. আদিকান্ড মহন্ত, লক্ষীকান্ত মুতরুআর, বসন্ত মেহতা, গিরিশচন্দ্র মহন্ত, আনন্দ খুঁটদার, অনন্ত কেসরিআর, ক্ষুদিরাম মাহাত, রাধাগোবিন্দ মাহাত ও পদ্মলোচন মাহাত প্রমূখ।

কিন্তু সমুদ্রতুল্য কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির নিরিখে সে কাজগুলিকে অতি সামান্য বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের এই সংকলনের প্রয়াস সেই পারাবারের দিক নির্ণয়ের আরেকটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। যাঁরা এতে তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়ে গ্রন্থটিকে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রয়াস ও নিবিড় গবেষণাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না। তবে সংকলনের সকল প্রবন্ধই রসোত্তীর্ণ বা ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে এমনও দাবী করা যায় না। এই গ্রন্থের পরিকল্পনাটি ছিল দীর্ঘদিনেরই। কিন্তু আর্থিক কারণেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেকোন শুভ প্রচেষ্টা চিরদিন আটকে থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই শুভকাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় বিশ্বনাথ মাহাত মহাশয়। গ্রন্থটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার উভয় দায়িত্বভার নেওয়ায় 'মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি'-র পক্ষ থেকে তাঁকে সহস্র অভিনন্দন রইল। গ্রন্থটি বর্ণ সংস্থাপন থেকে ছাপা ও বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা বুদ্ধেশ্বর মাহাত, সাধন মাহাত, শিবু মাহাত, ললিত মাহাত প্রত্যেকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা। প্রচ্ছদ শিল্পী পার্থপ্রতীম দাসকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক, গবেষক ও বিবুদ্ধ জনের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক বলে মনে করব।

সম্পাদক
কিরীটি মাহাত
বিশ্বনাথ মাহাত

জাতি

শিখরভূমের কুড়মি জাতির ইতিবৃত্ত ও বিবর্তনের ধারা

কৃষ্ণপদ মাহাত

প্রাক্-আর্য ভারতের ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ পুরাণ, প্রভৃতিতে পূর্বকালের যা কিছু পাওয়া যায়, তা থেকেই অনুমান করে নানা ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ ও প্রচার করেন।

কুড়মি জাতির উৎপত্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জীবন যাত্রা প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনদর্শন,তথা ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধেও পন্ডিতদের মধ্যে বেশ কিছু মতদ্বৈধতা দেখা যায়। ভারতের ইতিহাসের যবনিকা যেদিন উঠলো, সেদিন দেখা গেল ভারতের রঙ্গমঞ্চ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। একেবারে আদিম স্তর থেকে শুরু করে সভ্যতার উঁচুস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যত্রতত্র। এদের আকৃতি প্রকৃতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, ভাব ভাষা, ধর্ম, ইত্যাদি নানা বিষয় বিচার করে পন্ডিতেরা এদের ছয়টি শ্রেণিতে বা জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন।

(১) নেগ্রিটো, (২) প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড বা আদি অষ্ট্রেলিয়, (৩) প্রোটো দ্রাবিড় বা আদি দ্রাবিড়, (৪) আলপাইন বা ইন্ডো আলপাইন, (৫) প্রোটো নার্ডিক, (৬) মঙ্গোলীয় বা ভোট চীন। ভাষার বিচারে আবার এদের অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য এবং ভোটচীন এই চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ সকলেই এই ছয় শ্রেণির কোন না কোন একটির অন্তর্গত। বর্তমানে এই অঞ্চলের কুড়মি সম্প্রদায়টিকে প্রায় সকলেই আদি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বলে স্বীকার করেন। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেবল আর্য নয়, আর্যেতর জনগণেরও দান প্রভূত। কেউ কেউ অনুমান করেন ধর্মের ক্ষেত্রে শিব, দেবী, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবতাদের ভাব ও রূপ গঠনে আর্যেতর কল্পনা প্রচুর উপাদান যুগিয়েছে। পূজার উপকরণ, যেমন নারকেল, পান সুপারি, এইসব এদেরই। যোগ-সাধনা, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদও এদেরই। ভারতের নানাস্থানের এয়োরা মাথায় সিঁদুর পরেন, বিয়ে প্রভৃতি

ব্যাপারে সিঁদুর ও হলুদ মঙ্গল বলে পরিগণিত হয়, এসব আর্যেতর লোকদেরই দান। এছাড়া ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী নানা বস্তু ও শিল্প দ্রব্য এদেরই সৃষ্টি। এমনকি ভারতবাসীর সাধারণ পরিধেয় ধুতি ও শাড়ি আর্যেতর লোকদের কাছ থেকে পাওয়া।

এই অঞ্চলের কুড়মি জাতির উৎস, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা প্রণালী ও বিবর্তন সম্বন্ধে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে আংশিক সত্য থাকলেও পরিপূর্ণ সত্যতা পাওয়া যায় না।

E.T. Daltan এর মতে কুড়মি সম্প্রদায় আর্য-বংশোদ্ভূত, কিন্তু জর্জ গ্রীয়ারসন তাঁর লিখিত Linguistic Survey of India নামক গ্রন্থে ছোটনাগপুরের কুড়মিকে Aboriginal অর্থাৎ আদিম অধিবাসী এবং দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেন। আবার H.H. Risely বাংলাদেশের জাতিগুলি রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সামাজিক প্রথা প্রভৃতির অধ্যয়ন করেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যথাযথ রূপে বিচার বিবেচনা করে জাতিগুলির পরিচিতি নিরুপনের জন্য ভারত ও বাংলা সরকার কর্ত্তৃক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হন। তিনি দুই বছর ধরে উক্ত কার্য্য যথাযথভাবে অনুসন্ধান করে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- "Tribe and Caste of Bengal" প্রকাশ করেন এবং এই অঞ্চলের কুড়মি জাতির রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথাগুলিকে বিশেষ রুপে অধ্যয়ন ও বিচার করে এবং Anthropometical অর্থাৎ কুড়মি জাতির শারীরিক অবয়বের মাপ জোক দ্বারা প্রমাণিত করেন যে কুড়মি জাতি একটি Aboriginal Tribe বা উপজাতি সম্প্রদায়।

উদয় নারায়ণ তেওয়ারী তাঁর গ্রন্থ "ভোজপুরিয়া ভাষা আউর সাহিত্য"তে কুড়মি সম্প্রদায়কে অনার্য ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী এবং তাদের ভাষাকে "কুড়মালি" বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রসীত কুমার রায় চৌধুরী তাঁর "বঙ্গ সংস্কৃতি কথা" পুস্তকে লিখেছেন "পুরুলিয়া অঞ্চলটি স্মরণাতীত কাল থেকে অনার্য মানুষের বাসভূমি ছিল এবং মুন্ডা, কুড়মি, ভূমিজ, হো, ওরাং, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা আজও জেলাটিতে যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করছে।"

শান্তি সিংহ শারদীয়া উদ্বোধন-১৪১২, রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের বাংলা মাসিক পত্রিকার ৫২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—শাল, পলাশ, মহুয়া, অর্জুন, তাল, খেজুর, প্রভৃতির অরণ্য শোভিত এই প্রান্তিক বাংলায় (পুরুলিয়া) কোল, হো, মাহলি, সাঁওতাল, কোড়া, প্রভৃতি আদি অষ্ট্রাল (Proto-Astroloid) এবং ওরাং , বীরহোড়,মুন্ডা, ভূমিজ, কুড়মি প্রমুখ দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের বাস। আদি অষ্ট্রাল গোষ্ঠীর মানুষ তাদের আদি অস্ট্রিক ভাষা অনেকখানি ধরে রাখলেও, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ আর্যভাষার প্রভাবে

সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দিকে ঝুঁকেছে। আনাড়া, দুবড়া,পাড়া,ঝাঁপড়া, লৌলাড়া, হুটমুড়া, হাতুয়াড়া, পোদনাড়া, সুকলাড়া প্রভৃতি গ্রামে "ড়া" প্রত্যয়ান্ত নামে অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্যনীয়। কিন্তু লাঙল, দুর্বা, পান,সুপারি, ধান, কলা, হলুদ প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক মাঙ্গলিক শব্দাদি প্রাক্ আর্য দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সংস্কৃত ও বাংলায় এসেছে। ওরাংদের চন্ডি দেবতার সাথে হিন্দুদের চন্ডিদেবী এবং দ্রাবিড় ভাষীদের শিবম আর্য দেবতা রুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে।

এইরূপ আরও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ , সমাজতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিক, মানববিজ্ঞানী ও সরকারি অধিকারীবর্গের অভিমত অনুসারে এই অঞ্চলের কুড়মি জাতি একটি উপজাতি এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত হলেও বর্তমান পশ্চিম বাংলা কর্ত্তৃক নানা প্রকার সংগ্রাম ও মামলা মোকদ্দমার পর ১৩/৭/৯৪ তারিখে O.B.C. অর্থাৎ পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে, উপজাতি বলে নয়।

এইভাবে কুড়মি সম্প্রদায়টি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন ঠিক সেইরূপ ভাবেই কুড়মি নামটির উৎস ও উৎপত্তি সম্বন্ধে "কুড়মি" শব্দের নানারূপ অর্থ ও তার বুৎপত্তি করে নানা মত প্রচার করেন যার কোনটিই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি আজও।

ডঃ বিদ্যাধর মহাজনের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়-বেদ ও আবেস্তার ধারণানুসারে প্রাচীন যুগের জাতিগুলির নাম, এলাকা বা দেশের নামানুসারেই হত, এবং কোন দেশ, এলাকা বা অঞ্চলের নামগুলি নিকটবর্তী পাহাড়, পর্বত বা নদীগুলির নামানুসারেই চিহ্নিত হত যেমন—কাবুল, গান্ধার, সিন্ধু প্রভৃতি। বর্তমানেও হিমালয়ের নামে হিমাচল প্রদেশ, সিন্ধু নামে সিন্ধুপ্রদেশ, গোদাবরী নদীর নামে গদাবরী জেলা, হুগলি নদীর নামে হুগলী জেলা। আবার স্থান বা দেশের নামানুসারেই অধিবাসীদের নামকরণ পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে - যেমন বাংলার অধিবাসী বাঙ্গালী, বিহারের বিহারী, মারাঠার মারাঠী ইত্যাদি। সেইরূপ কুরুম দেশের অধিবাসী কুড়মি। সিন্ধু নদীর পশ্চিম সীমান্তের উপনদী কুরুম তীরবর্ত্তী কুরুম অঞ্চলের হদিশ মিলে। চীন পরিব্রাজক হিউএন স্যাঙের লেখনি থেকে। বর্ত্তমানেও আফগানিস্তানে কুরম পাহাড়, কুরম নদী ও কুরম অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া যায়। অমৃত বাজার পত্রিকায় ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংবাদও বেরিয়েছিল - Islamabad, Dec. 3, 1986 (P.T.I) Thirteen people including seven afgan refugees were killed last week and in the autonomous tribal region of Kurram on the Pak-Afgan borders. The incident happened in Zara village (অর্থ) আফগান সীমান্তে গত সপ্তাহে ১৩

জন ব্যক্তিকে যার মধ্যে ৭ জন আফগান উদ্বাস্তু গুলি করে মারা হয়েছিল কুরম নামক স্বায়ত্ব শাসিত উপজাতি অধ্যুষিত কুরুম রাজ্যের জারা নামক গ্রামে। আবার ২০০১ সালের ২রা ডিসেম্বর দিল্লী থেকে বাংলা সংবাদে প্রচারিত হয়েছিল - আফগানিস্তানের কুরম প্রদেশের কুরম পর্বতমালায় কুরুম উপজাতিদের মধ্যে সম্ভবত "ওসামা বিন লাদেন" অবস্থান করছেন। মানভূমের প্রাচীন করম গীতের মধ্যেও কুরুম নদী ও কুরম পাহাড়ের উল্লেখ মিলে।

"কনে রে করম গুঁসাঞ আনলঅ নেউতি
কনে রে কুরুম নদিক ধারেঁ করলঅ খেতি"।

এইসব তথ্যের নিরিখে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে কোন এক সময়ে সেই প্রাক ঐতিহাসিক যুগে ঐ কুরম অঞ্চলে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার ন্যায় কৃষিকার্য্যে উন্নত কুরুম নামে সিন্ধু সভ্যতারই কোন এক উপজাতি রাজ্য ছিল। সেই প্রাকঐতিহাসিক যুগেই ঐ কুরুম অঞ্চলের কয়েকটি শান্তিকামী উন্নত কৃষক গোষ্ঠী আর্যদের অত্যাচারে বা অন্য কোন বহিরাগত দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী মানুষের আক্রমণে তথা নৃশংস হত্যাকান্ডে ও বিভিন্ন অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত ও জর্জরিত হয়ে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জমির উর্বরতা শক্তি কমে গেলে বা কৃষি ও গোচারণভূমির অভাব হলে নিজেদের আশ্রয় ও জীবিকার প্রয়োজনে কৃষি ও গোচারণ উপযোগী জমির সন্ধানে পূর্ব ও পূর্ব দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হতে ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে মধ্য প্রদেশের নাগপুর হয়ে হিংস্র জন্তু ও শ্বাপদ সংকুল ভরা জঙ্গলে পরিপূর্ণ পশিচম রাঢ়ের সমেতগিরি অঞ্চলে এসে কৃষি ও গোচারণ উপযোগী ভূমির প্রাচুর্য্য দেখে জঙ্গল পরিস্কার করে, কৃষি ও বসোপযোগী জমি তৈরী এবং গ্রাম পত্তন করে বসবাস শুরু করে এবং বংশ বিস্তারের সাথে সাথে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। কুড়মিদের এই অঞ্চলে আগমণের সময়কাল আনুমানিক এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। পরবর্তীকালে জৈন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে, তারা কষ্টার্জিত এই মালভূমিও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আমিষ ভোজী এবং দেব পূজায় পশুবলীকারী এই জনগোষ্ঠীটির সঙ্গে জৈনদের নানা প্রকার আদর্শগত বিরোধ দেখা দেয় তাদের ধর্মসম্বন্ধে তারা এতদূর রক্ষণশীল ছিল যে, ঐ সমস্ত ধর্ম প্রচারকদের পিছনে তারা কুকুর লেলিয়ে দিত, তা জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রেই বর্ণিত আছে। যাঁরা জৈন ধর্ম গ্রহণ করে প্রচারকের কাজে লেগে যান, সেই সব মানুষদেরই উত্তর পুরুষ এই অঞ্চলের বর্ত্তমান সরাক সম্প্রদায়।

পার্শ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ ঐ সমেতগিরির উপরে নির্মিত করে পর্বতটির নামকরণ করা হয় পার্শ্বনাথ-পর্বত, যা পরে পরেশনাথ পাহাড়ে রূপান্তরিত

হয়। কুর্মি গোষ্ঠিটি কিন্তু তাদের রীতি অনুযায়ী ঐ পাহাড়ের উপরে পশু বলি দিয়ে পাহাড়টির এবং তাদের অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করত পূর্ব থেকেই, এতে জৈনদের সাথে তাদের আদর্শগত বিভেদ চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠলে তাদের মূল স্রোতটি ঐ পাহাড় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ক্যান্টিসার নদী (বর্ত্তমান নাম দামোদর পার হয়ে জনবসতি শূন্য পাহাড় পর্বতে ঝরনাতে পরিপূর্ণ এবং হিংস্র জীবজন্তু ও শ্বাপদ সংকুল পূর্ণ ঘন জঙ্গলে বেষ্টিত আর এক অঞ্চলে এসে কৃষি ও গোচারণ উপযোগী ভূমির প্রাচুর্য্য দেখে জঙ্গল পরিষ্কার এবং কৃষি ও বাসোপযোগী জমি তৈরী এবং গ্রাম পত্তন করে বসবাস করতে শুরু করে। অঞ্চলটির নামকরণ হয় ঝাড়দা, কারণ জঙ্গল ও জলের প্রাচুর্য্য ছিল যথেষ্ট (ঝাড় অর্থ জঙ্গল, দা অর্থ ভয়) এই স্থানের আগমণের সময়কাল আনুমানিক ৬/৭ শত খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দ।

ঐ সময়ে ঐ স্থানের কিছু দূরে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মুণ্ডা গোষ্ঠীর লোকেদের প্রাধান্য ছিল পূর্ব থেকেই। ফলে কুড়মিদের সাথে সংঘর্ষ বাধে তাদের। মধ্যপ্রদেশ, নাগপুর, সমেতগিরি প্রভৃতি স্থান থেকে কোড়া, খন্দ, গোঁড় ও জৈনদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ায় জ্বালা ও স্মৃতি তখনও তাদের মনে ও প্রাণে পুরাতন ক্ষতের ন্যায় জ্বালা যন্ত্রণা দিচ্ছিল কাজেই তারা এই নতুন বসতি থেকে বিতাড়িত না হওয়ার জন্য এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধভাবে মুন্ডাদের ঠেকাবার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজেদের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমান শক্তিশালী, কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে নেতা-অর্থাৎ সর্দ্দার মনোনীত করে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে থাকে। মুন্ডাদের সাথে কুড়মিদের বেশ কিছুদিন সংঘর্ষ চললেও শেষ অবধি তারা পরস্পর পরস্পরের অবস্থানকে মেনে নিয়ে বন্ধু ভাবাপন্নভাবে প্রতিবেশীমূলক সহ অবস্থান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আরও এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইলু-জারগো গ্রামটি।

ধীরে ধীরে কুড়মিরাও বেশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে এবং কাঁসাই দামোদর নদীর উভয় তীরে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য স্থাপন করে কাঁসাই সভ্যতা নামে সিন্ধু সভ্যতারই স্মৃতি বহন করতে থাকে। তাদের মনোনীত সর্দারের বংশ বা গোত্র শিখরিয়ার এর নামানুসারে রাজ্যটির নামকরণ হয় শিখরভূমি এবং রাজ উপাধি হয় "শেখর"। তথ্যের নিরিখে অনুমান হয় রাজ্যটির উদ্ভব কাল মৌর্য্য রাজবংশের উদ্ভবের বেশ কিছু পূর্বেই। এর সমর্থনও মিলে, তরুণ দেব ভট্টাচার্য্য প্রণীত পুরুলিয়া গ্রন্থের ভূমিকার ৭ম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তথ্যটি থেকে। তিনি লিখেছেন- মানভূম জেলার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে ছোট বড় পাঁচটি রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল ঐতিহাসিক কালের বিভিন্ন পর্য্যায়ে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও পরিচিত ছিল শিখরভূম রাজ্যটি, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিনশো কি

চারশো বছর আগে রাজ্যটির উদ্ভবকাল হওয়া অসম্ভব নয়। শের গড় বা চৌরাশী পরগণা ঘিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অধিকার ক্ষেত্র।

মৌর্য্য সম্রাট বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক খ্রীঃ পূর্ব ২৭৩ অব্দে রাজা হন এবং খ্রীঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে শক্তিশালী স্বাধীন কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমন করে নিজ অধিকারে আনেন। অশোক নিকটবর্তী জঙ্গলে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তারের কোন প্রচেষ্টা করেন নাই বলেই প্রতীয়মান হয়। অশোকের মৃত্যুর ৩৭ বছরের মধ্যেই মগধ মৌর্য্যবংশের হাত ছাড়া হয় অন্তর্কলহের জন্য। ঐ সুযোগে কলিঙ্গ ও পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং চেদি বংশের রাজা খারবেল খ্রীঃপূঃ ১৬৩ অব্দে নিজেকে কলিঙ্গের স্বাধীন.রাজা বলে ঘোষনা করেন। রাজত্বের ৮ম বছরে মগধের রাজধানী রাজগির আক্রমন করে বহু ধনরত্নও লুন্ঠন করে নিয়ে যান এবং খ্রীঃপূঃ ১৪৩ অব্দে পুনরায় মগধ আক্রমন করে মগধ সহ কাঁসাই দামোদর নদের উভয় তীরস্থ রাজ্যগুলিসহ আর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রাজ্য জয় করে খারবেল এক বিরাট অঞ্চল তাঁর খাস প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনেন যা ত্রিকলিঙ্গ বা তেলেঙ্গানা নামে পরিচিত লাভ করে। পরবর্তীকালে এ রাজ্যটির ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়েই উদ্ভব হয় ভঞ্জ, ভৌম, উৎকল তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি রাজ্যের। মানভূমের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রাচীন ত্রিকলিঙ্গের ইতিহাস অনেকখানিই অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এই শিখরভূম রাজ্যটিও ঐ সময়ে খারবেলের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তদানিন্তন শিখরভূমির রাজারাই ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক। রাজ্য ও রাজধানীর নামকরন হয়েছিল তৈলকম্প বা তৈল কম্পন যা কালের প্রবাহে রূপান্তরিত হয় তেলকূপীতে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তৈল এক প্রকার শুল্ক বা কর। আবার দ্রাবিড় বা তামিল ভাষায় কম্প শব্দটির অর্থ বৃত্তিকর এবং কম্পন শব্দের অর্থ পরগণা বা রাজ্য। এর থেকে অনুমান হয় তৈলকম্প রাজ্যটি ছিল ত্রিকলিঙ্গকে শুল্ক প্রদানকারী একটি করদ বা সামন্তরাজ্য।

শিখরভূম রাজ্যটি প্রসার ও বিস্তারের সাথে সাথে রাজধানী কয়েকটি স্থানে স্থানান্তরিত হলেও শেষ অবধি এই রাজ্যের যে স্থানে মগধ বা পাটলীপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তগামী রাস্তাটি দামোদর নদ অতিক্রম করেছে সেই স্থানটিতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়, কারণ ঐ সময়ে রাস্তাটির গুরুত্বও ছিল যথেষ্ট, দেশরক্ষা ও আর্থিক উপায়ের উভয়ের ক্ষেত্রেই। প্রচুর পরিমাণে যানবাহন ঐ রাস্তাটি দিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি আমদানির জন্য যাতায়াত করত। তাম্রলিপ্ত ছিল পূর্বাঞ্চলের একমাত্র সমুদ্রবন্দর। কিংবদন্তি অনুসারে দামুদর শেখর ঐ সময়ে রাজ্যের সর্দার বা

রাজা ছিলেন। তাই ঐ স্থান ও নদীটিকে সাধারণ জনে দামুর দুয়ার বলে অভিহিত করত কারণ মোটা তোলা বা কর না দিয়ে নদীটি পার হওয়া যেত না। ঐ থেকে নাকি নদীটির নামকরণ হয় দামোদর, নদীটির পূর্বনাম ছিল কান্টিসার বা কালসোনা। ৫০ বছর পূর্বেও রাস্তাটির সম্পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল। আমরা নিজেরা পায়ে হেঁটে বা বিভিন্ন যানবাহনে তেলকূপির বারনীমেলা দেখতে যেতাম। বারনী স্নান করতে এই অঞ্চলের প্রচুর লোক যেত। পাঞ্চেৎ ড্যামে তেলকূপীর মন্দির নিমজ্জিত হওয়ার পর রাস্তাটির অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পায়। বেগলার সাহেব এই রাস্তা দিয়েই পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।

খারবেলের পর থেকে গুপ্ত রাজ্য পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। বরাকর নদীর তীরস্থ কল্যাণেশ্বরীর মন্দির তৈলকম্প রাজ্যের অধীনস্থ এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও অনেকগুলি কিংবদন্তি শোনা যায়। তার মধ্যে একটা হল খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে কুশানদের হস্তে নিগৃহীত ও বিতাড়িত পশ্চিম দেশীয় এক হরিগুপ্ত ঐ পাহাড়ের তলায় একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করে তিনিই এক গাছের তলায় প্রথম একটি ছোট মন্দির তৈরী করে চামুন্ডা বিগ্রহ স্থাপন করেন। পরে ঐ হরিগুপ্তই শক্তিশালী হয়ে মগধে গুপ্ত রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন। (১৭৫৭ খ্রীঃ) (নবকল্লোল অগ্রহায়ণ ১৪০১)।

ঐ হরিগুপ্তেরই কিছু আগে কিংবা পরে তারই সহায়তায় কিংবা তার দেখাদেখি নিজের তৎপরতায় তৈলকম্প সামন্তরাজটিকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। ত্রিকলিঙ্গের প্রাধান্যও ঐ সময়ে স্তিমিত ও বিনষ্ট প্রায় ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার পর রাজ্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্য দুই বৎসরের অপেক্ষার পর কুল প্রথানুযায়ী কপালে রাজতিলক ধারণ করে পরিবারবর্গ সহ সভাসদ বর্গের উপস্থিতিতে এক শুভদিনে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন পূর্ব কূল প্রথানুযায়ী শেখর উপাধি গ্রহণ করে এবং সেই দিন থেকেই শিখরাব্দ ধরে তাঁর রাজ্যে একটি নতুন অব্দের প্রচলন করেন যেটির সময়কাল ১৫০-২০০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে বলে আমাদের অনুমান। এই রাজ্যটিই পরবর্তীকালে পঞ্চকোট রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে।

পঞ্চকোট রাজবংশের উদ্ভবের কিংবদন্তি কাহিনীটি কিন্তু অন্য রকম। কিংবদন্তি অনুসারে পঞ্চকোট রাজবংশের উদ্ভব ধার রাজ্যের রাজা জগদ্দেও সিংহকে জড়িয়ে। মহারাজা জগদ্দেও সিংহ জন্মেছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশে তাঁর রাজধানী ছিল যারা নগরে। কোন এক সময়ে চতুরঙ্গ সৈন্য সহ তিনি গুরু ও মহিষী সহ পুরীতীর্থ যাত্রায় বের হন। পথে ঝালদার জঙ্গলে রাজমহিষী বীরমতি একটি মৃত সন্তান প্রসব করলে তা জঙ্গলেই পরিত্যক্ত হয়। অন্যমতে ছেলেটি মাতাপিতার অলক্ষ্যে হাতীর

পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। একটি কপিলা গাই দুধের ধারা দিয়ে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সন্তান পেয়ে এক কুড়মি সর্দ্দার শিশুটিকে বাড়িতে এনে লালন পালন করে বড় করে তোলে। পরে ঐ শিশুটিই শিখরভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজা হয়ে দামোদরের শেখর উপাধি গ্রহণ করেন।

H. Coupland-এর Bengal District Gazetters, Manbhum (1911) -এর উল্লিখিত কিংবদন্তিটিতে, দামোদর শেখরের পরিবর্তে অনন্তলাল শেখর এবং ঝালদার পরিবর্তে পঞ্চকোট পাহাড়ের নিকটবর্তী অরুণ বনের উল্লেখ আছে। মানভূম, বরাভূম, পাতকুম, মল্লভূম, সিংভূম প্রভৃতি বনাঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ রাজবংশেরই উদ্ভব কাহিনীগুলি একটু এদিক ওদিক করে এই একইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই অনেকেই এই কিংবদন্তিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধমনা।

E.T. Daltan তাঁর Descriptive Ethnology of Bengal 1872 গ্রন্থে শিখরভূম রাজ্যের তথা পঞ্চকোট রাজবংশের উদ্ভব কুড়মি সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত বলে উল্লেখ করেন এবং রাজবংশটি যে ভূমিজ বা মুন্ডা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত নয় সে বিষয়ে তিনি তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। জগদীশ চন্দ্র ঝা কিন্তু তাঁর The Bhumij Revolt (1932-33) গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন The Pachat Raja was also a Bhumij, though the family by the eighteenth century hadbeen Hinduided and provided with a genealogy linking the first Raja with the twelfth Maharaja of Ujjain.

কুড়মিবংশীয় এই শিখরভূম বা তৈলকম্পন রাজ্যটির প্রাচীন ঐতিহাসিক হদিশ মিলে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম কাব্য থেকে। কাব্য হলেও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। কারণ কবির পিতা প্রজাপতি নন্দী পাল সাম্রাজ্যের এক উঁচুদরের রাজকর্মচারী ছিলেন এবং সেই সুবাদে রামপালের রাজত্বকালের মূল ঘটনার প্রবাহের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে পরিচিত ছিলেন। কাব্যটির ২ পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকে শিখরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকেরই টীকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, ঐ শেখর ছিলেন তৈলকম্পের রুদ্রশেখর, যাঁর প্রভাবে যুদ্ধে নদী, পর্বত, উপত্যকা জুড়ে বিস্তীর্ণ পর্বত-কন্দরের রাজন্যবর্গের দর্পহরণকারী দাবানলের মত ধেয়ে যেত, সেই তৈলকম্পের কল্পতরু রুদ্রশেখর। এই কাব্যটি থেকেই জানা যায় পালবংশীয় রাজা মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রাম পাল (১০৭০ - ১১২০ খ্রীঃ) কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিবেন্দুর পুত্র ভীমকে দমন করার জন্য ঐ বনাঞ্চলের সমস্ত স্বাধীন রাজাদের দরজায় দরজায় গিয়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন এবং যাঁরা যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁরা ছিলেন -

ভীমযশ, বীরগুণ, জয়সিংহ, বিক্রম রাজ, লক্ষীশুর, রুদ্রশেখর, ময়গল সিং ও প্রতাপ সিংহ যাঁদের রামপাল বিজয়ের পর প্রচুর ধনসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন।

পঞ্চকোট রাজবংশের রাজাদের নামের তালিকায় রুদ্রশেখরের নাম পাওয়া না গেলেও ২৯তম রাজা সহদেব শেখরের পঞ্চপুত্রের নামের তালিকায় রুদ্র শেখরের নাম পাওয়া যায়। পৃথ্বিনাথ শেখর, মুকুন্দ শেখর, হরিনাথ শেখর, রুদ্রশেখর ও বৈজনাথ শেখর। রুদ্র শেখর রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন বলেই অনুমিত হয়, কারণ রাজার নিকটতম আত্মীয়রাই তখন দায়িত্বশীল উচ্চপদ সমূহে নিয়োজিত হতেন। তাছাড়া রুদ্র শেখর যে সন্ধ্যাকর নন্দীর স্বকপোল কল্পিত ব্যক্তি নন, তিনি যে পঞ্চকোট রাজবংশেরই একজন তার প্রমাণ মিলে আড়ষা থানার অন্তর্গত কাঁসাই নদীর তীরবর্তী বোড়াম দেউলঘাটার স্মারকস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি থেকে। লিপিটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

লিপিটি ছিল পাঁচ লাইনের ঃ-

শ্রীরুদ্র-শিশু যুবরাজ
বলী - অক্ষয় ত্রিভুব
ন অধিপতি।। বলী
অক্ষয় চ সিংহাসন
চক্রবর্ত্তী।।

[JBORS-Vol.IX.pt.-III,IV]

অর্থ - শ্রী রুদ্র ছোট যুবরাজ বা ছোট রাজকুমার, অত্যন্ত বলশালী, ত্রিভুবনে তাঁর প্রভাব অক্ষয় অমর। তিনি নিজে রাজা ছিলেন না, সেনাপতি ছিলেন যার প্রভাবে সিংহাসন অক্ষয় ও রাজা রাজ চক্রবর্ত্তী হয়েছিলেন।

পঞ্চকোট রাজপুরোহিত মান্যবর শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত পঞ্চকোট ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ২৯তম মহারাজা সহদেব শেখরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বিনাথ শেখর রাজা হন (৮৩৫ - ৮৪৭ শিখরাব্দ) এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কীর্ত্তিনাথ শেখর (৮৪৮-৮৭২ শিখরাব্দ) রাজসিংহাসনে অধিরোহন করে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। পঞ্চকোট পরিখায় পরিবেষ্টিত সুবিশাল দুর্গ এই কীর্ত্তিনাথেরই কীর্তিস্তম্ভ। আমাদের অনুমান রামপালের নিকট হতে প্রাপ্ত ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যের সাহায্যেই বিশাল দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছিল শক, হুন, কুশান প্রভৃতি বৈদেশীয় এবং এদেশীয় শত্রুদের হস্ত হতে রাজ্য, রাজধানী ও রাজপরিবারটিকে রক্ষার নিমিত্ত। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করেছিলেন-পৃথ্বিরাজ মহারাজের রাজত্বের শেষ পর্যাযে

অথবা কীর্ত্তিনাথ শেখরের রাজত্বের প্রথম দিকে। ঐ দুই রাজারই সেনাপতি হওয়াও রুদ্র শেখরের ক্ষেত্রে অসম্ভব কিছু ছিল না। দুর্গ নির্মাণ শেষ হলে রুদ্র শেখরের পঞ্চ ভ্রাতার অর্থাৎ সহদেব শেখরের পাঁচ খুঁটের পরিবারবর্গই ঐ দুর্গে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন তাই স্থানীয় ভাষার রীতি অনুযায়ী ঐ দুর্গ বা পাহাড়টিকে তারা পাঁচ খুঁটিয়া বলত। যা কালক্রমে পঞ্চখুঁটিয়া থেকে পঞ্চকোট এবং বৃটিশ যুগে পাঞ্চেৎ-এ রূপান্তরিত হয়।

সর্বসংহারক কালের প্রবাহে দুর্গটি আজ ভগ্নস্তূপে রূপান্তরিত হলেও আজও শিখরভূমের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রমাণ করে চলেছে এবং সুদূর থেকে বহু অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ ভগ্নদুর্গের অদ্ভুত স্থাপত্য কলা দর্শনের আশায় আগমন করে থাকেন। পঞ্চকোট রাজবংশটিও এই অঞ্চলের ন্যায় শিব ও শক্তির উপাসক ছিল। তাঁদের কুলদেবী ছিলেন শিখরবাসিনী রাজ রাজেশ্বরী রাজবংশের ৫৮তম রাজা বলভদ্র শেখর শক্তিমন্ত্র ত্যাগ করে প্রথম রামমন্ত্রে দিক্ষীত হন ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ ত্রিলোচনের ভ্রাতা আচার্য্য রঙ্গনাথন গোস্বামীর নিকট হতে।

বলভদ্র শেখরের দুই পুত্র-বঙ্ক বিহারী ও বৈদ্যনাথ শেখর। জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কবিহারী পিতার জীবিত অবস্থায় চারি পুত্র রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। বলভদ্রের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন অধিকার সম্বন্ধে বলভদ্রের পুত্রগণের সাথে বৈদ্যনাথ শেখরের ঘোরতর বিবাদ বাঁধে। কুল প্রথানুসারে বলভদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ শেখর রাজ সিংহাসনে অধিরোহন করলেও একদিন বৈদ্যনাথ শেখর সৈন্য সহ রাজধানী আক্রমণ করে রাজাকে রাজধানী ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এই পরিস্থিতিতে জগন্নাথ শেখরের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন শেখর সামন্ত রাজন্যবর্গকে সপক্ষে এনে তাঁদের সাহায্য বৈদ্যনাথ শেখরকে পরাজিত ও বন্দি করে নিজে রাজা হন। এই শত্রুঘ্ন শেখরই পঞ্চকোট রাজবংশে কুড়মি সম্প্রদায়ের শেষ রাজা। শত্রুঘ্ন শেখরের মৃত্যু হলে তাঁর চার রাণির গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন অধিকার নিয়ে এক অন্তর্কলহের সৃষ্টি হয় পূর্বের ন্যায় এই কারণে। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে রাজবংশটিকে লুপ্তের মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। এক রাত্রে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রী নির্বিশেষে অনেককেই হত্যা করা হয়। এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে আসমান ও নয়ান নামক দুই দুর্দান্ত দস্যুর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল বলে কথিত। বিবাদটি দশবছরকাল স্থায়িত্ব লাভ করে এবং গৃহবিবাদের ফলস্বরূপ রাজ্যটি কুড়মি সম্প্রদায়ের হস্তচ্যুত হয়ে অন্য কোন উচ্চবর্গীয়ের হস্তে হস্তান্তরিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় স্বাধীন ভারতে, জমিদারী প্রথা বিলোপের মাধ্যমে।

কুড়মি সমাজের সংস্কৃতি সাধারণ মানুষের আচার অনুষ্ঠান ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কাব,

বিভিন্ন প্রকারের পূজা পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। এরা ঝাড় জঙ্গল, পাহাড় পর্বত নদী ঝরণা প্রভৃতির মধ্যেই নিজেদের পূর্ব পুরুষের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছে। এদের দেবতা ধরম, করম, শীতলা, মহামায়া, পাঁচবহনি, সাতবহনি, কুদরা প্রভৃতি। এরা কেন্দ, পিয়াল, বহড়া, ভেলা পাকা, মহুয়া, লাঠা, মাদাল পাকা, জনার, কেঁদ, সাওয়া, গুঁদলু প্রভৃতি ঘাটা খেয়ে জঙ্গল পরিবেশে আনন্দের সাথে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল যা হারিয়ে বর্তমানে তারা দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত। এদের অন্দরের পরব ইন্দ, ছাতা, জিতা, বাঁদনা, সহরই, মকর, ভগতা, টুসু, ভাদু প্রভৃতি। এদের লোক জীবন সংসার, ডাইন, ভূত-প্রেস বিশ্বাস, পূজা পদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার বিরুদ্ধ ভাবই প্রমাণ করে। কৃষি বা জমিই এই সমাজের অন্যতম জীবন উপায়। শোষণের যাঁতাকলে নিজ বাসভূমে পরবাসী। এক প্রকারের উদ্বাস্তু।

কোন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির বিনাশের অর্থই হচ্ছে সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বিশাল জনগোষ্ঠীটিরই বিনাশ। এই অঞ্চলে বহিরাগতদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই এই কুড়মি সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ আঘাত হানে। আগন্তুকরা এদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে এতদূর অবজ্ঞার চোখে দেখত যে, তারা ঐ গুলিকে অমার্জিত মানুষের উৎপন্ন আবর্জনা ও কুসংস্কার বলে প্রচার করে, সর্বদা নিজদিগকে দূরে রাখার চেষ্টা করত। সামান্য শিক্ষিত ও বিত্তশালী আমাদের কুড়মিগণ তাদের এই তাচ্ছিল্যভাবে হীনমন্যতায় ভুগে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিতৃষ্ণা ও ঔদাসিন্যের ভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আপন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পদকে ধুয়ে মুছে কাদা ধুলো মুক্ত করে দেশবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টার বদলে নিজেরই ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ ভাব পোষণ করে। আগন্তুকদেরই ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করতে শুরু করি আমরা।

তাছাড়া দেশে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলে মানভূমে বাঙ্গালী ও বিহারীগণ বাংলা ও হিন্দি ভাষার প্রচার ও উন্নতিকল্পে উঠে পড়ে লেগে যান। জেলাতে যত্রতত্র প্রাথমিক হিন্দু স্কুল খোলার হিড়িক পড়ে যায়। সকলেই নিজ নিজ ভাষার প্রচারে ও প্রসারে জোরদার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। গঠিত হয়েছিল মানভূম বিহারী সমিতি, সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

বিহার সমিতির পাল্টা সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়েছিল "মানভূম সমিতি", যাকে বাঙালী সমিতিও বলা হত। সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার পি.আর.দাশ। মানভূম সমিতির মুখপত্র হিসাবে মানভূম সমিতি পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮ই মে ১৯৩৫। এই পত্রিকাটিই পরবর্তীকালে মুক্তি নামে পরিচিতি লাভ করে।

এইসব প্রচার মাধ্যমে ও শিক্ষার বাহনেই কুড়মিরা ক্রমে ক্রমে তাদের আদর্শকে অনুকরণের বস্তুতে পরিণত করে এবং তারা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে কেউ বা হিন্দির দিকে কেউ বা বাংলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায় সমাজে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আর এরই ফলস্বরূপ মানভূম ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর দ্বিখণ্ডিত হয়ে পুরুলিয়া জেলা নামে এক খন্ড পশ্চিমবাংলার সাথে এবং অপর খন্ড ধানবাদ জেলা নামে বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের সাথে এবং চান্ডিল, পটমদা থানাগুলি সিংভূমের সাথে যুক্ত হয়। তাই আমাদের দরদী ঝুমুর কবি শ্রী সুনীল মাহাত দুঃখ করে লিখেছিলেন —

বিহারে মানভূম জেলা
বিহার বাংলায় বাঁটি লেলে।
মানভূম দুঃখে জ্বরজ্বর গঅ।। (রং)
আওয়া দেখা ভাই, মানভূম কেসনঅ সুন্দরঅ।
লুটিয়ারা লুটি লেলা, হাথে টুপা ধরায় দেলা।
ছোওয়া পুতাক আঁইখে গিরেক লর গঅ।।

বিয়ে জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, তাই এ সম্বন্ধেও দু-এক কথা বলা উচিত। মহাভারতে বেদোক্ত বিয়ে অষ্ট প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, অসুর, গন্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। কুড়মিদের বিয়েও পূর্বে প্রায় ১২/১৩ প্রকারের ছিল। যথা —

মাড়ুয়া বিহা, গলট বিহা, সাঁঘা, কইরাবিহা, বেঁদখাড়ি বিহা, দুচুলহাজরি বিহা, ঘারজাঁউআই বিহা, রাজীখুশি বিহা, প্রেম বিহা, মাথাভারি বিহা ইত্যাদি। বর্তমানে কিন্তু মাড়ুয়াবিহা ও সাঁঘা ছাড়া বাকিগুলি সবই লুপ্ত প্রায়। বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ কিছু রীতি নীতি ও বিধি নিষেধ পূর্বেও ছিল বর্তমানেও আছে। নিজের বংশ অর্থাৎ স্বগোত্রে বিয়ে হয় না এবং ভিন্ন জাতির সাথে বিয়ে সমাজে মান্যতা পায় না। বিয়ের আগে বরের 'আম বিহা' এবং কনের 'মহুল বিহার' প্রচলন বা রেওয়াজ আজও আছে।



আদি কথা

মনোরঞ্জন মাহাত

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আসার আগে কোনও আদিবাসী গোষ্ঠীরই জাতিগত লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাদের ইতিহাস আজও অনুমান নির্ভর। তাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, শিল্প, নৃত্যকলা, সর্বোপরি তাদের জীবনচর্চার ধরন-ধারন দেখে তাদের একটা অনুমান-নির্ভর পরিচিতি পাওয়া যায় মাত্র। যার খাম-খুঁটা হল সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রাচীন বৃদ্ধদের স্মৃতি, শ্রুতি এবং ভাষা।

স্মৃতি হল, তিনি যা শুনেছেন বা জেনেছেন পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে। প্রবীনদের কাছ থেকে। বংশ পরম্পরায় যা চলে আসছে।

শ্রুতি হল, শোনা বা জানার পর তিনি যা মনে রাখতে পেরেছেন এবং সেইমত অগ্রজদের অনুসরণ করছেন।

ভাষা হল, সেই মাধ্যম যার সাহায্যে তিনি পূর্ব পুরুষদের বলা কথা গুলি অন্যের সামনে বলছেন। প্রকাশ করছেন।

আদিবাসীদের পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নৃ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের একটা নিজস্ব ধারা আছে। পন্ডিতগণ সেই ধারার বাইরে গিয়ে কোনও পরিচিতি দেন না। অথচ, কোনও জাতি বা গোষ্ঠী নিজেদের বিকশিত করার ক্ষেত্রে পন্ডিতদের প্রবর্তিত কোনও ধারা বা ব্যাকরণ মেনে নিজেদের অস্তিত্ব বা পরিচিতি তৈরি করে না। কালের বিবর্তনের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গেই তার সমাজ, ধর্ম, আচার সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে। পন্ডিতগনের তৈরি করা ফর্মূলায় কোনও জাতি-গোষ্ঠী না পড়লে সেজন্য দেখা গেছে তাদের আদিবাসী অস্তিত্ব, আদিবাসী পরিচিতি নিয়েই নানান বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পন্ডিতি নিদানে তারা অস্ট্রিক, না কি দ্রাবিড়িয়ান, এ এক বিরক্তিকর এবং বিভ্রান্তিকর জটিলতার জট। আবার বলি, জাতিসত্ত্বার পরিচিতির জন্য কিংবা পন্ডিতি ব্যাকরণের থিওরি অনুসরণ করে কোনও জাতি-গোষ্ঠী তাদের সমাজ, ধর্ম বা ভাষার জন্ম দেয়নি। সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষার প্রচলন সমাজ তার নিজের

প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছে।

তবে একথা মানতেই হয় যে, আদিবাসীদের এরূপ পরিচিতি তথা ইতিহাস জানার এবং তা জেনে তাদের ইতিহাস খাড়া করার প্রচেষ্ঠা শুরু হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলেই। ভারতে আসা বিভিন্ন আমলা, নৃতাত্ত্বিক, ভাষা বিজ্ঞানী, গবেষক, ধর্ম প্রচারক এবং কৌতুহলী ইংরেজ প্রশাসকদের উদ্যমেই প্রথম আদিবাসী পরিচিতির পরম্পরাগত কথা-কাহিনী জানার শুরু। সেই চেষ্টা আজও চলেছে। স্মৃতি, শ্রুতি এবং ভাষার সঙ্গে অনুমান নির্ভরতাই আজ আদিবাসীদের পরিচিতির ভাগ্য নির্ধারণে প্রধান সহায়ক।

এমন পরিস্থিতিতে ক্রীশ্চান ধর্ম প্রচারক L.O. Skefsroud সংগৃহীত প্রাচীন বৃদ্ধ কোলেয়ান হাড়ামের উক্তিগুলি আজ সাঁওতাল তথা খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর ইতিহাস জানতে প্রভূত সাহায্য করে। সত্য-মিথ্যার বিচারে হয়ত বা উক্তিগুলি প্রামান্য ইতিহাস নয়। তবে সংগৃহীত গীত, স্মৃতি এবং শ্রুতি নির্ভর উক্তি এবং তার ভাষা সাঁওতাল তথা খেরোয়ালদের জাতিগত সামাজিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা অস্বীকার করা বা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

এই পরিচিতির ধাঁধা আরও বেশি হতাশজনক খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর অন্যতম শরিক কুড়মিদের ক্ষেত্রে। সাঁওতালদের যদি বা কোলেয়ান হাড়াম আছেন। কুড়মিদের তাও নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, কোম্পানী আমলের পন্ডিত, গবেষকরা খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুন্ডাদের সম্পর্কে যতটা চর্চা করেছেন, খেরোয়ালদের অন্যান্য শাখাগুলি সম্পর্কে ততটাই উপেক্ষা করেছেন। এই ক্ষেত্রটিতে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত কুড়মি জনগোষ্ঠী। রিজলে, ডালটন, গ্রিয়ারসন সহ আরও যেসব মন্তব্য এসেছে পন্ডিতমহল থেকে তা স্পষ্ট জাতি নির্ণায়ক নয়। এই মন্তব্যটি এজন্যই করা হল যে, খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর মধ্যে থাকা বারোটি গেষ্ঠীর মধ্যে এগারোটি গোষ্ঠীকে তাঁরা বলছেন অস্ট্রিক গোষ্ঠীভূক্ত। কিন্তু কুড়মিদের বলছেন দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীভূক্ত। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্পর্কিত আচার সর্বোপরি কুড়মিদের সঙ্গে অন্যান্য এগারোটি গোষ্ঠীর প্রভূত মিল থাকা সত্ত্বেও এমন আইডেন্টিটি শুধু বিস্ময় জাগায় না, রীতিমত ধাঁধাও সৃষ্টি করে। তবে এক্ষেত্রে সান্তনা একটাই, তাঁরা দ্রাবিড়িয়ান বলুন বা অস্ট্রিক বলুন (যদিও কেউ বলেননি), আইডেন্টিটির ফর্মূলায় যে নামেই পরিচিতি দিন তাঁরা কিন্তু কুড়মিদের খেরোয়াল গোষ্ঠীভূক্ত তথা ট্রাইবেল আইডেন্টিটিই দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু এজেন্সিগুলির মত কুড়মিদের 'হিন্দু' আইডেন্টিটি দেননি।

খেরোয়াল জাতিগোষ্ঠীর সম্মিলিত আইডেন্টিটি বা পরিচিতি সম্পর্কে কোনও

চর্চা আজ অবধি হয়নি। যা হয়েছে বা যেটুকু হয়েছে তা খেরোয়াল গোষ্ঠীকে বিভাজিত করে আলাদা আলাদাভাবে। প্রত্যেক গোষ্ঠীকে আবার আলাদা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ারও একটা ধারাবাহিক প্রয়াস চলেছে। একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে অতি সুক্ষভাবে বিরোধী করে রাখা হয়েছে। যাতে কোনওভাবেই সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে ওঠা এক সুমহান সভ্যতার স্রষ্টা খেরোয়ালরা একসাথে না মিলিত হতে পারে। একজোট হয়ে আদিবাসীন্দার অধিকারের দাবি তুলতে পারে। ঐতিহাসিকভাবেই মর্যাদার স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আর্য্য আক্রমনে পরাজিত দুর্বল খেরোয়াল জনতা একইসঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী খরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও মুখোমুখি হয়। অনাবৃষ্টির কারনে নদী-নালা-ঝর্নার মত প্রাকৃতিক উৎসগুলি শুকিয়ে চূড়ান্ত ফসল হানি হয়ে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। অনাহার পরিস্থিতির সঙ্গেই সে সময় আর্য আক্রমনের মোকাবিলা করতে না পারার কারনে খেরোয়ালরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সিন্ধু উপত্যকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। সেদিনের সেই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিই আজকের সাঁওতাল, মুন্ডা, কুড়মি, বিরহড় ইত্যাদি নানান নামের ট্রাইব জনগোষ্ঠী।

সেদিন কারা কারা খেরোয়াল গোষ্ঠীর শরিক ছিল সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে খেরোয়াল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে কিছু চর্চা করা যেতে পারে।

খেরোয়াল শব্দের অর্থ নিয়ে অনেকে অনেক রকম মতামত দিয়েছেন। যেমন খের মানে কেউ বলছেন পক্ষী। আল শব্দের মানে মানুষ। অর্থাৎ, পক্ষী চরিত্রের যাযাবর শ্রেণীর মত। আবার কেউ বলছেন, খেড় মানে ধান। অর্থাৎ, শস্য উৎপাদনকারী মানুষ। ইত্যাদি। তবে আমাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ভিন্ন অর্থ। যেমন, মূল শব্দ 'খের' এর সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে পুরো অর্থ দাঁড়ায় 'সংঘবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষ'।

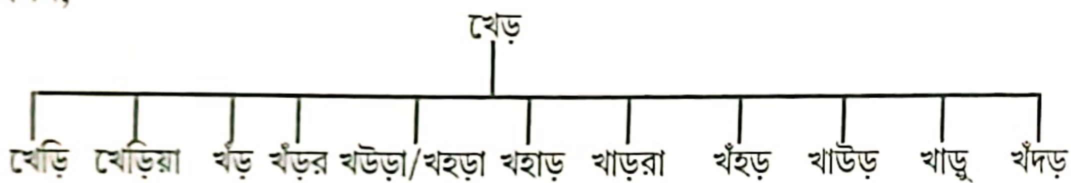
যুক্ত হল, খের শব্দটি বর্তমানেও প্রচলিত কুড়মি জনগোষ্ঠীর ভাষায়। গৃহপালিত পশুদের, বিশেষ করে গরু, ছাগল, ভেড়াকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট গোয়ালে প্রবেশ করানোর সময় এখনও খেড়-খেড় শব্দ উচ্চারন করা হয়। অর্থাৎ, খেড় শব্দ দলবদ্ধভাবে ডেরায় প্রবেশের ইঙ্গিতবাহী শব্দ। এর সঙ্গে 'আল' অর্থাৎ মানুষ, শব্দ যোগে সৃষ্টি হয়েছে 'খেড়আল' শব্দ। এ থেকে দুটি অনুমান আসে। এক, এই 'খেড়আল' শব্দটি বহিরাগত কোনও গোষ্ঠীর দেওয়া। দুই, আদিম জনগোষ্ঠীর দলপতিরা ডেরায়/গুহায় ফেরার নির্দেশ দিতে এই 'খেড়' শব্দ উচ্চারণ করত। সম্ভবত বিপদ সংকেতের বার্তাও প্রকাশ পেত এই খেড় শব্দের মাধ্যমে। বর্তমান সময়েও সেই শব্দ হারিয়ে যায়নি। তবে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে।

কুড়মালি ভাষায় 'আল' শব্দেরও ব্যবহার বর্তমান। তবে একটু ভিন্নরকম

অর্থে। 'আল-ছানা' শব্দটি কুড়মালিতে 'দুগ্ধ পোষ্য শিশু' অর্থে বোঝানো হয়। মানুষের সঙ্গে পশুদের পার্থক্য নিরূপনের জন্যই সম্ভবত বহিরাগত কোনও গোষ্ঠী 'খেড়' শব্দের সঙ্গে 'আল' শব্দ যোগে এরূপ 'খেড়য়াল' নামে চিহ্নিত করেছে আলোচ্য গোষ্ঠীটিকে। সব মিলিয়ে দাঁড়ায়, খেড় + আল > খের + আল > খেরআল > খেরোয়াল। অর্থাৎ, সংঘবদ্ধভাবে বসবাসকারী মানুষ। খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের পদ্ধতি তাদের সমাজে এখনও বর্তমান। এখনও তা টিকে আছে।

আবার বলি, খেড় শব্দ থেকে খেড়ি শব্দেরও উৎপত্তি। যার অর্থ, সাথী। প্রিয় সাথী। খেড় শব্দ থেকে খেড়িআ শব্দেরও উৎপত্তি। যার অর্থ, স্বল্প বসন পরিহিত মানুষ। ভুগা পরা মানুষ। পাহাড়ী খেড়িআরা এখনও ভুগা পরেন। শুধু তাই নয়, এই খেড় শব্দটি বহু শব্দেরও জননী।

যেমন,



খেড় শব্দজাত এইসব শব্দগুচ্ছের অর্থগুলি আদিম খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া, হড় শব্দটিও খেড় শব্দজাত বলেই মনে হয়। যেমন, খেড় > খঁড় > খঁড়র > খঁহড় > হড়।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির কথা এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রচুর স্মৃতি নির্ভর গানের কথা আমরা লিখিতভাবে পাই ক্রীশ্চান ধর্ম প্রচারক কেরাপ সাহেব ওরফে L.O. Skrefsroud, P.O. Bodding এর লেখা বই থেকে। তাঁরা কোলেয়ান হাড়াম নামে এক অতিবৃদ্ধ সাঁওতাল গুরুর কাছ থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনচর্চা সহ আংশিকভাবে অভিগমন এবং অভিবাসন বিষয়ে যা যা শুনেছিলেন বা জেনেছিলেন, তা হুবহু পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। 1887 সালে প্রকাশিত বইটি হল, 'মারে হাপড়ামকো রেয়াক কাথা' রোমান হরপের এই বইটি পরে অনুবাদ করেন P.O. Bodding। কোলেয়ান কথিত বইটি 'কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি' বলে অধিক চর্চিত।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বর্তমান যে জীবনচর্চা আমরা লক্ষ্য করি, তা কোলেয়ান হাড়ামের উক্তির সঙ্গে শতাধিক বছর পরেও প্রায় হুবহু অনুসৃত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ, কোলেয়ান হাড়াম তাঁর স্মৃতি এবং শ্রুতি থেকে যে ভাষা মাধ্যমে সাহেবদের কাছে তাঁর সমাজ ধর্মের কথা ব্যক্ত করেছিলেন, তা আজও বহমান। ঠিক এই কারণেই কোলেয়ান হাড়ামের উক্তিকে সাঁওতাল সমাজ শিরোধার্য্য করে মান্যতা দিয়েছে।

ইংরেজ বা ভারতীয় গবেষকরা খেরোয়াল গোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুন্ডাদের যতটা

গুরুত্ব দিয়ে গবেষযণা করেছেন। কুড়মি কিংবা খেরোয়াল গোষ্ঠীর অপর শরিকদের ক্ষেত্রে তা কিন্তু হয়নি। কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সে প্রশ্ন আজ শুধুই হতাশা বাড়ায়। তবে খেরোয়াল জাতিসত্ত্বাকে গুরুত্ব দিয়ে চর্চা হলে আজকের আদিবাসী চর্চা অনেকটাই সমৃদ্ধ হত।

খেরোয়াল কারা? কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি হল, 'চাম্পা ধাবিচ আলে আর মুন্ডাকো, বিরহড়কো, কুঁড়বিকো এমানতেনকো খারওয়ার ঞুতুম তৈলে বিকাউঃ ককান তাঁহে কানা।' P.O. Bodding কোলেয়ান হাড়ামের এই উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'Upto Champa we and the Mundas, the Birhors,the Kurmbis and others were called by the name of Kharwar.'

ভাষাতাত্বিক Sir G.A. Grierson লিখেছেন, 'Santali, Mundari, Bhumij, Koda, Ho, Turi, Korwa are only slightly deffering forms of one and the same language. All these tribes are according to Santali traditions descended from the same stock and were once Known as Kherwars or Kharwars.' সমাজতাত্বিক মঙ্গল চন্দ্র সরেন লিখেছেন, 'খেরোয়াল বংশের বারোটি শাখা। তারা হল, সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, কোড়া, কুঁড়বি, হো, বিরহড়, খাড়িয়া, মাহালী, অসুর, তুরি এবং জুয়াং।"

ইতিহাস গবেষক ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে লিখেছেন— 'ভাষার বৈশিষ্ঠ্য ধরে বিচার করলে দেখা যায়, নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলি একসময় খেরোয়াল জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল- (১) অসুর, (২) মুন্ডা, (৩) সাঁওতাল, (৪) হো বা লাড়কা কোল, (৫) বিরহড়, (৬) খাড়িয়া বা খেড়িয়া, (৭) শবর, (৮) কোড়া বা কোডা, (৯) কোরওয়া, (১০) করকু, (১১) করমালি বা কলহে, (১২) মাহালি বা মাহলি, (১৩) ভূমিজ, (১৪) তুরি, (১৫) কুড়মি, ১৬) জুয়াং।'

সাঁওতালি পুরাণে খেরোয়াল গোষ্ঠীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে সমাজতাত্বিক মঙ্গল চন্দ্র সরেন লিখেছেন— 'সেদায় মিৎ হড়ে বার্ এরা লেনা। আদ বুড়কি হপন বার্ হড়, ছুটকি হপন দ মড়ে হড়। বুড়কি হপনগে কুঁড়বি আর মুন্ডা, আর ছুটকি হপন গে, (১) হড়, (২) মাহালে, (৩) কড়া, (৪) দেশোয়ালি, (৫) বিরহড়। উনকু ঝত মিৎ ঠেন গেক তাঁহে কানা, মিৎ ঠেন গে ক বঙ্গাঃ আ।'

ইতিহাসের গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে লিখেছেন—'চাম্পার স্মৃতি সাঁওতালরা আজও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, বিরহড়, মাহালি, কুড়মি প্রভৃতি গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় সেখানে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট জনপদ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর

সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এক সুমহান সভ্যতা। তাদের জীবনযাত্রা, নৃত্য-গীতে প্রবাহিত হয়েছিল একই অভিন্ন ভাবধারা।'

চাম্পা নামক দেশে খেরোয়াল গোষ্ঠী যে দীর্ঘকাল বসবাস করে কৃষিকর্ম তথা সমাজ সংস্কৃতি শিল্প-সঙ্গীত-নৃত্যকলায় বিশেষ, পারদর্শী হয়ে সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপন করত, তার উল্লেখ রয়েছে P.O. Bodding এর লেখায়। তিনি লিখেছেন— " In Champa they Sojurued many genarations and the present institutions of t he tribe were formed"।

অর্থাৎ, কুড়মিরা হল সুমহান খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান শাখা। কুড়মালি প্রবাদ আছে, 'কল, কুড়মি, কড়া; বেদ সাসতর ছাড়া।' এর অর্থ হল কল-কুড়মিএবং কড়া জনজাতি বেদের নিয়ম মানে না। বেদ বর্ণিত ধর্ম-বিধি-রীতি-রেওয়াজ বিশ্বাস করে না। কুড়মিদের পূজা-পার্বন-পরব-তিহার-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সমস্তই প্রকৃতিকেন্দ্রীক, কৃষিকেন্দ্রীক। এক্ষেত্রে যদিও কোলেয়ান হাড়াম আক্ষেপ করে বলেছেন, "The Kurmis gradually became somewhat like Deko" কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, কুড়মিরা একবিংশ শতাব্দীতেও প্রকৃতির পূজারী। আজও প্রকৃতিই এদের দেবতা। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এদের দেবতা-অপদেবতা ধর্মীয় ভাবাবেগ। হিন্দুত্বের গ্রাসে আজও এদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়নি। মূল খেরোয়াল জাতিসত্ত্বার সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও আজও তারা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে খেরোয়াল সভ্যতার ধর্ম, সংস্কৃতি সহ সমগ্র জীবনচর্চা।

তাই স্পষ্টভাবেই বলার প্রয়োজন, কুড়মি অথবা খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর কোনও একটি গোষ্ঠীকে বাদ দিলে যেমন খেরোয়াল গোষ্ঠীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে না। তেমনি একটি বা দুটি গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এবিষয়ে চর্চা হলে খেরোয়াল বা ছোটনাগপুর উপত্যকার আদিবাসী চর্চাও সম্পূর্ণ হবে না।



ভাষা

"কুড়মালি ভাষার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র

অথবা

সৈন্ধব অঞ্চল থেকে কুড়মি জনগোষ্ঠীর ছোটনাগপুর মালভূমিতে স্থানান্তরণ সাপেক্ষিক কুড়মালি ভাষার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র"

প্রফে. অনাদিনাথ মাহাত (কইড়অআর)

১। কথার কথা : কুড়মালি উপভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গ —

সত্য কথা বলতে কি কুড়মি জনগোষ্ঠীটির জাতিসত্ত্বাগত পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের গোষ্ঠীনামধেয় মাতৃভাষা কুড়মালির নির্বিবাদ ইতিহাস নিয়ে জীবিত ও মৃত প্রায় হাজার দু'য়েরও অধিক ছোটবড় কেবল ভারতীয় ভাষার মধ্যেই নহে এতাদৃশ হাজারো বিশ্বভাষার মধ্যেও এত তর্ক বিতর্ক আর কোথায়ও দেখা যায় না। আর তাই বলতে বাধা নেই যে আলোচ্য বিষয়টির আলোচনাও হল একান্তভাবেই জটিল। কিন্তু সে যাই হোক কুড়মি ও কুড়মালি নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অহেতুক আলোচনার আহাম্মুকি, কচ্‌কচানির অবসর আপাততঃ নেই। কাজেই...।

কিন্তু সে যাই হোক, যদিও অদ্যাবধি উপলব্ধ বিভিন্ন তথ্যাদির সঙ্গে নিরপেক্ষ ভাষা-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে কুড়মালি ভাষার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্রের প্রাচীন পরিসীমা সম্পর্কিত বাস্তব ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণে বলতে পারা যায় যে, একদা সন্ধিদেশ তথা 'পশ্চিম রাঢ়দেশ' বলতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে-মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্তস্থিত সুবৃহৎ ভূ-ভাগটিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা রেখাঙ্কিত করে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হলেও (এমনকি যেকালে এই ভূ-খন্ডটিকে 'ব্রাত্যদেশ' অর্থাৎ 'পাপী-নীচ-অধার্মিক -দের দেশ' তথা 'পান্ডব-বর্জিত দেশ' নামেও ঘৃণা করা

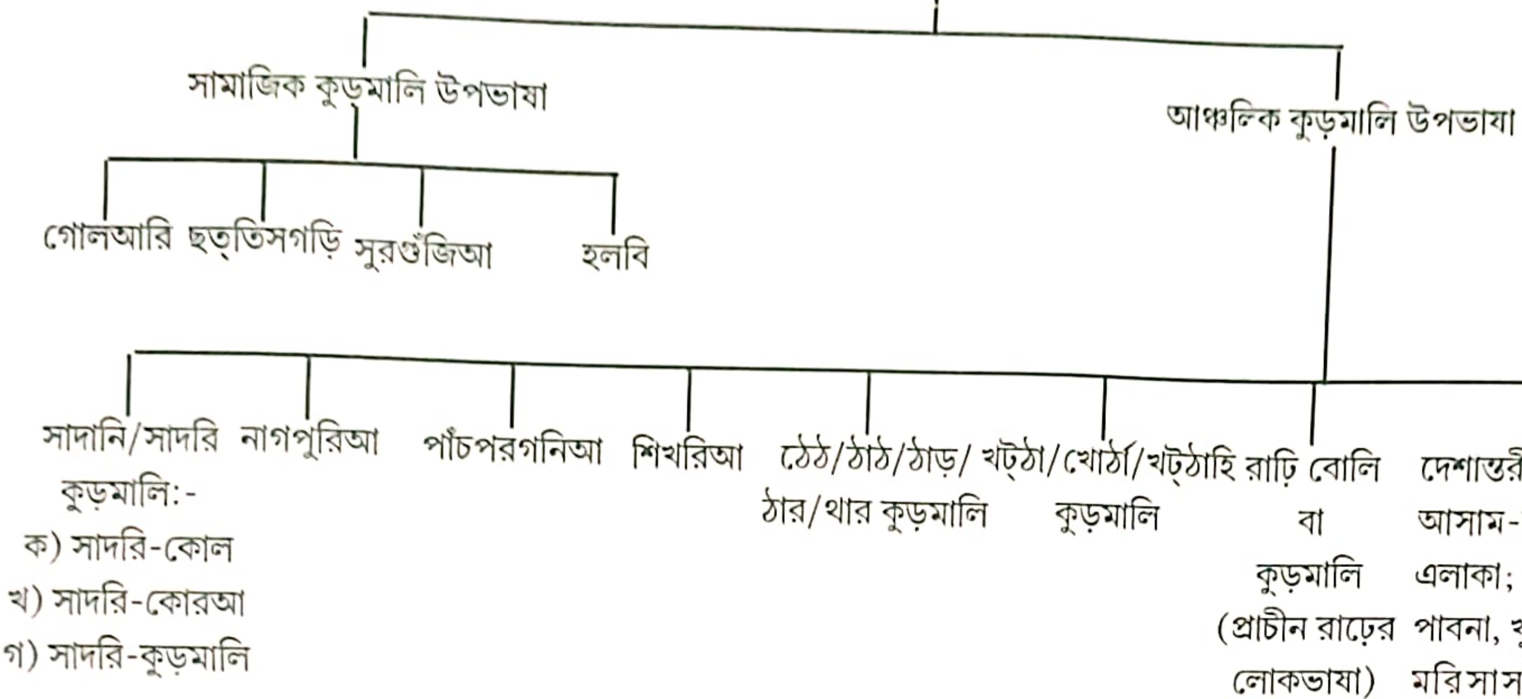
হত সেই সুপ্রাচীনকালেও কুড়মালি ভাষাটি লোকভাষা রূপে যেমন প্রচলিত ছিল এবং তেমনিভাবেই যদিও সাম্প্রতিককালেও এইসব অঞ্চলের লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্ব্বণ, নৃত্য-গীত, লোকসাহিত্য-লোকসংগীত প্রভৃতি সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বক্ষেত্রেই অন্যান্য জনজাতীয় ভাষা সাঁওতালি মুন্ডারি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা হিন্দী প্রভৃতি শক্তিশালী উন্নত নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলিকেও পর্যুদস্ত ও স্তব্ধপ্রায় করে দিয়ে আজও স্ব-গৌরবে স্ব-মহিমায় মাথা উঁচু করে স্মিত মুখে উচ্ছল যৌবনা কুড়মালি ভাষাটি নিজ আভ্যন্তরীণ অনন্যসাধারণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ' বৈশিষ্ট্যের জোরে দণ্ডায়মান থাকলেও পরিশেষে নির্বিকার রূপে জোর করে বলতে পারি যে, এই বর্তমান বাসভূমি ক্ষেত্রটি কিন্তু কুড়মি জনগোষ্ঠীটির আদি বাসভূমি বা মাতৃভূমি নয়। কারণ সর্বাধুনিক উপলব্ধ তথ্যাদির আধারে নির্বিবাদ রূপে জানতে পারা গেছে যে দ্রাবিড়ীয় সিন্ধুসভ্যতা অঞ্চলটিই যেমন হল বর্তমান প্রজন্মের কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষদের পূর্ব পুরুষদের 'আদি বাসভূমি' বা 'সত্যিকার মাতৃভূমি' তেমনি হল কুড়মালি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান কুড়মালি লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন, নৃত্য-গীত, লোকসাহিত্য-লোকসঙ্গীত, কৃষিভিত্তিক বর্তমান ঝাড়খন্ডী সংস্কৃতি প্রভৃতিরও 'আঁতুড়ঘর'। এককথায় বলা যায়, সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলই হল কুড়মিদের আদি বাসভূমি এবং ছোটনাগপুর মালভূমি বা প্রাচীন বৃহত্তর ঝাড়খন্ডটিই হল কুড়মিদের স্থানান্তরিত বর্তমান বাসভূমি ক্ষেত্র।

কিন্তু সে যাই হোক, এটা জানা কথা যে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক যে আলোচ্য "কুড়মালি ভাষার উপভাষা ভৌগলিক ক্ষেত্র" বিষয়টির আলোচনার সঙ্গে কুড়মিদের স্থানান্তরণের কোন প্রাসঙ্গিকতাই তো দেখা যাচ্ছে না। কাজেই উল্লিখিত 'কথার কথা'-র সব কথাই তো হচ্ছে ফালতু কথার কচ্‌কচানি মাত্র। কিন্তু আমার কাছে এটিই হল আসল কথা। কারণ ভারতের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চল থেকে এই সুদূরবর্তী পূর্বভারতীয় বৃহত্তর ঝাড়খন্ডে বা অবিভক্ত বিহার-বাংলা-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী ভূখন্ডের নানান দিকেদিকে কুড়মিদের পূর্বপুরুষদের সুদীর্ঘ স্থানান্তরণ পথের মাঝে মাঝে যেখানে যেখানে তাঁরা বাসা বেঁধে বেশ কিছুকাল বসবাস করেছিলেন সেখানে সেখানেই তাঁদের মাতৃভাষা কুড়মালি থেকে উদ্ভব ঘটেছে :- প্রথমতঃ চারটি 'সামাজিক' এবং দ্বিতীয়তঃ আটটি আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময় কুড়মালি উপভাষা-পারিজাতের। আর তাই সামাজিক কুড়মালি উপভাষা" এবং "আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা" সমূহের ক্রমানুসারী সম্ভাব্য উদ্ভবকাল তথা উদ্ভবস্থলের ভৌগোলিক পরিচিতি (অর্থাৎ কুড়মালি ভাষার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্রের পরিচয়)

থেকে যেমন কুড়মালির উপভাষা সমূহের পরিসংখ্যান জানতে পারা যায় তেমনিই জানতে পারা যায় যাবতীয় কুড়মালি উপভাষার এক-একটি ভৌগোলিক ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত মূল কুড়মালি ভাষাটির বৃহত্তর প্রচলন ক্ষেত্রের উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্রের পরিসীমা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কুড়মালি ভাষা থেকে সর্বপ্রথম উদ্ভব ঘটেছে "গোলআরি" সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির। আর তাই এই 'গোলআরি'র উদ্ভবের সম্ভাব্যকাল থেকে আরম্ভ করে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনকালীন কাল পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাগুলির মধ্যে সর্বশেষে উদ্ভূত 'খট্‌ঠা কুড়মালি' বা 'খোর্ঠা-কুড়মালি'র উদ্ভবকালের সুদীর্ঘ সময়কার লেখা-জোখা থেকে অনুমান করা পারা যায় যে কুড়মালির যাবতীয় উপভাষাগুলির উদ্ভবকালের মোটামুটি অবধি হল প্রায় হাজার তিনেক বছর। অর্থাৎ 'আর্যাবর্ত' প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালে 'ব্রাত্যদেশ'-এর গোয়ালিয়রে উদ্ভূত 'গোলআরি' সামাজিক কুড়মালি'-র উদ্ভবের সম্ভাব্যকাল ঋক্‌বৈদিক আনু ১০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে গ্রিয়ারসনের ভাষা সর্বেক্ষণের প্রারম্ভিক কাল ১৯-শ শতাব্দী পর্যন্ত)।

আবার অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম উদ্ভূত সামাজিক কুড়মালি উপভাষা 'গোলআরি'-র উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্রটিতেই সৈন্ধব অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত কুড়মিরা সর্বপ্রথম বসবাস স্থাপন করেছিলেন বলেই সর্বপ্রথম এই উপভাষাটিরও উদ্ভব ঘটেছিল। আর এমনিভাবে কুড়মালির যাবতীয় উপভাষার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্রগুলিকে সম্ভাব্য উদ্ভবের ক্রমানুসারী পরস্পর লাইন টেনে মিলিয়ে দিলেই গোয়ালিয়রের পথ ধরে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে (ডঁড় বনের) অন্তর্গত সমগ্র ছত্রিশগড়ে তথা ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিম দিকস্থ অরুনবন (রণবন) ও পূর্বদিকস্থ ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত 'ব্রাত্যদেশ'-এর যত্রতত্র কুড়মিদের ক্রমাগত স্থানান্তরনের সঙ্গে সঙ্গে বসবাস স্থাপনের প্রমাণ স্বরূপ কুড়মালি ভাষার উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্রের হদিসও অনায়াসে পেয়ে থাকি। কথাটিও হল ভাষা-বিজ্ঞান সম্মত। আর বলাবাহুল্য এমনিভাবে সমগ্র ছত্রিশগড় ও বর্তমান ঝাড়খন্ডের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সু-বিস্তৃত ভূখন্ডে য়েহেতু কুড়মিরা আজও ঘঁনভাবে বসবাস করে চলেছেন কাজেই এই ভূখন্ডটিকে কুড়মালি ভাষারও 'উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র' রূপেও জরিপ করতে কোন বাধা নেই বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কুড়মালি ভাষার উপভাষা গুচ্ছগুলি হল নিম্নরূপ:-


কুড়মালি ভাষার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র
অথবা
সৈন্ধব অঞ্চল থেকে কুড়মি জনগোষ্ঠীর ছোটনাগপুর মালভূমিতে স্থানান্তরণ-সাপেক্ষিক
কুড়মালি ভাষার উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র
কুড়মালি ঃ কুড়মিদের মাতৃভাষা
সামাজিক কুড়মালি উপভাষা
আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা
গোলআরি
ছত্তিসগড়ি
সুরগুঁজিআ
হলবি
সাদানি/সাদরি কুড়মালি:-
ক) সাদরি-কোল
খ) সাদরি-কোরআ
গ) সাদরি-কুড়মালি
নাগপুরিআ
পাঁচপরগনিআ
শিখরিআ
ঠেঠ/ঠাঠ/ঠাড়/ঠার/থার কুড়মালি
খট্ঠা/খোর্ঠা/খট্ঠাহি কুড়মালি
রাঢ়ি বোলি বা কুড়মালি (প্রাচীন রাঢ়ের লোকভাষা)
দেশান্তরীকরণজাত কুড়মালিঃ- আসাম-দার্জিংয়ের বিস্তৃত চা বাগান এলাকা; বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহি, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি জেলা; আফ্রিকার মরিসাস দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ বিদেশে স্থানান্তরিত কুড়মালি ভাষাভাষী লোকদের কুড়মালি ভাষা

২। সিন্ধু সভ্যতায় কুড়মালি ভাষার উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম :

পসঙ্গতঃ "কুড়মালি ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)" গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদি অনুসারেও জানতে পারা যায় যে, ১৯৭৪-৮৬ এবং ১৯৯৭-২০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সর্বাধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের পশ্চিমে নব্য প্রস্তর যুগে আনুঃ ৭০০০-৫৫০০ খ্রী. পূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতারও আগে বালুচিস্তান ও পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী মেহেরগড় নামক স্থানে মাত্র ৪৯৫ একর জমিতে একটি গ্রামীণ কৃষিসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আর এই মেহরগড়ে যে মানব সমূহটির বসবাস ছিল প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁদের যেমন 'প্রত্নদ্রাবিড়ীয় মূল মানবসমূহ' বলে অভিহিত করেছেন তেমনিভাবে তাঁদের ভাষাকেও 'প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় মূলভাষা' বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে কালক্রমে মেহরগড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই হোক বা লোকসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত কারণে কৃষিজমির অভাব দেখা দেওয়ার কারণেই হোক, মেহরগড়ের ঐ প্রত্নদ্রাবিড়ীয় মূল মানবসমূহটি আনুমানিক ৪০০০-৩১০০/৩০০০ খ্রী. পূর্বাব্দের মধ্যকালীন বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বদিকস্থ নদীপথ ধরে অগ্রসর হতে হতে বর্তমান পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত বোলান গিরিপথের পথ ধরে সিন্ধু সভ্যতার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেন তথা সৈন্ধব অঞ্চলের 'কুড়ম পাহাড়' এবং এই 'কুড়ম পাহাড়' এর পাদদেশে প্রবাহিত (আফগানিস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উদ্ভূত হওয়ার পর দক্ষিণ পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে সিন্ধু নদীর সঙ্গে ইসাখেল নামক স্থানে সম্মিলিত) প্রায় তিনশ কুড়ি কিলোমিটারেরও অধিক সুদীর্ঘ কুড়ম নদী অববাহিকাতে এসে কৃষিযোগ্য বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। আর এরপরে কালক্রমে আনুঃ ৩১০০/৩০০০ খ্রী. পূর্বাব্দ থেকে আনুমানিক ২৬০০/২৫০০ খ্রী. পূর্বাব্দের মধ্যে সুবৃহৎ সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়াচিন হিমবাহ তথা লাদাকের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণস্থিত সুদূরবর্তী সৌরাষ্ট্র তথা নর্মদা নদী অববাহিকা অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জুড়ে মেহরগড় থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত প্রত্নদ্রাবিড়ীয় মানুষদের স্থায়ী বসবাস গড়ে উঠে। আর এইভাবে কৃষিভিত্তিক সিন্ধু সভ্যতারও উন্মেষ ও বিকাশ চূড়ান্তভাবে এই সময়কালের মধ্যেই ঘটে।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে সবিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মেহরগড় থেকে বিভিন্ন সময়ে আগত প্রত্নদ্রাবিড়ীয় ঐ মূল ভাষাভাষী মানবসমূহটি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দূর-দূরান্তে বসবাস স্থাপন করার ফলে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক যোগাযোগ তথা কথাবার্তার আদান-প্রদান বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। কিন্তু একই একই সঙ্গে মিলেমিশে অঞ্চলে বসবাসকারী একাধিক ছোট ছোট

গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও কথাবার্তার আদান-প্রদান অব্যাহত থাকার ফলে মেহরগড়ের 'প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় মুলভাষা' থেকে এক-একটি দ্রাবিড় ভাষার স্বতন্ত্রভাবে উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। আর অনুরূপভাবে এক-একটি অঞ্চলে নব-উদ্ভূত এক-একটি দ্রাবিড় ভাষার নামানুসারে এক-একটি গোষ্ঠীরও স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে উঠে। এই দিক দিয়ে জানতে পারা যায় মেহরগড়ের প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় মূলভাষা থেকে সর্বপ্রথম যে দ্রাবিড় ভাষাটির উদ্ভব ঘটেছিল সেটি হল 'ব্রাহুই ভাষা'। বর্তমানে বালুচিস্তানে এই 'ব্রাহুই' ভাষাভাষী দ্রাবিড়ীয় (ইসলাম ধর্মাবলম্বী) মানুষের বসবাস বিদ্যমান। আর এই 'ব্রাহুই' ভাষাটির উদ্ভবকাল হল আনুঃ ৩১০০/৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। বলাবাহুল্য এমনিভাবে আনুঃ ৩১০০/৩০০০-২৬০০/২৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে ভারতীয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ও দ্রাবিড় ভাষার স্বতন্ত্র উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

অবশ্য একথাও ঠিক যে, অনুরূপভাবে আজ থেকে আনুমানিক সাড়ে চার-পাঁচ হাজার আগে সুবিস্তৃত সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দ্রাবিড়ীয় ভাষাবাষী মানুষদের স্থায়ী বসবাস গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন্ অঞ্চলে কোন্ দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল সে কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া না গেলেও আমাদের আলোচ্য দ্রাবিড়ীয় কুড়মি জনগোষ্ঠীটির বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মাতৃভাষা কুড়মালির উদ্ভবস্থলের কথা সুস্পষ্টভাবে যে জানতে পারা যায় সে কথাও জোর করে বলতে পারি। এই দিকে দিয়ে দেখা যায় যে, আলোচ্য কুড়মি জনগোষ্ঠীটির নামকরণমূলক 'কুড়মি' শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মাতৃভাষাটির নামকরণ 'কুড়মালি' শব্দ দুটির সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে আজও বিদ্যমান (বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত) 'কুড়ম পাহাড়', 'কুড়ম নদী' এমনকি 'কুড়ম জেলা' নামক পেশোয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য জেলার নামকরণ বাচক শব্দগুলির সৌসাদৃশ্যের খেই ধরে 'ভাষাবৈজ্ঞানিক' 'সামাজিক ভাষাবিজ্ঞান', 'সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান' প্রভৃতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বলতে বাধা নেই যে, কুড়মি জনগোষ্ঠীটির আদি বাসস্থান, স্বতন্ত্র পরিচিত তথা কুড়মালি ভাষার সৈন্ধব ভৌগোলিক ক্ষেত্রও হল ঐসব অঞ্চল। প্রসঙ্গতঃ ব্যবহারিক এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলতে পারা যায় যে, বর্তমান কুড়মি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরাই সর্বপ্রথম মেহরগড়ের 'প্রত্ন দ্রাবিড়ীয় মূল মানব সমূহটি' থেকে ছোট ছোট গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত হয়ে আসার পর সমগ্র কুড়ম নদী অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন তথা আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই মেহরগড় থেকে পরবর্তীকালে আগত অন্যান্য গোষ্ঠীব মানুষদের নিকট তাঁরা যেমন 'কুড়ম অঞ্চলের অধিবাসী অর্থে 'কুড়মি' অভিধায় অভিহিত হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যেই স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত

মাতৃভাষাটিও 'কুড়মিদের ভাষা অর্থে 'কুড়মালি' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। আর কালক্রমে কৃষিযোগ্য জমির পরিসীমা ক্রমাগত প্রসারিত করতে করতে মূল বাসভূমি কুড়ম নদী অববাহিকার সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য বিভিন্ন নদি উপনদীর (যথা-'শায়ক' বা 'শাঁক', 'নুরা', 'সিন্ধু' সরস্বতী প্রভৃতি) অববাহিকা অঞ্চলে অর্থাৎ সৈন্ধব অঞ্চলের সমগ্র উত্তর থেকে দক্ষিণের সরস্বতী নদীর সীমানা পর্যন্ত মধ্যভাগে একদা কুড়মিদের বসবাসও স্থাপিত হয়েছিল। আর এইভাবেই সিন্ধসভ্যতা অঞ্চলে বসবাসকালীন সময়েই (অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে আনুমানিক ৩১০০/৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বব্দি থেকে ২৬০০/২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বব্দি পর্যন্ত) কুড়মিদের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশও সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের সমগ্র উত্তর ও মধ্যভাগে (অন্ততঃ সরস্বতী নদীর সীমানা পর্যন্ত) হয়েছিল বলেই আজও বর্তমান প্রজন্মের কুড়মিদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত উৎসব-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি, নৃত্য-গীত প্রভৃতি সম্পর্কিত অজস্র শ্রুতি-স্মৃতিবাহী লোকগীত, লোক-সাহিত্য, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বৈচত্র্যময় ও অনন্যসাধারণ কুড়মালি 'মানস সম্পদ'-এর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বিধৃত ও বিবৃত সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদী উপনদী পাহাড়-পর্বত, স্থান-নাম প্রভৃতির উল্লেখ সুস্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। আর এইভাবে তথ্যাদির ভিত্তিতে জোর করে বলতে পারি যে, সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলই হল কুড়মিদের গোষ্ঠীভিত্তিক স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি ভাষা, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, সভ্যতা আদি সম্পর্কিত সবকিছুরই 'আঁতুড়ঘর'। (দ্রষ্টব্য:- কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত)

আর এইভাবে একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, সমগ্র মধ্য ও উত্তর সৈন্ধব অঞ্চলে কুড়মিদের স্থায়ী বসবাস গড়ে উঠার কারণেই সেকালে তাঁদের মাতৃভাষা কুড়মালিটিও ঐসব সুবিস্তৃত ভূ-ভাগের লোকভাষা রুপেও প্রচলিত ছিল। কারণ কুড়মি জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা যে সেকালেও কম ছিল না সেকথা বলারও যুক্তি আছে। কারণ কুড়মিদের লোকসংখ্যা কম থাকলে হিমালয়ের লাদাকের কাছ থেকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত বসবাস স্থাপন করাও সম্ভব হত না।

মন্তব্যটির সমর্থনে সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীদের 'টোটেমিক বিশ্বাস'-এর খেই ধরেও বলতে পারা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার দ্রাবিড়ীয় অধিবাসীদের সমাজে বিভিন্ন ধরণের যে -সব টোটেম ও টোটেম নির্দেশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল এবং যেগুলির প্রমাণও চিত্রলিপিমূলক সিন্ধুলিপির মধ্যে পাওয়া যায় বর্তমানের কুড়মি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ঐসব টোটেম বিশ্বাস ও টোটেম নির্দেশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত রয়েছে। আর এইদিক দিয়ে দেখা যায় যে, আলোচ্য কুড়মি জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা যে

সৈন্ধব অঞ্চলেও অত্যদিক ছিল তার অনুমানও অনায়াসে করতে পাওয়া কুড়মিদের বহু সংখ্যক টোটেমিক গোষ্ঠীর (মূলতঃ ৮১ টি টোটেমিক গোষ্ঠীর কোন কোনটির শাখা-প্রশাখা সহ সংখ্যায় প্রায় শতাধিক) পরিসংখ্যান থেকে। আর যেহেতু টোটেমবাদের উদ্ভবস্থলই হল সৈন্ধব অঞ্চল তাই এই ক্ষেত্রে অনায়াসে অনুমিত যে মেহরগড় থেকে অন্ততঃ ৮১টি গোষ্ঠীতে বা দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৈন্ধব অঞ্চলে আগমনের পর কুড়ম নদীর অববাহিকায় পৃথক পৃথকভাবে বসবাসের কারণেই ঐ মূল ৮১ টি গোষ্ঠীর মধ্যে ৮১ টি টোটেমের তথা কোন কোনটির শাখা-প্রশাখা সহ প্রায় শতাধিক টোটেমিক কুড়মি গোষ্ঠীর পরিচিতিও ঐ সৈন্ধব অঞ্চলেই ঘটেছিল। কাজেই সেকালেও কুড়মিদের জনসংখ্যার আধিক্য থাকাও যেমন হল যুক্তিসঙ্গত তেমনি কুড়মালি ভাষাটিরও লোকভাষা রূপে প্রচলনের কথাটিও হল একান্তভাবেই যুক্তিযুক্ত। সিন্ধুলিপির মধ্যে প্রাপ্ত টোটেম নির্দেশক চিহ্নগুলির সঙ্গে কুড়মি জনগোষ্ঠীর টোটেম নির্দেশক চিহ্নের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য থেকেও অনায়াসে অনুমেয় যে, ঐ সিন্ধু লিপির ভাষাটিও ছিল নিশ্চিতভাবে কুড়মালি ।(বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কুড়মিদের বাসভূমির অন্তর্গত 'মাহান-দ-জড়', 'হড়প্‌পা'-য় প্রাপ্ত সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার অদ্যাবধি না হওয়ার কারণে পণ্ডিত-গবেষক কেউই সিন্ধুসভ্যতার ভাষা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কোন মত প্রকাশ করতে আজও অক্ষমই রয়ে গেছেন। কিন্তু সে যাই হোক উল্লিখিত তথ্যভিত্তিক আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সিন্ধুলিপির ভাষা হল দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা। তাছাড়া প্রসঙ্গতঃ একথাও বলতে পারি যে, যাবতীয় ভারতীয় দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র কুড়মালি ভাষা ছাড়া আর কোনটিরই উদ্ভবস্থল বা প্রচলন ক্ষেত্র সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোন্ অঞ্চলে ছিল তা বলার কোন উপায়ই নেই।

৩। সিন্ধু সভ্যতার কালান্তর তথা সিন্ধুবাসী দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠী সমূহের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরণের প্রসঙ্গক্রম :

ঋক্‌বেদ তথা ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সিন্ধু সভ্যতার উপর আর্যদের দ্বারা আক্রমণ ঘটার পর সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসী তথাকথিত 'অন-আর্য' দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে আর্যদের বহুদিন ধরে চলেছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ঋক্‌বেদের প্রাচীন মন্ত্রাদি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা যায় যে, আর্যরা ছিলেন প্রবল ও দুর্ধর্ষ মানুষ। যুদ্ধ জয় ও শত্রু নাশ ছিল তাঁদের সাধনা, জীবনের সুখভোগে তাঁদের ছিল পরম আগ্রহ। আর যেহেতু তাঁরা যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহার করতেন তাই ঐ আর্য ও অনার্যের সংঘর্ষে আর্যরা সর্বত্রই হতেন

বিজয়ী। কারণ ওই অশ্বশক্তিই ছিল আর্যদের শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্র বা 'মারক যন্ত্র'। তাই হড়প্পা-মাহান-দ-জড়র সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সিন্ধু সভ্যতার সেই রাষ্ট্রশাসিত পৌরসভ্যতাকেও আর্যরা ধ্বংস করেত সক্ষম হয়েছিলেন। আর ঐ পৌর সভ্যতা ধ্বংস করার কারণেই আর্য দলপতি ইন্দ্রও 'পুরন্দর' নামে অভিহিত হয়ে পড়েন (পুরন্দর অর্থাৎ শতাধিক 'পুর' বা জনবসতি বা গ্রাম ধ্বংস করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের নামও হয়েছে 'পুরন্দর')। আর এইভাবে সিন্ধু সভ্যার উপর মূলতঃ পশুপালক যাযাবর আর্যদের আক্রমনের ফলেই আনুমানিক ৩১০০/৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক ২৬০০/২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সবর্ঙ্গীণভাবে বিকশিত সিন্ধু সভ্যতার কৃষিভিত্তিক দ্রাবিড়ীয় অধিবাসীদের সুখ শান্তিপূর্ণ সমাজজীবনের ইতিহাসে দেখা দেয় কালান্তর। এইদিক দেয়ে বলতে পারা যায় যে অন্ততঃ ঋক্‌বৈদিক আর্যরাই ছিলেন ঐ সিন্ধু সভ্যতার কালান্তক (গোপাল হালদারঃ সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ বৈশাখ-১৩৯০, পৃষ্ঠা-১২৩,১২৪)। সিন্ধুবাসীগণের মধ্যে যাঁরা ঐ যুদ্ধে বেঁচে গেলেন (অর্থাৎ আর্যগণ যাঁদের না পারলেন মারতে, আর না পারলেন বন্দী করে 'দাসত্ব' স্বীকার করাতে) তাঁরা আর্যাভিযানের গতি প্রকৃতি ও দিকের নিরূপণ করে (অর্থাৎ কোন্‌দিকে থেকে আক্রমণ চলছে তা দেখে নিয়ে) আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে করতে ভারতের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

অতঃপর উল্লিখিত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, তামিল, তেলেগু, কন্নড় প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীগুলি দাক্ষিণাত্যের দুর্গম অঞ্চলেই পালিয়ে যাবার কারণ কি? আর, কুড়মি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে না গিয়ে পূর্ব ভারতীয় বর্তমান বাসভূমি অঞ্চলে স্থানান্তরনেরই বা কারণ কি? প্রশ্ন দুটির সদুত্তর কোথাও আছে, না নেই, অন্ততঃ আমার যে জানা নেই তা আমি খোলামনেই স্বীকার করছি। তবে যেহেতু এই প্রশ্ন দুটিও হল আমারই খামখেয়ালী মনের 'জিজ্ঞাসা' এবং এই প্রশ্নদুটির উপর আমার আলোচ্য বিষয়টিরও ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। তাই যথাসম্ভব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টাও করা হল। তাই যথার্থ-অযথার্থের বিচারের ভারও পাঠকমহলের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

প্রসঙ্গতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের 'বল-প্রয়োগ সিদ্ধান্ত' এর কথা এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। কোন বস্তুর (বা বস্তু সমষ্টির) উপর যখন বল প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ বস্তু (বা বস্তু সমষ্টি) প্রযুক্ত বলের অনুকূলে সম্মুখের দিকেই সরে যায়। অনুরূপভাবে আর্যাভিযানের 'বল' (বা শক্তি বা আঘাত) প্রয়োগের খেই ধরে বলতে পারি যে সিন্ধুবাসীদের উপর পশ্চিমস্থিত আফগানিস্থানের দিক থেকে বারংবার

আক্রমন চালানো হয়েছিল (বা 'বল' বা শক্তি প্রযুক্ত হয়েছিল)। আর তাই পশ্চিম দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ঐসব অঞ্চলে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীগুলিও পূর্ব দিকে (অর্থাৎ আঘাতের অনুকূলে সম্মুখ দিকস্থ মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়-ঝাড়খন্ড-বাংলা-উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্যা হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য অনুরূপভাবে আত্মরক্ষার্থ যে কয়েকটি দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠী মধ্য ও মধ্য-পূর্ব ভারতে আজও স্থায়ীভাবে বসবাস করে চলেছেন সেগুলি হল যথাক্রমে গোন্ড (গোঁড় বা খোড়), কুড়ুখ (ওরাঁও-কোল,ভূমিজ) কুড়মি ও মালতো। দ্রাবিড় ভাষাবিদ্‌গণ এইগুলিকে 'মধ্যদেশীয় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী' বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে আরও বলতে পারা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে বসবাসকারী তামিল,তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীগুলির আদি বাসস্থান সম্ভবতঃ সরস্বতী নদীর দক্ষিণ দিক থেকে আরম্ভ করে নর্মদা নদী উপত্যকাসহ সংশ্লিষ্ট আরব সাগরের তটভূমিতে প্রসারিত ছিল এবং এটি হল 'দক্ষিণ সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চল'। আর সম্ভবতঃ এই কারণেই সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলের দক্ষিণাংশের উপর যখন আর্যদের আক্রমণ উত্তর দিক থেকে শুরু হয় তখন সিন্ধু সভ্যতার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী তামিল, তেলেগু, কন্নড়, দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক কারণেই আত্মরক্ষার তাগিদে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক প্রভৃতি দুর্গম পার্বত্য ও আরণ্যক অঞ্চলেই পালিয়ে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁদের বলা হয় 'দক্ষিণ দেশীয় দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী'।

***'কুড়মি'-'থরু' প্রসঙ্গ :**

আলোচনার প্রথমেই এই ক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্ন জাগে যে সিন্ধু সভ্যতার কালান্তরের পর সেখানকার অধিবাসীদের পূর্বাভিমুখীন তথা দক্ষিণাভিমুখীন পলায়নের কথা তো জানতে পারা যায় ঠিকই কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চল থেকে কি উত্তরাভিমুখীন হয়ে কোন গোষ্ঠীরই পলায়ন ঘটেনি? যদিও আর্যাবর্তে সিন্ধুবাসীদের পলায়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না ঠিকই কিন্তু তারও উত্তরে সৈন্ধব অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী নেপাল পভৃতি পার্বত্য এলাকাতে পলায়নের সম্ভাবনার প্রশ্নকেও তো এক কথায় উড়িয়েও দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে নেপালের পশ্চিম তরাই অঞ্চলে ঘনভাবে বসবাসকারী 'থরু' আদিম জনগোষ্ঠীর কথা বলতে পারা যায়। কারণ এই 'থরু' আদিম জনগোষ্ঠীটির জাতিসত্বাগত বৈশিষ্ঠ্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিভিত্তিক আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক (স্বায়ত্বশাসনমূলক সামাজিক সংস্থা), ধার্মিক, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, টোটেমিক গোষ্ঠী পরিচিতি, পূজাপার্বন, রীতিনীতি, কৃষিকর্ম বিষয়ক নানান কার্য, শব্দ ভান্ডারমূলক সাদৃশ্য, এমনকি এঁদের জীবনচর্যার প্রতিক্ষেত্রেই কুড়মি জনগোষ্ঠীর বিশেষ

কোন পার্থক্যই তো দেখা যায় না। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কুড়মিদের পূর্ব পুরুষেরা যখন সিন্ধুসভ্যতা অঞ্চলের একেবারে উত্তরাংশ থেকে মধ্যাংশের দক্ষিণস্থিত সরস্বতী নদীর অববাহিকা পর্যন্ত একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন সেই সময়কালে 'থর' মরুভূমির পশ্চিম পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস স্থাপনের সুবাদে কুড়মি জনগোষ্ঠীরই কিছু সংখ্যক মানুষদের পরিচয় 'থরু' হয়ে পড়ার পিছনে ভাষাতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে থর মরুভূমির পশ্চিম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিসীমা ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকার ফলে 'সরস্বতী' নদীটি যেমন থর মরুভূমির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে তেমনিভাবে 'থরু' নামে অভিহিত কুড়মিদের কৃষিক্ষেত্রও থর মরুভূমিতে ক্রমাগত বিলুপ্ত হতে থাকার কারণে ঐ থরুরাও উত্তর-সৈন্ধব অঞ্চলে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন। আর কালক্রমে যখন সিন্ধু সভ্যতার উপর পশ্চিমদিক থেকে আর্যাভিযান শুরু হয় তখন এই 'থরু' কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই আরও উত্তরাভিমুখে পলায়ন করে পার্শ্ববর্তী নেপালের পশ্চিম তরাই অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেন। আর তাই বাস্তব ও ব্যবহারিক যুক্তির্তক তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাম্যের অনুসারে বলতে বাধা নেই যে বর্তমানে নেপালে বসবাসকারী 'থরুদের' সঙ্গে 'কুড়মিদের' জীবনধারার মধ্যে এত মিল পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১। টোটেমিক গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য : কুড়মি এবং থরু উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর এক একটি টোটেম বিদ্যমান। বিশেষতঃ বিবাহ ও অলৌকিক শক্তির পূজা, ঝাড় ফুঁকের সময় গোষ্ঠী পরিচিতিমূলক টোটেম অনিবার্য ভাবেই জানতে হয়।

২। বৈবাহিক সম্বন্ধ : স্ব-গোষ্ঠী বাদ দিয়ে স্বজাতীয় অন্য যেকোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

৩। পারিবারিক সম্বন্ধ : কুড়মিদের পরিবারে মতোই 'থরু' পরিবারেও বয়োবৃদ্ধরাই প্রত্যেকটি থরু পরিবারের কর্তা, বা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যাঁদের বলা হয় 'গড় ধুরুআ'। কুড়মালিতে 'গড় ধুরুআ' শব্দটির অর্থ হল 'যাঁর পদধূলি শিরোধার্য', অর্থাৎ পরিবারের বয়োবৃদ্ধ কর্তা ব্যক্তি।

৪। **সামাজিক সম্বন্ধ :** বিশেষতঃ 'ভাইআদি' সম্পর্কযুক্ত এক এক গোষ্ঠীর পরিবারগুলি গ্রামে পাশাপাশি বসবাস করে।

৫। **অর্থনৈতিক অবস্থা :** উভয়তঃই হাল-জোয়াল দিয়ে পরম্পরাগতভাবে বংশানুক্রমিক কৃষিকার্যই হল প্রধান জীবিকা।

৬। **স্বশাসন সমাজব্যবস্থা :** উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে হুবহু একই ধরণের 'মাহাত', 'পটঅইর',

'দেহরি' 'পরগনইত', 'দেশমড়ল' (থরুদের ভাষায় 'দেশবন্ধ্যা') প্রভৃতির দ্বারা গ্রামীণ ও সামাজিক সব ধরণের সমস্যার সমাধান করা হয়।

৭। ধার্মিক অবস্থা : উভয়তঃই 'মাহাত'-ই যেমন হলেন গ্রাম প্রধান তেমনিই মাহাতই গ্রামীণ 'গরাম পূজা' প্রভৃতির পূজারীর কাজও করে থাকেন। 'গরাম পূজা'য় পাঁঠা-ভেড়া-পাখির বলি দেওয়া হয়। বলির 'মুড়', 'চেড়ু' হল পূজারী মাহাতর পাওনা। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সম্পর্কিত রীতিনীতি মাহাতর দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ১০/১২ বছর অন্তর কুড়মিদের 'আখড়া পূজা' (সুজ্জাহি বা 'ধরম পূজা') হুবহু থরুদের মধ্যেও গোষ্ঠীভিত্তিক 'বড়কা পূজা' নামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজারী হন ঐ গোষ্ঠীরই বয়োজ্যেষ্ঠ 'গড়ধুরুআ'। পরিবারের সমস্ত পুরুষ পূজায় সম্মিলিত হন। পাঁঠা ভেড়া বলি দিয়ে সমবেত ভোজও হয়। উভয়তঃই সামাজিক, ধার্মিক কোন অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণের কোন স্থান নেই। মাহাত হলেন গ্রামের সর্বমান্য সম্মানীয় ব্যাক্তি।

৮। জাদু-টোনা-ভূত-প্রেতে বিশ্বাস : উভয়গোষ্ঠীর মধ্যেই বিদ্যমান। অসুখে-বিসুখে ওঝা-গুণীরা ঝাড় ফুঁক মন্ত্রাদির দ্বারা ভূত-প্রেত তথা অলৌকিক দুষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও শান্ত করার জন্য ধার্মিক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। আবার ঐসব অলৌকিক শক্তি, ভূত-প্রেত-প্রেতাত্মা প্রভৃতিকে শান্ত করার জন্য 'মানত' বা 'মানসিক' করার প্রথাও প্রচলিত।

উল্লিখিতভাবে 'কুড়মি' ও 'থরু' দের জাতিসত্ত্বাগত সাদৃশ্য ছাড়াও উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষায়িক সৌসাদৃশ্য থেকেও বলতে পারা যায় যে থরুদের ভাষাও হল মূলতঃ কুড়মালিরই একটি আঞ্চলিক রূপমাত্র এবং 'থরু' হল উত্তরাঞ্চলীয় দ্রাবিড়ীয় কুড়মি।

*** 'থরু'দের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ও কুড়মালি :** (অতিসংক্ষিপ্ত)

থরু ভাষার শব্দ	কুড়মালি শব্দ	কুড়মালি অর্থ
ডন্‌গ্	ডন্‌গ্	জলসেচনের নালা
মাহাত	মাহাত	গ্রামপ্রধান, পূজারী
পটুঅইর	পটুঅইর	মাহাতর সহকর্মী
পরগণইত	পরগণইত	পরগনার অধিকর্তা
দেশবন্ধ্যা	দেশমড়ল	দেশের বা মুলুকের কথা
হাল	হার = হাল	হাল
মাড়ভাত	মাড়ভাত	ফেনভাত
কাটনিবেগার	কাটনিবেগার	ধান কাটার বেগার
বুইনি বেগার	বুইনিবেগার	ধানবোনার বেগার
গড় ধুরুআ	গড় ধুরুআ	পদধূলি, আদি।

কিন্তু সে যাইহোক, বিষয়টি হল একান্তভাবে গবেষণা সাপেক্ষ। কারণ কোথায় নেপালের 'থরু' জনজাতি আর কোথায় বা বৃহত্তর ঝাড়খন্ডের কুড়মি জনগোষ্ঠী! অথচ এত মিল!!
(Source :- 'Tharus of Dang : Tharu Religion'- Drone Pd. Rajaure (Kathmandu) Page61-96.)
Collected from:- Journal of Himalayan Studies, Kailash : Vol-9, No.1,1982

৪) সৈন্ধর্ব অঞ্চল থেকে ছোটনাগপুর মালভূমিতে কুড়মি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের স্থানান্তরণের প্রসঙ্গক্রম :

উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বলতে পারা যায় যে, একদা যেহেতু সমগ্র উত্তর ও মধ্যবর্তী সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে বর্তমান প্রজন্মের কুড়মি জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষেরা স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেছিলেন ও তাঁদের উপর পশ্চিমদিকস্থ আফগানিস্থানের দিকে থেকে আর্যদের আক্রমণ শুরু হয়েছিল। তাই তাঁরা তখন আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ার পর পূর্বমুখে মধ্যভারতের দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। কিন্তু মধ্যভারতের অভিমুখে পালিয়ে আসতে আসতে তাঁরা সিন্ধুনদীর পূর্ব প্রান্তস্থিত দিগন্ত প্রসারিত থর মরুভূমিতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কারণ এই মহামরুস্থলটি হল যেমন দিগন্ত বিস্তৃত, তেমনি এখানে সর্বদাই প্রাণান্তকারী প্রচণ্ড উত্তপ্ত মরুস্থলীয় ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হতে থাকে। এই মরুভূমির বিস্তৃতি হল উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিমস্থিত যমুনা নদীর দক্ষিণ পশ্চিমের প্রশস্ত উপত্যকা থেকে আরম্ভ করে ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণে টেরা ভাবে অবস্থিত আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিম দিকস্থ সমগ্র তরাই অঞ্চলের সমান্তরালভাবে বর্তমান পাকিস্তানের সীমানা পর্যন্ত। আর তাই অনুমান কুড়মি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা এই 'থর' মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তস্থিত পথ ধরে উত্তর-পূর্ব মুখে চলতে চলতে পরিশেষে, আরাবল্লী পর্বতমালা সহ থর মরুভূমির উত্তর সীমানা অতিক্রম করে মধ্যপ্রদেশের একেবারে উত্তরপশ্চিম সীমান্তস্থিত গোয়ালিয়র জেলায় উপস্থিত হন। বলাবাহুল্য এইভাবে গোয়ালিয়রে বসবাস স্থাপনের পরেও তাঁদের চলতে থাকে একস্থান থেকে আবার অন্য স্থানে ক্রমাগত স্থানান্তরণ এবং পরিশেষে তাঁরা বৃহত্তর ঝাড়খন্ডে এসে কৃষিযোগ্য সমগ্র স্থান জুড়ে স্থায়ী বসবাস ও আধিপত্য স্থাপন করেন।

অবশ্য প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আজ থেকে সাড়ে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে কুড়ম নদী অববাহিকায় 'প্রত্ন দ্রাবিড়ীয় মূলভাষা' থেকে উদ্ভূত হওয়ার পর কুড়মালি ভাষাটি অদ্যাবধি নানা বিপর্যয়, নানান পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল

অবস্থা তথা কালানুসারী উত্থিত নানান রাজনৈতিক ধকলকে নিজস্ব 'ভাষাগত বৈচিত্র্যময় প্রাণ প্রাচুর্যের জোরে' অবলীলায় অতিক্রম করে নানান বিবর্তন পরিবর্তনের পথ ধরে কুড়মালি ভাষাটির অগ্রসরণ অদ্যাবধি যেমন অব্যাহতই রয়ে গেছে তেমনিই হয়ে আছে যৌবনোচ্ছলা। সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে বসবাসকালীন কালাবধি থেকেই কৃষিবিদ্যায় সুনিপুণ কুড়মি জনগোষ্ঠার মানুষেরাই যে আবার বহুল পরিচিত ঝাড়খন্ডী কৃষিসভ্যতা-সংস্কৃতি তথা অর্থনৈতিক কাঠামোটির 'খামখুঁটা' বা কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে সহজাত অসীম মমতা নিয়ে আজও সমস্ত কিছুর লালন-পালন করে চলেছেন সেকথাও হল অনস্বীকার্য। আসলে কুড়মিরাই হচ্ছেন এতদ্ঞ্চলের কৃষিসভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সবেমাত্র দু'তিন 'পিড়হি' আগেও এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলি সবাই ছিলেন 'বঁটাধারী' বলেই যেমন নিজেদের গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস লিখে রাখতে পারেননি তেমনি আর্যাভিমানী শিক্ষিত কেউই এঁদের দিকে কখনও ফিরে চাননি, এঁদের সংস্কৃতি-সভ্যতা বোঝার আগ্রহ পর্যন্ত দেখাননি। কিন্তু সে যাই হোক কৃষিই যেহেতু এঁদের বংশানুক্রমিক পেশা তাই হালের ফালে দুর্বোধ্য লিপিতে আদি মাতার আঁচলে লিখিত কৃষি-সাহিত্যের পাঠোদ্ধার করে জোর করে বলতে পারি— "The Kurdmi people,is,no doubt the pivot, around which the whole Agro-Eco-Cultural Civilization of Jharkhand Clusters."।

৫। কুড়মালি ভাষার উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র পরিক্রমা :

সুদীর্ঘ কালাবধি কুড়মিদের ইতিহাস অনুদ্ঘাটিত থাকার কারণেই 'কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)' গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে যে ধরনের বাস্তব ও ব্যবহারিক মনন-মন্থন করতে করতে যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত ও তর্কসঙ্গত দৃষ্টিকোণে উপলব্ধ তথ্যাদির তন্নতন্ন 'দাঁজা-ভাঁজা' (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ) করতে হয়েছিল বর্তমানের আলোচ্য বিষয়টিও অনুরূপভাবে অদ্যাবধি অনালোচিত থাকার কারণেই এই ক্ষেত্রেও কুড়মালি উপভাষাসমূহের কালানুক্রমিক উদ্ভব, বিকাশ ও প্রচলন ক্ষেত্রের সামূহিক পরিসীমার পরিমাপন প্রভৃতির আলোচনা করার জন্যও উপরোক্ত পদ্ধতিরই যথাসম্ভব অনুসরণের প্রচেষ্টা করা হল।

অতঃপর কুড়মালির উপভাষার প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জোর করে বলতে পারা যায় যে কুড়মালির যত সংখ্যক উপভাষা আছে অন্য কোন ভাষার ক্ষেত্রেই তা দেখা যায় না। আর এই দিক দিয়ে বলতে পারা যায় যে আর্যাভিযানের ফলে পরাজিত কুড়মি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুখ প্রভৃতি অন্যান্য যে-সব অনার্য মানুষ মধ্যভারতের পথ ধরে বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বতের দুর্গম আশ্রয়ে অর্থাৎ

বর্তমান মধ্যপ্রদেশ-বিহার-বাংলা-উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আত্মগোপন করে কৃষিযোগ্য নানান স্থানে স্থায়ীভাবে যে কালে বসবাস স্থাপন করেছিলেন তখন থেকেই কুড়মালি ভাষাটি সর্বত্র লোকভাষা রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে বলেই বহু সংখ্যক কুড়মালি উপভাষারও যে উদ্ভব ঘটেছে সে কথাও হল তথ্যভিত্তিক সত্য। কারণ সেই সময়কালে গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি উত্তর ভারতের নদী অববাহিকার সুবিস্তৃত সমতল ভূ ভাগে একদিকে যেমন স্থায়ী হয়ে পড়েছিল আর্যপ্রভুত্ব বা 'আর্যাবর্ত' দেশ তেমনি ঐ আর্যাবর্তের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত সমগ্র মধ্যভারত জুড়ে গড়ে উঠেছিল আর্যদের দ্বারা সিন্ধু-বিতাড়িত অনার্য দ্রাবিড়দের আধিপত্যাধীন 'ব্রাত্যদেশ' অর্থাৎ বেদ বিরোধী অপবিত্র শত্রুদের দেশ। আর এই ক্ষেত্রে তর্কসঙ্গত অনুমানের দ্বারা বলতে বাধা নেই যে, বর্তমানকালেও এতদ্ঞ্চলে বসবাসকারী কুড়মি জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যার তুলনায় কুড়ুখ গোঁড় প্রভৃতির লোকসংখ্যা যেহেতু নিতান্ত কম তাই সে-ই সুপ্রাচীন 'ব্রাত্যদেশ' -এও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের জনসংখ্যা কুড়মিদের তুলনায় কম থাকার কারণেই সেকালেও কুড়মিদের আধিপত্যকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনিভাবে কুড়ুখ, গোঁড় প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাকেও লোকভাষা করার 'জো' (যুক্তি) দেখা যায় না। তাছাড়া, তখনও আর্যও অনার্যের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিভীষিকা বর্তমান ছিল বলেই আর্যভাষার প্রচলন যে আর্যাবর্ত-বহির্ভূত ব্রাত্যদেশে অসম্ভব ছিল সেকথাও জোর দিয়ে বলা যায়। আর এইভাবে ভাষাবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে একথাও বলতে পারা যায় যে, কালানুক্রমে কুড়মিদের ক্রমানুসারী স্থানান্তরণ ও নানান স্থানে বসবাস স্থাপন যেমন যেমন চলতে থাকে ঠিক তেমনিভাবেই নানান অঞ্চলে কালানুক্রমিকভাবে নানান কুড়মালি উপভাষারও উদ্ভবও ঘটে।

অবশ্য এইক্ষেত্রে সবিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যখন কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত কোন উপভাষার কথা বলা হয় তখন সবাই সাধারণভাবেই ধরে নেন যে, প্রাসঙ্গিক উপভাষাটি স্বরূপতঃ হল 'আঞ্চলিক উপভাষা'। অর্থাৎ ঐ মূলভাষাটিই লোকভাষারূপে এক বা একাধিক ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত থাকার কারণে আঞ্চলিক প্রভাবে মূল ভাষাটির স্বরূপের বা ভাষাছাঁদের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে বিস্তর পার্থক্য ঘটে থাকে এবং এইভাবে নতুনরূপে উদ্ভূত ভাষাটিই হল ঐ মূল ভাষাটির উপভাষা।

তবে 'সামাজিক ভাষা বিজ্ঞান' সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান', 'সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান' প্রভৃতি থেকে জানতে পারা যায় যে বিশেষতঃ গোষ্ঠীনাম বাচক এমনও আদিম ভাষা থাকতে পারে যেগুলি থেকে 'আঞ্চলিক উপভাষার' উদ্ভবের আগেই 'সামাজিক উপভাষা' নামক একধরণের বিশিষ্ট উপভাষার উদ্ভব ঘটতে পারে। কারণ, যদি কোন বিশেষ

পরিস্থিতিজনিত কারণে কোন আদিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবহুল মানুষ মূলসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বা ততোধিক দল বা গোষ্ঠীভুক্ত লোকগুলি দূর-দূরান্তে দলগত সম্পর্কবিহীন ভাবে এক বা ততোধিক অঞ্চলে স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতে থাকেন তাহলে মূল ভাষাটির তুলনায় তাঁদের কথ্য ভাষার মধ্যে স্বরূপগত বা ভাষাছাঁদগত পার্থক্য দেখা দেওয়ার ফলে যে নতুন এক ধরণের ভাষার উদ্ভব ঘটে তাই হল ঐ মূল ভাষাটির 'সামাজিক উপভাষা'। (অর্থাৎ, একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একই ভাষাভাষীর মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাসের কারণে মূল ভাষার বিবর্হিত ভাষা রূপ)। বলা বাহুল্য অন্ততঃ আমার জ্ঞানতঃ কুড়মালিই হল এমন একটি আদিম গোষ্ঠী নামবাচক ভাষা যা থেকে বর্তমান ঝাড়খন্ডে কুড়মিদের স্থানান্তরণের বহু পূর্বেই মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং ছত্রিশগড়ে বিশিষ্ট ৪টি 'সামাজিক কুড়মালি উপভাষার' (যথা:- 'গোলআরি' 'ছততিসগড়ি' 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি'-র) উদ্ভবের কথা যথা জানতে পারা যায়। আর ছত্রিসগড় থেকে বর্তমান ঝাড়খন্ডে কুড়মিদের স্থানান্তরণের পরেই বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন 'আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাগুলির' ও যে কালানুক্রমিকভাবে উদ্ভব ঘটেছে সেকথাও জোর করেই বলতে পারা যায়।

অবশ্য এইক্ষেত্রে দেখা যায় যে 'সামাজিক কুড়মালি উপভাষা' ৪টির মধ্যে একমাত্র 'হলবি' নামক কুড়মালি সামাজিক উপভাষাটির নামকরণ ছাড়া বাকি তিনটি সামাজিক উপভাষার নামকরণের মধ্যেই এক একটি অঞ্চলের নাম জুড়ে রয়েছে বলে এই সামাজিক উপভাষাগুলিকেও আপাত বিচারে আঞ্চলিক উপভাষা বলেই সাধারণতঃ ভুল করা হয়ে থাকে যদিও এই দুই শ্রেণীর উপভাষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভবের মূল কারণ হল মূল কুড়মালি ভাষাভাষী কেবলমাত্র কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই যখন পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরদূরান্তে বসবাস করেছিলেন তখন বিশেষতঃ 'সামাজিক স্তর' ভেদের সঙ্গে 'ভৌগোলিক স্তর' ভেদ হওয়ার কারণে তাঁদের ভাষার মধ্যেও পার্থক্য দেখা দিয়েছিল বলেই ঐসব সামাজিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু বিপরীতভাবে আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাগুলির উদ্ভবের মূলে ছিল বিভিন্ন স্থানে কুড়মিদের স্থানান্তরণের পর ভিন্নতর ভাষাভাষীর লোকদের সম্পর্কে আসার ফলে ঐসব ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের মুখে মুখে কুড়মালি ভাষার স্বরূপ বা ভাষা ছাঁদে পরিবর্তন ঘটার ফলে এক-একটি অঞ্চলে একএকটি কুড়মালি আঞ্চলিক উপভাষার উদ্ভব ঘটেছিল।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে বাধা নেই যে অন্ততঃ আর্যাবর্তের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালেই কুড়মিদের সিন্ধুবাসী পূর্বপুরুষেরা তথাকথিত 'ব্রাত্যদেশ'

এর অন্তর্গত মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলা সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করার পর কালক্রমে ক্রমাগত স্থানান্তরিত হতে হতে বর্তমান বাসভূমি অঞ্চলের সর্বত্র সংখ্যাবহুলভাবে বসবাস তথা কৃষি অর্থনীতিতে আধিপত্য স্থাপনের ফলে কুড়মালি ভাষাটিও সুপ্রাচীনকালেই এইসব অঞ্চলের লোকভাষায় পরিণত হয়ে পড়েছিল। আর এইভাবেই যেসব সামাজিক ও আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভব ঘটেছে সেইগুলির এক-একটির প্রচলন ক্ষেত্রের ভাষা-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করে পরিশেষে মূল কুড়মালি ভাষাটির উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্রের নিম্নলিখিতভাবে পরিমাপনের যথাযথ প্রচেষ্ঠা করা হল। যথাঃ—

৬। 'সামাজিক কুড়মালি উপভাষা' তথা উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র :

প্রসঙ্গতঃ সামাজিক ভাষাবিজ্ঞান', 'সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান' ও 'নৃ-তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান' এর সিদ্ধান্তের অনুসারে বলতে পারা যায় যে পূর্বোক্ত বিশেষ কারণেই বিশেষতঃ 'গোষ্ঠী নামধেয় আদিম ভাষা' থেকেই সামাজিক উপভাষার উদ্ভব ঘটে থাকে। কারণ সঠিক দিন-ঠিকান না জানা সুদূর অতীতে যখন কোন আদিম গোষ্ঠীনামবাচক ভাষাভাষী 'মূল মানব সমূহটি' কোনো না কোনো বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ভিন্ন ভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সম্বন্ধহীনভাবে বহুদিন ধরে দূর দূরান্তে বসবাস করতে থাকে একমাত্র ঐ অবস্থাতেই তখন দল বা গোষ্ঠীগুলির সামাজিক অবস্থার মধ্যে যেমন তারতম্য বাড়তে থাকে তেমনি ভৌগোলিক অবস্থারও পার্থক্য ঘটে বলে ঐসব দলের ভাষাভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য এসে যায় এবং এমনিভাবেই একই সমাজের তথা একই ভাষাবাষী লোকদের মধ্যে এক-এক ধরনের 'সামাজিক উপভাষা'র উদ্ভব ঘটে থাকে। কিন্তু কোন লিখিত সাহিত্যের ভাষা থেকে (তা সেটি যত প্রাচীনই হোক না কেন) কোন 'সামাজিক উপভাষা'র উদ্ভব হতেই পারে না। কারণ, ঐ লিখিত সাহিত্যের ভাষাটি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীবিশেষের ভাষা রূপে প্রচলিত না থেকে যেহেতু বহু সংখ্যক গোষ্ঠীর সমাজের লোকভাষা রূপে প্রচলিত থাকার কারণেই সেই লিখিত ভাষাটি থেকে আঞ্চলিক উপভাষা'-র উদ্ভব হলেও কোন 'সামাজিক উপভাষা'র উদ্ভব কদাপি হতে পারে না। আর তাই এইদিক দিয়ে কুড়মালি ভাষাটি সত্যই হল অনন্য সাধারণ, অদ্বিতীয়। কুড়মালি ভাষার এই বিশিষ্ট 'সামাজিক উপভাষা'গুলি হল যথাক্রমে- 'গোলআরি', 'ছত্‌তিসগড়ি'(ছত্রিশগড়ি), 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি'।



সামাজিক কুড়মালি উপভাষা:

৬.১ 'গোলআরি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা ও তার উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র:

কুড়মালি ভাষাজাত প্রথম ও প্রাচীনতম সামাজিক উপভাষাটি হল 'গোলআরি'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিশেষতঃ ঋক্‌বৈদিক আর্যদের ঠেলায় সিন্ধুসভ্যতা অঞ্চল থেকে স্থানান্তরণের পর কুড়মিদের পূর্বপুরুষেরা সর্বপ্রথম মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত গোয়ালিয়র সহ তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উপস্থিত হন। আনুমানিক এই সময়কালেই আর্যগোষ্ঠীর লোকেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপস্থিত হন। আর এই অবস্থায় মূলতঃ পশুপালন-পেশাজীবী হওয়ার কারণে অহরহ স্থানান্তরণশীল আর্যগণ গোধনের উপর্যুক্ত চারণভূমির সন্ধানে দিগন্ত প্রসারিত গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে স্থিরভাবে বসবাস স্থাপনের নিমিত্ত 'আর্যাবর্ত'-এর। তাছাড়া গোধন পালন-পোষণ ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজের জন্য অগনিত স্ত্রী-পুরুষ যুদ্ধবন্দী দাসের দল তো ছিলই। আর এই সময়ে (আনুমানিক ১৫০০-১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব) আর্যাবর্তের দক্ষিণস্থিত দুর্গম বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত সমাচ্ছাদিত তথাকথিত 'ব্রাত্যদেশ' এর (বেদবিরোধী পতিত, পাপী, শত্রুদের দেশ) গোয়ালিয়রে বসবাস স্থাপনকারী কুড়মি জনগোষ্ঠীর জীবনেও আর্য আক্রমণের বিভীষিকাও আর প্রায় রইল না। কারণ 'ব্রাত্য দেশ'-এ পদার্পণ করলেও আর্যগণকে যে 'গঙ্গাস্নান' করে পবিত্র হতে হত সেকথাও এই ক্ষেত্রে স্মরণীয়। আর তাই এই পরিস্থিতিতে কুড়মি জনগোষ্ঠীর তৎকালীন মানুষেরা সৈন্ধব অঞ্চলে বসবাসকালীন অধিগত বংশগত কৃষিবিদ্যার অনুসারে গোয়ালিয়র ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নতুনভাবে কৃষিভিত্তিক কুড়মি সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই নব সমাজ জীবনের স্তরের সঙ্গে পূর্বকালীন সৈন্ধব সমাজজীবনের স্তরের পার্থক্য ঘটে যায়। বলাবাহুল্য সৈন্ধব অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে গোয়ালিয়রের ভৌগোলিক অবস্থার পার্থক্যও ছিল কুড়মিদের সামাজিক জীবনস্তরের ভিন্নতার একটি বড় কারণ। আর এইভাবে তাঁদের ভাষাছাঁদের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় পার্থক্য গড়ে উঠার ফলে কালক্রমে 'গোলআরি সামাজিক কুড়মালি উপভাষা'টির উদ্ভব ঘটে। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গোয়ালিয়রে

উদ্ভব ও প্রচলনের কারণেই এই নব-সৃজিত ভাষাটির নামকরণও স্বাভাবিক কারণেই 'গোয়ালিয়রের ভাষা অর্থে' 'গোয়ালিয়রি' হয়ে পড়ে। আবার কালক্রমে এই 'গোয়ালিয়রি' শব্দটি থেকেই ভাষাটির প্রাচীনতম নাম হয়ে পড়ে 'গোলআরি' (<গোয়ালিয়রি > গোলোআরি > গোলআরি)।

প্রসঙ্গতঃ 'সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান'এর অনুসারে আরও বলতে পারি যে, কুড়মিরা হলেন সহজাত ভাবে নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রিয়। আর তাই দেখা যায় কুড়মালি লোকগীত 'ঝুমইর'-এর একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাম যেমন 'গোয়ালিয়রে প্রচলিত থাকার সুবাদে' 'গোলআরি ঝুমইর' নামে আজও প্রচলিত রয়েছে তেমনি এই শ্রেণীর ঝুমইরটির বাজনার তালটিকেও বলা হয়ে থাকে 'গোলআরি তাল'।

এছাড়া এইদিক দিয়ে আরও দেখা যায় যে, কুড়মিদের কৃষিভিত্তিক 'করম পরব'-এ কুমারী মেয়ের দল যে এক বিশেষ ধরনের 'কাঠিনাচ' করে থাকে তার সঙ্গে গোয়ালিয়র-রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের 'ডান্ডিয়া নাচ'-এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আর এইভাবে বলতে বাধা নেই কুড়মালি ঝুমইর এবং করম পরবের কাঠি নাচ সেকালে গোয়ালিয়রেও সর্বত্রই প্রচলিত ছিল এবং তারই ধারাবাহিকতা 'ডান্ডিয়া নাচ ও কুড়মি সমাজের করম পরবের 'কাঠি নাচ'-এ আজও পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি ছাড়াও ই.টি. ডাল্টনের 'ডেসক্রিপটিভ এথনোলোজি অফ্ বেঙ্গল'গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৩১৮ থেকেও গোয়ালিয়রে একদা কুড়মিদের বসবাসের সমর্থন পাওয়া যায় যখন তিনি কুড়মিদের সামাজিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, কুড়মিদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত রাজ-পরিবারও দেখা যায়। তাঁর মতে 'পাঞ্চেত'-এর (কাশীপুর) সম্ভ্রান্ত রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত 'সিন্ধিয়া' ও 'ভোঁসলে' রাজবংশও হল মূলতঃ কুড়মি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত রাজবংশ। প্রসঙ্গত "সামাজিক ভাষাবিজ্ঞান"ও "সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান" -এর সিদ্ধান্ত অনুসারে বলতে পারি যে, কোনো নির্দিষ্ঠ ভূভাগে সুদীর্ঘ কালাবধি স্থায়ীভাবে বসবাসের সুবাদে ওই ভূ-ভাগের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই ওই ভূ-ভাগটির নামানুসারে পরিচিতি লাভ করে থাকে; যথা- 'ভারত' ভূ-ভাগের অধিবাসী অর্থে 'ভারতীয়', জাপানের অধিবাসী অর্থে 'জাপানীয়', আরব এর অধিবাসী অর্থে 'আরবীয়'। অনুরূপভাবে জোর করে বলতে পারি যে, 'সিন্ধু' (সিন্ধু সভ্যতা ভূ-ভাগ) অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ার সুবাদে গোয়ালিয়রের কুড়মি রাজবংশটিরও (অনুমান ব্যাপকার্থে গোয়ালিয়রে বসবাস স্থাপন করার কারণে সমগ্র কুড়মি জনগোষ্ঠীটিরও) পরিচিত সুপ্রাচীনকালেই নিশ্চয়ই 'সিন্ধিয়া' হয়ে পড়েছিল। আর তাই দেখা যায় এই সিন্ধিয়া শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চেৎ বা কাশীপুরের

কুড়মি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা দামোদর শেখরের (পাঞ্চেৎ রাজ্য স্থাপনের কাল ৮০ খৃষ্টাব্দ বা দ্বিতীয় শক)। বর্তমান বংশধরদের 'সিংহদেও' উপাধিটিও মূলত হল 'সিন্ধিয়া'(সিন্ধু অঞ্চলের বসবাস অর্থে) শব্দজাত। তাছাড়া ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে আরো বলতে পারি যে যেহেতু পাঞ্চেৎ বা কাশীপুরের 'সিংহদেও' উপাধিধারী রাজবংশের সঙ্গে নাগপুরের 'সহদেও' উপাধিধারী রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধের কথাও জানতে পারা যায় তাই সামাজিক বিচারেও নাগপুরের নাগবংশীয় রাজারাও যে ছিলেন কুড়মি নাগবংশীয়- নাংটুআর গোষ্ঠীভূক্ত সেকথাও অনায়াসে অনুমেয়। প্রসঙ্গত ভাষাতত্ত্বের সূত্রানুসারে 'সিন্ধিয়া', 'সিংহদেও' এবং 'সহদেও' এই শব্দ তিনটির ব্যুপত্তিও হল- সিন্ধু + সম্বন্ধার্থে (ব্যাপকার্থে অধিবাসী অর্থে)-ইঅ/ইআ প্রত্যয় > সিন্ধ্ + ইঅ/ইআ > সিন্হ্দ্ইঅ/সিন্হ্দ্ইআ >সিন্হ্দিঅ/ সিন্হ্দিআ > সিংহদেও /সহদেও। প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য যে পাঞ্চেৎ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা দামোদর শেখর-এর 'শেখর' উপাধিটিও মূলতঃ হল কুড়মিদের 'শাঁখুআর' গোষ্ঠীজাত। 'শেখর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিও হল- শেখর > সাঁখুআর > সেখ্আর > সেখর/ শেখর। (বিস্তৃত আলোচনা করার অবসর এখানে নেই। অন্যত্র করার ইচ্ছা রাখি)।

কিন্তু সে যাইহোক 'গোলআরি সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির স্বরূপ বা ভাষাছাঁদ সেকালে কেমন ছিল লিখিত নিদর্শনের অভাবে সেকথা বলা হল অসম্ভব।

৬.২ 'ছতিসগড়ি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা ও তার উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র:-

'ছত্তিসগড়ি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির উদ্ভবের সম্পর্কে বলতে পারা যায় যে, গোয়ালিয়রে সুদীর্ঘ কালাবধি স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সহজলভ্য কৃষিযোগ্য জমি জায়গার অভাবের জন্যই হোক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেই হোক 'গোলআরি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষাভাষী' মূল জনসমূহটি থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ অন্ততঃ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে মধ্যপ্রদেশের মধ্যবর্তী আরণ্যক পথ ধরে পূর্বমুখে চলতে চলতে ছত্রিশগড়ে উত্তর, মধ্য-উত্তর ও দক্ষিণে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন এবং এই তিনটি এলাকাতে দীর্ঘদিন বসবাস করার ফলে তিনটি অঞ্চলে তিনটি সামাজিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভব ঘটে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে বলা মুসকিল যে ছত্রিশগড়ের কোন এলাকায় কুড়মিদের প্রথম বসবাস স্থাপিত হয়েছিল বা ছত্রিশগড়ে উদ্ভূত সামাজিক উপভাষা তিনটির মধ্যে কোনটির উদ্ভব আগে হয়েছিল।

কিন্তু সে যাই হোক গোয়ালিয়র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার পর একটি দল

ছত্রিশড়ের উত্তর প্রান্তস্থিত রেবা, কোরিয়া, সুরজপুর, বলরামপুর প্রভৃতি জেলায় বসবাস স্থাপন করে। ফলে গোয়ালিয়রের সমাজ ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির স্তরের সঙ্গে এইসব অঞ্চলে নতুনভাবে গড়ে উঠা সমাজজীবনের ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেওয়ার কারণেই কুড়মিদের ভাষাছাঁদের মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। এইভাবে যে নতুন উপভাষার উদ্ভব ঘটে তাই হল 'ছততিসগড়ি সামাজিক কুড়মালি উপভাষা'। আর ছত্রিশগড়ের ভাষার সুবাদে উপভাষাটির নামও স্বাভাবিক কারণেই হয়ে পড়েছে 'ছত্‌তিসগড়ি' (< ছত্রিশগড়ি)। অনুমান, উপরোক্ত অঞ্চলে বসবাস স্থাপনকারী দলটিই গোয়ালিয়র থেকে সর্বপ্রথম ছত্তিশগড়ে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল বলেই সামগ্রিকভাবে তাঁদের মধ্যে উদ্ভুত ভাষাটিও 'ছত্‌তিসগড়ি' নামে অভিহিত হয়ে পড়ে।

কালান্তরে এই 'ছত্‌তিসগড়ি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা থেকে আবার দুটি 'বিভাষা' (Sub- dialect)-র উদ্ভব ঘটে। যথা—'খলতাহি' ও 'লরিআ'। বিলাসপুর জেলার পার্শ্ববর্তী বালাঘাট জেলাকে কেন্দ্র করে 'খলতাহি' বিভাষার উদ্ভব ঘটে। আর ছত্রিশগড়ের সমতলভূমির পূর্ব প্রান্তস্থিত মূলত সম্বলপুর এলাকার বিভাষাটি হল 'লরিআ'।

৬.৩ 'সুরগুঁজিআ' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা ও তার উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র:

-

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে গোয়ালিয়র থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ছত্রিশগড়ের উত্তরাঞ্চলে এসে বসবাস স্থাপনকারী কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষদের মতই গোয়ালিয়রের মূল কুড়মি জনগোষ্ঠীসমূহটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আগত অন্য একটি দল কৈমুর পর্বতের গিরিপথের পথ ধরে মধ্য-উত্তর ছত্রিশগড়ের সুরগুঁজা জেলাকে কেন্দ্র করে তৎপার্শ্ববর্তী যশপুর, বিলাসপুর, উদয়পুর, রায়গড় প্রভৃতি জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ফলে গোয়ালিয়রের কুড়মি সমাজ ও ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সুরগুঁজা প্রভৃতি অঞ্চলের কুড়মি সমাজ ও ভৌগোলিক স্তর ভেদের কারণে সুরগুঁজায় প্রচলিত কুড়মালি ভাষার মধ্যেও পার্থক্য গড়ে উঠে এবং এইভাবে সুরগঁজাকে কেন্দ্র করে যে নতুন ধরনের কুড়মালি ভাষার উদ্ভব ঘটে 'সুরগুঁজা অঞ্চলের ভাষা অর্থে' তারই নাম হয়ে পড়ে 'সুরগুঁজিআ' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা'।

প্রসঙ্গতঃ আরও জানতে পারা যায় যে, যশপুর প্রভৃতি জেলায় বসবাসকালীন সময়ে 'সুরগুঁজিযআ' কুড়মালি'র সঙ্গে 'কোল' গোষ্ঠীর 'কোরয়া' (< কুড়ুখঅ > কুরুঅঅ > কুরুআ > কোরয়া) ভাষার সংমিশ্রণে 'সাদরি -কোরআ' নামক 'সুরগুঁজিআ কুড়মালির' বিভাষার উদ্ভব ঘটে।

৬.৪ 'হলবি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা ও তার উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র:-

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সামাজিক কুড়মালি উপভাষা চারটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ হল 'হলবি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষা। এইদিক দিয়ে বলতে পারা যায় যে, গোয়ালিয়রের মূল কুড়মি জনগোষ্ঠীটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে তৃতীয় দলটি কৈমুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত গিরিপথ ধরে ছত্রিশগড়ের বস্তার জেলা সহ পার্শ্ববর্তী কোন্ডাগাঁও, রাজগাঁও, কোড়গাঁও, দন্তবাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে 'হলবি' নামক সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির উদ্ভব ঘটে।

অবশ্য এইক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে বস্তার জেলায় উদ্ভব ও প্রচলন থাকার কারণে এই সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির নামকরণ তো 'বস্তারি' হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে 'হলবি' নাম হওয়ার কারণ কি? এই ক্ষেত্রে সবিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই 'হলবি' নামকরণটির সঙ্গে কুড়মিদের স্থানান্তরণ নির্দেশক স্থান নামের পরিবর্তে কুড়মিদের জীবন প্রয়াসমূলক কৃষিকার্যের সর্বপ্রধান উপকরণ 'হার' (>'হা ল') হওয়ার কারণে 'হলকর্ষণকারী লোকদের ভাষা' অর্থে এই উপভাষাটির নামবাচক 'হলবি' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। 'হলবি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল 'হলবি' < 'হ' র' শব্দ + 'বাহ্' ধাতু + 'অই/অইআ ' প্রত্যয় (সম্বন্ধ নির্দেশক) > হ'র-বাহ্-অই/অইআ > হ'রবাহ-ই (আ) > হ'লবাহ-ই > হ'লবি > হলবি।

এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বস্তার জেলা সহ পার্শ্ববর্তী যেসব অঞ্চলে এই 'হলবি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটি প্রচলিত ছিল সেই সব অঞ্চলে কুড়মি জনগোষ্ঠীটিও 'হলবি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অর্থে' 'হলবা' নামে সুদীর অতীতেই অভিহিত হয়েছিলেন বলেই আজও এঁরা 'হলবা' নামেই পরিচিত হয়ে চলেছেন।

প্রসঙ্গতঃ আরও জানতে পারা যায় যে, এই 'হলবি কুড়মালি ভাষার সঙ্গে কালক্রমে 'কোল' ভাষার সংমিশ্রণ ঘটার ফলে উদ্ভব ঘটে 'সাদরি কোল' বিভাষার। ('সাদরি'-অর্থ হল 'কুড়মালি')।

৭। সামাজিক কুড়মালি উপভাষা সম্পর্কিত মন্তব্য :

ছত্তিশগড়ে উদ্ভুত উল্লিখিত 'সামাজিক কুড়মালি উপভাষা'-গুলির স্বরূপ প্রাচীন উদ্ভবকালীন সময়ে যে কেমন ছিল তা জানার কোন উপায় ছিল নেই। তবে মাত্র শ-খানেক বছর আগে প্রকাশিত গ্রিয়ারসনের 'লিঙ্গুস্টিয়িটিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া', ভলিউম-৬-এর ৩৩০-৩৫৫ পৃষ্ঠার মধ্যে ছত্রিশগড়ে উদ্ভূত 'ছত্তিসগড়ি' , 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি'-এই তিনটি সামাজিক কুড়মালি উপভাষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বস্তার জেলার 'হলবি' ভাষার নমুনা থেকে জানতে পারা যায় যে উপরোক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে

বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালি ভাষার মৌলিক সৌসাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, গ্রিয়ারসনের আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে, দক্ষিণ ছত্রিশগড়ের বস্তার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী সব অঞ্চলেই কুড়মালির সামাজিক উপভাষা 'হলবি' লোকভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। তবে 'হলবি' ভাষার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 'মারাঠী' ভাষা তথা পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 'উড়িয়া' ভাষার প্রচলন থাকার কারণে 'হলবি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির মধ্যে কিছু কিছু 'মারাঠী' ও 'উড়িয়া' ভাষার শব্দ, প্রত্যয়-বিভক্তি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে ছত্রিশগড়ের উত্তর প্রান্তস্থিত অঞ্চলটির সীমান্তবর্তী এলাকায় 'অবধি', 'হিন্দী' প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত থাকার কারণে ছত্রিশগড়ের উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত 'ছত্‌তিসগড়ি' কুড়মালি লোকভাষাটির মধ্যেও 'অবধি' ও 'হিন্দী' প্রভৃতি ভাষার শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

তবে এইক্ষেত্রে জোর করেই বলতে পারি যে, গ্রিয়ারসনের দ্বারা 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া'-র কার্যারম্ভের সময়কালটি ছিল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র সওয়া-শ বছর আগেকার ঘটনা। আর যেহেতু নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলা -উড়িয়া-মারাঠী-অবধি-হিন্দী প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলি ঐ সময়কাল পর্যন্ত সু-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বলেই এইসব ভাষার প্রভাব হলবি-সুরগুঁজিয়া-ছততিসগড়ি সামাজিক কুড়মালি উপভাষাগুলির মধ্যে পড়া স্বাভাবিকই ছিল।

কিন্তু সে যাই হোক নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সুপ্রাচীন কালের ব্রাত্যদেশের আরণ্যক পরিবেশের যে সময়কালে এই সামাজিক কুড়মালি ভাষাগুলির উদ্ভব ঘটেছিল সেই সময়কালে এইসব নব্যভারতীয় বাংলা-উড়িয়া-মারাঠী-অবধি-হিন্দী প্রভৃতির উদ্ভব হওয়া তো দূরের কথা এই গুলির মাতৃস্থানীয়া তথাকথিত 'সংস্কৃত ভাষাটির প্রচলনও এই 'ব্রাত্যদেশ'-এ ছিলই না। আর তাই সেই সময়কালে উদ্ভূত 'গোলআরি' 'ছত্‌তিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি' এই চারটি সামাজিক কুড়মালি উপভাষার ভাষাছাঁদ বা স্বরূপ নিশ্চিতভাবে ছিল একেবারে বিশুদ্ধ অবিমিশ্র কারণ সেই ব্রাত্যযুগীয় প্রারম্ভিক সময়কালে আর্য-বিভীষিকা-সন্ত্রস্ত সৈন্ধবীয় সব গোষ্ঠীর মানুষই যে-কোন ভাষাভাষী অন্য গোষ্ঠীর নজর এড়িয়ে পরস্পর দূরদূরান্তে দুর্গম আরণ্যক পরিবেশে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষার কাজে অভ্যস্থ ছিলেন সেকথাও অনায়াসেই অনুমিত। কাজেই জোর দিয়েই বলতে পারি যে অবিভক্ত সুপ্রাচীন মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং ছত্রিশগড়ে কুড়মিদের বসবাস স্থাপনকালীন বিপর্যয়পূর্ণ, বিষম পরিস্থিতিতে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে ভিন্নতর কোন ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেনি বলে 'গোলআরি', 'ছত্‌তিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি' এই চারটি

সামাজিক 'কুড়মালি উপভাষা ছিল নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ।

৮। কুড়মি-কোল সম্বন্ধ :

সুদীর্ঘ কালাবধি ছত্রিশগড়ে বসবাস স্থাপনকারী কুড়মিদের সঙ্গে পরবর্তীকালে যাঁদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটেছিল তাঁরা হলেন-কোল,(মুন্ডা-ভূমিজ) গোষ্ঠীর মানুষ। তবে এই পরিচয় সংঘর্ষের মাধ্যমে ঘটার পর কুড়মিরা বিজয়ী হলেও কুড়মিরাই কৃষির সুবিধার্থে শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে কোলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কথাটি হল ঐতিহাসিক সত্য (Ref:- (i) E.T. Dalton : Descriptive Ethnology of Bengal, PP- 317 :: (ii) The Tribal Culture of India, PP-31 :: (iii) ড. বিনয় মাহাত : লোকায়ত ঝাড়খন্ডঃ প্র, পৃঃ- ১৬,১৭)। আর এইভাবে কুড়মি ও কোলদের মধ্যে বন্ধুত্বের (হিত-মিতান-ফুল-পরানের) সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার কালে একই অঞ্চলে কুড়মিদের মধ্যে কুড়মালি ভাষা এবং কোল বা মুন্ডাদের মধ্যে 'মুন্ডারি' ভাষার প্রচলন ছিল। আর এই সময়কালে কোল বা মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুযেরা কুড়মালি ভাষাটিকে বলতেন 'সেদানি' বা 'সাদানি' অর্থাৎ মুন্ডা নন এমন গোষ্ঠীজোটের ভাষা। (তরুণ দেব ভট্টাচার্যঃ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-৩, পুরুলিয়াঃ প্র. প্র. ১৯৮৬, পৃ. -২৭৯)। আর এই অবস্থায় কোল বা মুন্ডাদের ভাষার নাম 'মুন্ডারি'-র 'রি' ধ্বনি সাদৃশ্য হেতু কুড়মিদের 'সেদানি' বা 'সাদানি'-ভাষাটিও স্বাভাবিকভা:বেই 'সাদরি' (= কুড়মালি) নামে অভিহিত হয়ে পড়ে 'সাদরি' < 'সাদানি' (কুড়মালি) + 'রি' প্রত্যয় (মুন্ডারি ধ্বনি সাদৃশ্যজাত) > সাদানি-রি > সাদরি।। আর কালক্রমে ঐ কোলগোষ্ঠীর মানুষগুলি যখন কুড়মিদের কৃষিকার্যের অপরিহার্য সহযোগী রূপে কুড়মিদের খেতে খামারে ঘরে কাজ করতে থাকেন তখন কোলদের কথায়-বার্তায় 'সাদরি' নামে অভিহিত (কুড়মালি) ভাষার সঙ্গে 'কোল' গোষ্ঠীর ভাষার (বা মুন্ডারি/ওরাঁও) সংমিশ্রণ ঘটার ফলে 'সাদরি' (বা কুড়মালি) ভাষা থেকে ছত্রিশগড়ের এক-এক অঞ্চলে এক-একটি নতুন নতুন ধরণের সামাজিক কুড়মালি বিভাষারও উদ্ভব ঘটে। বলাবাহুল্য এই ধরণের সামাজিক কুড়মালি বিভাষাগুলির উদ্ভব সুপ্রাচীনকালেই ঘটেছিল বলেই গ্রিয়ারসনের ভাষা সর্বেক্ষণেও এগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা:

৮.১ 'সাদরিকোরআ' :

প্রসঙ্গতঃ গ্রিয়ারসনের ভাষাসর্বেক্ষণ থেকে জানতে পারা যায় যে, ছত্রিশগড়ের উত্তরাঞ্চলের অন্তর্গত যশপুর সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে এর 'কোরআ' নামি অভিহিত (আসলে 'কোরয়া' হল 'কোল' জনগোষ্ঠীর 'কুড়ুখ' বা 'ওঁরাও'দের আঞ্চলিক পরিচিতি), কোল জনগোষ্ঠীর লোকদের কথায়-বার্তায় সুরগুঁজিআ' সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটি থেকে

যে বিভাষাটির উদ্ভব সুদূর অতীতেই ঘটেছিল সেটিই হল-গ্রিয়ারসনোক্ত 'সাদরি কোরআ' গ্রিয়ারসনের ভাষাভঙ্গীর অনুকরণের খেই ধরে এইক্ষেত্রে বলতে পারি— "Sadri/ Korwa means the local form of the Surgunjia language, spoken by the aboriginal Korwa Tribes." (G.A. Griarson: (i) L.S.I.- Vol-I, Part-I, Appendix -III- Index of Laguages, PP-471, 499,442. (ii) L.S.I.- Vol-VII, PP-25)

৮.২ 'সাদরি-কোল' :

অনুরূপভাবে আরও জানতে পারা যায় যে, ছত্রিশগড়ের দক্ষিণাঞ্চলের 'হলবি' নামক 'সামাজিক কুড়মালি উপভাষা বহুল 'বামরা সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে' 'হলবি'-র (বা কুড়মালি) সঙ্গে কোল (মুন্ডা) জনগোষ্ঠীর ভাষার সংমিশ্রণে উদ্ভূত 'সামাজিক কুড়মালি বিভাষা' হল 'সাদরি-কোল' (>'সাদরি' বা কুড়মালি ভাষা' + 'কোল' বা মুন্ডাদের ভাষা) 'সাদরি-কোল'। গ্রিয়ারসনের ভাষাভঙ্গীর অনুকরণে এইক্ষেত্রেও 'সাদরি-কোরআর'-র পরিভাষার অনুরূপ ভাষায় বলতে পারি—

"Sadri/Kol means the local form of the Halbi-Kurdmali lanuage spoken by the aboriginal Kol tribes". (L.S.I. Vol-VIII, P-25).

৯। ছোটনাগপুরে কুড়মিদের স্থানান্তরণ ক্রমানুসারী আঞ্চলিক 'কুড়মালি উপভাষা'র উদ্ভবক্রম :

কালান্তরে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যখন ছত্রিশগড়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী তথা ছোটনাগপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলস্থিত গঢ়য়া জেলার পথ ধরে চলতে চলতে কালানুক্রমিকভাবে যেমন-যেমন ভাবে ছোটনাগপুর মালভূমির কৃষিযোগ্য সমগ্র অঞ্চলে বসবাস ও আধিপত্য স্থাপন করতে থাকেন তেমনি তেমনিভাবে সাঁওতাল হো-খাড়িয়া প্রভৃতি অন্যান্য জনজাতীয় ভাষাভাষী মানুষদের সংশ্রবে আসতে থাকায় এক-এক অঞ্চলে এক-একটি বৈচিত্যময় আঞ্চলিক কুড়মালি উ পভাষার উদ্ভব ঘটতে থাকে। অবশ্য এই দিক দিয়ে আরও দেখা যায় যে, আজ থেকে প্রায় হাজার খানেক বছর আগে (আনুমানিক ৯০০/১০০০ খ্রীষ্ট-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা উড়িয়া-মৈথিলী-মগহী-অবধি-হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব তথা কালক্রমে বিকাশ ঘটার পর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ স্থাপনের বহু পূর্বকাল থেকেই কুড়মালির আঞ্চলিক উপভাষাগুলির সঙ্গে এইসব আধুনিক ভাষাগুলিরও সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। কিন্তু মূলের বিচারে এই সব আঞ্চলিক উপভাষাগুলিই যে হল কুড়মালি সেকথাও হল ভাষা-বৈজ্ঞানিক সম্মত। এই প্রসঙ্গে কোন প্রখ্যাত গবেষক যথার্থই মন্তব্য

করেছেন—

"অনেকে মনে করেন ঝাড়খণ্ডের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে একদা কুর্মালী ভাষা প্রচলিত ছিল। অঞ্চলভেদে ভাষার রূপ বদলে গেলেও মূল কাঠামোটি চিনে নিতে অসুবিধা ছিল না। মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষেরা তাকে বলতেন 'সেদানী'। 'সেদানী' মুন্ডা নন এমন জনগোষ্ঠীর ভাষা। হাজারীবাগে নাম 'নাগপুরিয়া', রাঁচীর পাঁচপরগনার 'পাঁচপরগনিয়া', বিলাসপুরে 'ছত্রিশগড়ি', বস্তার জেলায় 'কুর্মালী' প্রভৃতি। 'সেদানী' বা 'কুর্মালীর' সঙ্গে বাংলা মিশে রাঢ়ী বোলীর সৃষ্টি হয়েছে।" (তরুণদেব ভট্টাচার্যঃ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-৩-পুরুলিয়া, প্র.প্র. ১৯৮৬, পৃ. ২৭৯)।

প্রখ্যাত কুড়মালি ভাষাবিদ্ ক্ষুদিরাম মাহাত মহাশয়ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন— "নাগপুরিয়া", 'পাঁচপরগনিয়া' 'গোলআরি' 'খোট্টা' বা 'খোর্ঠা'-র সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার 'হলবি' ভাষা, রেবা জেলার 'ছত্রিশগড়ী' প্রভৃতি সবই হল কুড়মালির এক একটি আঞ্চলিক উপভাষা।" (ক্ষুদিরাম মাহাত ঃ কুড়মালি ভাখিক ইতিহাস, রূপ চিসঃ সাবিত্রী প্রেস, পুরুলিয়া ১১/৭/১৯৮২, পৃঃ -৬)

আর এইভাবে আরও জানতে পারা যায় যে, আজ থেকে হাজার দেড়েক বছর আগেও অর্থাৎ পৌরাণিক যুগেও কুড়মালি ভাষাটিও এই সুবৃহৎ ব্রাত্যদেশীয় মগধ রাজ্যের 'মাগধী' লোকভাষা রূপে প্রচলিত থাকার কারণেই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারমূলক দোহা বা পদাবলীর অবলম্বিত ভাষাটিকেও কোন প্রখ্যাত গবেষক 'কুড়মালি' রূপেই চিহ্নিত করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্যকেও (অর্থাৎ চর্যাপদের ভাষাকে "হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায়, বৌদ্ধগান ও দোহা" মন্তব্যকে) 'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান', 'সামাজিক ভাষাবিজ্ঞান', 'সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান' প্রভৃতির বিচারে একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন। (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, প্রথম খন্ড পৃ-৯৮ -১০০/ঃঃ/ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ঃ বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ঃ ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ-২৯)।

যাই হোক, কুড়মালি ভাষা থেকে উদ্ভূত প্রথমোক্ত 'সামাজিক কুড়মালি উপভাষা'গুলির উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রমে একই সঙ্গে 'আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা'গুলিরও উদ্ভবের যে আলোচনা করা হল তার কারণ হল এই তথ্যটিকে মনে গেঁথে রাখা যে, প্রাক্ ব্রিটিশ উপনিবেশকালীন সময়ের যে-কালে এই কুড়মালি 'লোকভাষাভাষী' ব্রাত্যদেশীয় ছোটনাগপুর মালভূমিটি শ্বাপদ-সঙ্কুল দুর্গম বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বতে আচ্ছাদিত ছিল, এবংপতিত তথা পান্ডব-বর্জিত রূপেও অভিহিত ছিল সেই সময়কালে এতদঞ্চলে জীবিকা উপার্জনেরও কোন সহজ উপায় ছিলই না। কাজেই ঐ অবস্থায়

বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকদের অনুপ্রবেশও এইসব অঞ্চলে ছিলই না সেকথাও অনায়াসেই অনুমিত। কাজেই এই অবস্থায় সুপ্রাচীনকালীন উদ্ভূত কুড়মালি ভাষার 'সামাজিক', এবং 'আঞ্চলিক' সব উপভাষারই ভাষাছাঁদ মূলতঃ কুড়মালি থাকার কারণেই "অঞ্চলভেদে ভাষার রূপ বদলে গেলেও মূল কাঠামোটি চিনে নিতে অসুবিধা ছিল না।" বলেও গবেষকদের মন্তব্য থেকে জানতে পারা যায়।

ব্রিটিশ উপনিবেশকালে কুড়মালি উপভাষার উদ্ভবের প্রসঙ্গক্রম:-

১৭৬৫ সালে ভারতের শেষ স্বাধীন মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে লর্ড ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করে দেওয়ার দেওয়ানি স্বত্ব লাভ করার পরে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ যেমন যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে তেমনি তেমনি ব্রিটিশের নানান অফিস, কোর্ট-কাছারি-কুঠি-থানা প্রভৃতির কাজের সহায়ক রূপে বাংলা-উড়িয়া- মগহী-মৈথিলী-ভোজপুরী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী অগনিত শিক্ষিতবর্গের এতদ্‌ঞ্চলে আগমন ও স্থায়ী বসবাস গড়ে উঠতে থাকে। অনুরূপভাবে রেললাইন স্থাপনের কাজ, জঙ্গল কাটার কাজ, পথ-ঘাট নির্মাণের কাজ, কোলিয়ারীর কাজ, কুঠির কাজ, মিলিটারী পুলিশ প্রভৃতি নানান কাজের দ্বারা জীবিকা উপার্জনের উপায় তৈরী হতে থাকার কারণে ঐসব ভিন্নতর ভাষাভাষী হাজারো-হাজার অশিক্ষিত শিক্ষিত লোক দলে দলে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করতে থাকেন। আর এই সব অঞ্চলে 'কুড়মালি ভাষাটি লোকভাষা' রূপে পূর্ববিধি প্রচলিত থাকার কারণেই ঐসব ভিন্ন-ভিন্ন ভাষাভাষী অগণিত লোকেরা বিশেষতঃ কৃষিজীবি কুড়মিদের কাছ থেকে খাদ্যান্ন সংগ্রহের তাগিদে হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে নিজ নিজ ভাষার সঙ্গে কুড়মালি ভাষা মিলিয়ে মিশিয়ে যেন-তেন প্রকারেণ বিমিশ্র কুড়মালি ভাষায় কথাবার্তা বলতে বাধ্য থাকতেন। আর এই ভাবে অনায়াসে বলতে পারা যায় যে কুড়মালি উপভাষাগুলির বাহ্যিক স্বরূপ অতি দ্রুতভাবে বদলে যেতে থাকে। বলাবাহুল্য এমনিভাবে আঠারো-শ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আরম্ভ করে গ্রিয়ারসনের ভাষা সর্বেক্ষণের সময়কাল পর্যন্ত কুড়মালি উপভাষাগুলির বাহ্যিক স্বরূপ বা কাঠামো এত বেশীভাবে বদলে গিয়েছিল যে ঐসব নবোদ্ভূত 'আঞ্চলিক কুড়মালি' উপভাষাগুলিও স্বতন্ত্র ভাষারূপেও পরিগণিত হতে থাকে।

এইদিক দিয়ে সবিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশেষতঃ সমভূমকে কেন্দ্র করে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে বহিরাগতদের বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে কুড়মালির যে বিশেষ উপভাষাটির উদ্ভব ঘটেছে সেটি হল 'খট্‌ঠা' বা 'খোঠা'। এই বিষয়টির সম্পর্কে পরে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করতেহ

হবে বলে এখানে আর করা হল না।

তথাকথিত 'ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাষা''-র প্রসঙ্গে :-

প্রসঙ্গত বলতে পারা যায় যে, কুড়মালি ভাষাটির বিচিত্র দ্রাবিড়ীয় প্রকৃতির কোলে অনুকরণাত্মক কারণে উদ্ভূত অজস্র প্রাকৃতিক মৌলিক শব্দ ভান্ডারের সঙ্গে বাহ্যতঃ বাংলা ভাষার প্রত্যয়-বিভক্তি (ইল,ইব,ইবে, ইছে, এর প্রভৃতি) মিশে গিয়ে কুড়মালির যে উপভাষাগুলির উদ্ভব ঘটেছে সেগুলি হল তথাকথিত ভাবে অভিহিত ঝাড়খন্ডী বাংলা নামে অভিহিত 'মানভুইমা বাংলা' 'ধলভুইমা বাংলা' 'মেদিনীপুরিআ বাংলা' বা এককথায় তথাকথিত 'রাঢ়ী বাংলা'। যথা:- 'রগদ্-ইছে > রগদিছে', 'ইঁড়ক্-ইল > ইঁড়কিল', পিদ্‌ক্-এ > বিদ্‌কে', 'উম্‌ক্-ইল > উম্‌কিল' আদি আদি অজস্র বৈচিত্র্যময় শব্দ সম্ভারে সুসমৃদ্ধ এইসব তথাকথিত 'ঝাড়খন্ডী বাংলা তথা 'রাঢ়ী বাংলা'কে নিরপেক্ষ ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে 'বাংলা প্রত্যয়-বিভক্তি সমন্বিত কুড়মালি উপভাষা' নামে অভিহিত করাই হবে সমীচীন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কেউ এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

"সেদানী বা কুর্মালীর সঙ্গে বাংলা মিশে রাঢ়ী বোলীর উদ্ভব হয়েছে।" তথা 'মানভূম জেলার বৃহত্তম অংশে বাংলার সঙ্গে প্রচলিত ছিল এই খোট্টা বা বিমিশ্র বাংলা। তাকে কুর্মালী ও বলা হত।" (তরুণদেব ভট্টাচার্যঃ প.ব. দর্শন-৩, পুরুলিয়া, প্র.প্র. ১৯৮৬,পৃ-২৭৯) প্রসঙ্গতঃ আরও জানতে পারা যায় যে, 'একদা সমগ্র রাঢ়ভূমিতে লোকভাষা রূপে কুড়মালি প্রচলিত ছিল বলেই কুড়মালির অপর নাম হয় 'রাঢ়ী বোলী' এবং এই কুড়মালি বা রাঢ়ী বোলী থেকেই উদ্ভব ঘটেছে ঝাড়খন্ডী বাংলার। (ড. সুকুমার সেনঃ ভাষার ইতিবৃত্তঃ ৬ষ্ঠ সংকলন, ১৯৬২, পৃ-১৪৪)।

১০। উপনিবেশিকালে 'এমিগ্রেশন অ্যাক্টস' দ্বারা দেশ-বিদেশে দেশান্তরিত কুড়মিদের কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গ :

প্রসঙ্গতঃ জানতে পারা যায় যে, 'Indian Emegration Act', Inland Emigration Act' তথা আড়কাঠিদের খাদ্য ও ত্রাণ লাভের 'গিরমিট' (এগ্রিমেন্ট) দ্বারা শ্রমিক হিসাবে ব্রিটিশ আমলে অগনিত কুড়মি সহ কুড়মালি লোকভাষাভাষী মানুষকে দলে দলে দূর-দূরান্তে দেশান্তরিত করে দেওয়া হয়। আসাম, কাছাড় ও দার্জিলিংয়ের সুবিস্তৃত (চা বাগান) অঞ্চল সহ দিনাজপুর, কুচবিহার, মালদা, ২৪ পরগনা (সুন্দরবন এলাকা বা বাধাবন), ত্রিপুরা, বাংলাদেশের ঢাকা, পাবনা, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে দেশান্তরিত হওয়ার পর কুড়মালি লোকভাষাভাষী ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, খাড়িয়া প্রভৃতি জনজাতি সহ কামার, কুম্হার, মাহলি, ধোবা,

নাপিত, তাঁতি,তেলি, জোল্‌হা প্রভৃতি অগণিত মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও ঐসব অঞ্চলে দেশান্তরিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করতে বাধ্য হন।

এছাড়াও নীল, ইক্ষু প্রভৃতি চাষ-আবাদের কাজ রেললাইন পত্তন প্রভৃতির জন্য শ্রমিক হিসাবে উল্লিখিত কুড়মি সহ কুড়মালি ভাষা-ভাষী অগণিত লোককে আফ্রিকার মরিসাস দ্বীপপুঞ্জ তথা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপপুঞ্জে দলে দলে চালান দেওয়ার পর আজও তাঁদের উত্তর-পুরুষেরা ঐসব অঞ্চলে বসবাস করে চলেছেন।

কিন্তু সে যাই হোক এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জীবনচর্যার দিক দিয়ে দূর-দূরান্ত দেশ--বিদেশে দেশান্তরিত কুড়মি সহ কুড়মালি লোকভাষাভাষী লোকেরা আজও বিভিন্ন ভাষার সংস্কৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে 'ঘাঘর ঘেরা' অবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য হলেও এবং ঘরের বাইরে এক-এক এলাকা বিশেষের ভাষা বলতে বাধ্য হলেও নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশে সবাই আজও মূলতঃ কুড়মালি লোকভাষাতেই কথাবার্তা বলে থাকেন। অনুরূপভাবে বিশেষতঃ কুড়মিদের মধ্যে দেখা যায় যে তাঁদের রহন-সহন, খাদ্যাভ্যাস, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, বিশ্বাস প্রভৃতি সবই যে আজও ছোটনাগপুরের মত হুবহু অনুপালিত হয়ে চলেছে সেকথাটিও হল অনস্বীকার্য। অবশ্য এক এক এলাকায় কুড়মালি ভাষাটির নামের দিক দিয়ে তারতম্য দেখা যায়। যেমন আসামে ১০৮ টি দেশান্তরিত 'চা' জনগোষ্ঠীর (টি ট্রাইবস) লোকভাষা কুড়মালির নাম হল- 'সাদরি-কুড়মালি', বাংলাদেশের কুড়মালির নাম হল 'কুড়মি মাহাতো ভাষা' ইত্যাদি। পাবনা জেলার 'কুড়মি মাহাত ভাষা'র একটি উপলব্ধ নমুনা হল—

"হামনিক হিঁআকে ভাষা এক এক জিলাকে এক এক রকম। তবে হামনিক পাবনা জিলাক কুড়মি মাহাতো ভাষা হেঁঠে লিখলি— তঁহনি ১০/১৫ জনকে মার্চ মাসেঁ আওএক কাথা সুনিকে হামনিক হিঁআক জ্ঞাতি গুরু বড়ি খুসি ভেলেহাথিন। তঁহনি জদি একবার এতলা তাহলে হামনি বড়ি আনন্দ পাতলি। ই দইআ করিকে একবার আওআ। তঁহনি এইলে হামনিও চার জনা জাব। হামনি তঁহনিক উঁহাসে পুরুলিয়া মানভূম হাজারিবাগ ঘুরফিরকে দেখা সাক্ষাৎ করকে আওঅব। হাম ভালাহি। চিঠি দিহা। গড় লাগলি। ইতি-

তহর 'শ্যামল বাবু'
শ্যামল কুমার মাহাতো
সভাপতি
উত্তরবঙ্গ কুর্মী মাহাতো সমাজ কল্যাণ সমিতি

নিমগাছি, পাবনা (বাংলাদেশ)"

সংগ্রহ:-
'সারহুল': জুলাই-অক্টোবর' ৮৫
সম্পাদক: সুনীল মাহাতো
সহ-সম্পাদক: কিরীটি মাহাতো
পত্র প্রতিক্রিয়া, পৃ-২

উল্লিখিত ভাষা নমুনাটি বাংলা দেশের পাবনা জেলায় প্রচলিত লোকভাষার নমুনা হলেও এটি যে বাংলা ভাষা নয়, মূলতঃ কুড়মালি সেকথা অনায়াসে বলতে পারা যায়।

১১। ছত্রিশগড়ের কুড়মালি সম্পর্কিত গ্রিয়ারসনের স্ব-বিরোধী মন্তব্য প্রসঙ্গে :-

"লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া", ভলিউম- ৫, পার্ট-২, পৃষ্ঠা-১৪৫-১৫২ তে কথিত গ্রিয়ারসনের মতানুসারে ছোটনাগপুর সহ উড়িষ্যার কুড়মিদিগকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীভূক্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনার্য মানুষ বলে জানতে পারা গেলেও তিনিই আবার এঁদের গোষ্ঠীনামবাচক মাতৃভাষা কুড়মালিকে এই সবেমাত্র হাজার দেড়েক বছর আগেকার ভারতীয় আর্যভাষা পূর্বী-মাগধীর একটি আঞ্চলিক উপভাষা রূপে যে স্ব-বিরোধী(Self-Contradictory), ভ্রান্ত (Misguiding) ও মহাভুল (Blunder)' মন্তব্য করেছেন সে কথাও জানতে তথা কারণটিকেও অনায়াসে বুঝতে পারা যায়।

গ্রিয়ারসন আবার ছত্রিশগড়ের সামাজিক কুড়মালি উপভাষা 'ছত্তিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি' প্রভৃতির সর্বেক্ষণ করতে গিয়ে ঐ একই ধরনের ভ্রান্তিমূলক মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন বলেও জানতে পারা যায়। গ্রিয়ারসন এই তিনটি উপভাষাকেই আর্য ভাষার বংশের আঞ্চলিক উপভাষা, বিভাষা প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর, মতে 'ছত্তিসগড়ি সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটি হল 'পূর্বী হিন্দীর' উপভাষা (লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা-৩৩০)। 'সুরগুঁজিআ'কে তিনি আবার 'ছত্তিসগড়ি'র বিভাষা বলে মন্তব্য করেছেন। (লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা-২৪)। তাছাড়া আরও দেখা যায় যে, বস্তার জেলার 'হলবি' সামাজিক কুড়মালি উপভাষাটির মধ্যে 'মারাঠী' 'ছত্তিসগড়ি' ও ' উড়িয়া' ভাষার প্রভাব খুব বেশী দেখতে পেয়ে গ্রিয়ারসন আবার 'হলবি' ভাষাটিকে 'ছত্তিসগড়ি', 'উড়িয়া' ও 'মারাঠী' ভাষার সংমিশ্রণজাত উপভাষা বলেও মন্তব্য করেছেন—
"An examination of the speciman of Halabi shows that it is, rather, a mixture of Chhattisgarhi, Oriya and Marathi"...

গ্রিয়ারসন 'হলবি' ভাষাভাষী মানুষদের 'অ্যাবোরিজিনাল ট্রাইব' রূপে চিহ্নিত

করে তাঁদের 'হলবা' নামেও অভিহিত করেছেন। বস্তার রাজ্য সহ সমগ্র দক্ষিণ ছত্রিশগড়ে এঁদের বসবাস ঘনভাবে রয়েছে বলেও তাঁর অভিমত। অথচ বিস্ময়ের বিষয় যে এই 'হলবা' লোকদিগকে আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাগার্য মানুষরূপে চিহ্নিত করার পরেও তিনিই আবার এঁদের মাতৃভাষা 'হলবি' কে মাত্র হাজার খানেক বছর আগে উদ্ভূত আর্যভাষা 'মারাঠী'র উপভাষা জাত বলে স্ব-বিরোধী মন্তব্য করে সেই 'মহাভুল'-এরই পুনারাবৃত্তি করেছেন যা এর আগে মানভূমের দ্রাবিড়ীয় কুড়মি জনগোষ্ঠী ও তাঁদের মাতৃভাষা দ্রাবিড়ীয় কুড়মালি সম্পর্কে করেছিলেন। কারণ গ্রিয়ারসনের সময়কালেই তাঁরই মতানুসারে, 'হলবি' ভাষাভাষী ঐ 'অ্যাবোরিজিনাল ট্রাইব' দের জনসংখ্যা যেহেতু ছিল লক্ষাধিক (১,০৪,৯৭১ জন, সেন্সাস ১৮৯১) তাই আমার প্রশ্ন—

"তবে কি প্রায় হাজার খানেক বছর আগে উদ্ভূত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা 'মারাঠী' থেকে 'হলবি' নামক উপভাষাটির উদ্ভবের (আনুমানিক তিন-চারশ বছর) আগে এত বড় সংখ্যক আদিম 'হলবা' কুড়মি জনগোষ্ঠীটির কোন ভাষাই ছিল না? সবাই কি ছিল মূক, পশুবৎ? তা তো হতে পারে না!"

প্রসঙ্গতঃ আরও জানতে পারা যায় যে 'হলবি' ভাষাটির কেন্দ্রস্থল 'বস্তার' জেলা হওয়ার কারণেই এই ভাষাটির একটি আঞ্চলিক নাম হয়ে পড়েছে 'বস্তারি'। আবার 'ভুঞ্জিয়া' অঞ্চলে 'হলবি'-র একটি বিভাষা হল 'ভুঞ্জিয়া'। তাছাড়া 'বামরা' রাজ্যে কোল জনগোষ্ঠীর কুড়ুখ (ওঁরাও) মানুষদের মধ্যে প্রচলিত 'সাদরি কোল' হল 'হলবি'-রই একটি উল্লেখযোগ্য বিভাষা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় গ্রিয়ারসনই আবার এই চারটি ভাষাকেই ('হলবি', 'বস্তারি', 'ভুঞ্জিআ' ও 'সাদরিকোল')—লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা-২৫। 'ছত্তিসগড়ি'র উপভাষা বলেও মন্তব্য করেছেন—

"Four dialects, which were, originally clossed as forms of Chhattisgarhi, they are 'Halabi', 'Bastari', 'Bhunjia' and 'Sadrikol'. (L.S.I. vol-7, pp-25) অর্থাৎ ছত্রিশগড়ের সব ভাষাই মূলতঃ হল 'ছত্তিসগড়ি'র উপভাষা মাত্র।

এরপর আশ্চর্যের উপর আরও আশ্চর্যের কথা গ্রিয়ারসনের মন্তব্য থেকে জানতে পারা যায় যখন তিনি 'সাদরি কোল' বিভাষাটির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'সাদরি কোল' হল মানভূমের কুড়মালি ভাষার সঙ্গে কোল ভাষার একটি বিমিশ্র রূপ।

"Sadri kol, which is only returned from Bamra state, is a form of Bihari

spoken aboriginal tribes. It is identical with the Kurmali sub-dialect of Magahi spoken, in Manbhum District. It is a curious little island of Bihari in the midst of Oriya speaking population." (L.S.I.vo-7,pp-25).

বলাবাহুল্য গ্রিয়ারসনোক্ত উল্লিখিত মন্তব্যটির ভাষাভঙ্গীর অনুকরণে আবার 'সাদরি কোল'-কে নিম্নলিখিতভাবে পরিভাষিত করতে পারি—

"Sadri kol of Bamra State, is a local sub-dialect of the anciant social Kurdmali dialect 'Halbi' (which is identical with the Kurdmali language of Manbhum District) spoken by the aboriginal Kol tribes."

অনুরূপভাবে আবার ছত্রিশগড়ের উত্তরাঞ্চলস্থিত সুরগুঁজা-যশপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত 'সুরগুঁজিআ' ভাষাটিকেও 'ছত্‌তিসগড়ি' ভাষার একটি বিভাষা রূপে অভিহিত করা হলেও যশপুর রাজ্যে প্রচলিত 'সাদরি কোরয়া' ভাষাটির প্রসঙ্গে গ্রিয়ারসনের মন্তব্যটিও এই ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

"Sadri Korwa means the local form of the Surgunjia language, takes in the mouth of a Korwa." (L.S.I., vol-VII,pp-25).

আর এই 'কোরয়া'-রা মূলতঃ হলেন কোল গোষ্ঠীভুক্ত 'কুড়ুখ'-দেরই একটি আঞ্চলিক পরিচিতি মাত্র। 'কোরয়া' হল—

"A name sometimes wrongly given to 'Kurukh". (L.S.I. Appendix-III, Index of Languages, PP-471).

আর এইভাবে জানতে পারা যায় যে, 'হলবি' কুড়মালির সঙ্গে 'কোল' (বা কুড়ুখ) ভাষার সংমিশ্রণে উদ্ভূত 'হলবি'-র বিভাষা হল যেমন 'বামরা' রাজ্যের সাদরি কোল' তেমনি 'যশপুর' রাজ্যে 'সুরগুঁজিআ' কুড়মালির সঙ্গে কোল জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত 'কোরয়া' (< কুড়ুখ > কুরুঅঅ > কুরুআ > কোরয়া) জনগোষ্ঠীর 'কোরয়া' ভাষার সংমিশ্রণজাত 'সুরগুঁজিআ' কুড়মালির বিভাষা হল 'সাদরি-কোরয়া'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুড়ুখ ভাষাভাষী কোল মুন্ডাদের ভাষায় 'সাদরি' কথাটির অর্থ হল 'কুড়মালি'।

১১। 'হলবি কুড়মালি' ও তার বৈশিষ্ট্য :

প্রসঙ্গতঃ বলতে পারা যায় যে, অজানা কোন্ সেই কালে সৈন্ধব অঞ্চল থেকে স্থানান্তরণের পর কুড়মিদের পূর্ব পুরুষেরা গোয়ালিয়রে বসবাস স্থাপন করলেও কালক্রমে তাঁদেরই বেশ কিছু সংখ্যক লোক ছত্রিশগড়ে এসে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস স্থাপনের পর পারস্পরিক দূরদূরান্তে থাকার ফলশ্রুতিতে কুড়মিদেরই কথায়-বার্তায় কুড়মিদেরই মাতৃভাষা কুড়মালির স্বরূপের রূপান্তর জনিত কারণে ছত্তিশগড়ে উদ্ভূত তিনটি সামাজিক

কুড়মালি উপভাষা—'ছত্তিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি'-র উপরে কালান্তরে নব্য ভারতীয় ভাষাসমূহের (বাংলা, উড়িয়া, মগহী, মৈথিলী, ভোজপুরী, অবধিয়া, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা) শব্দ ও প্রত্যয় বিভক্তির যে-পাতলা বাহ্যাবরণ টুকু (Outward loose sereen of wards and suffixes) পড়েছে তা খুলে ফেলে দিলেই সেই আবরণের আড়ালে সংগোপিত মূল কুড়মালি ভাষাটিকে এক নজরে চিনে নেওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত গ্রিয়ারসনও তাই-ই করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিচারেও ছত্রিশগড়ে প্রচলিত উল্লিখিত ভাষা তিনটিকে কুড়মালি বলে অনায়াসে যে চিনে নিতে পারা যায়, সে কথারও সমর্থন গ্রিয়ারসনের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকেও পাওয়া যায়। আর এই দিক দিয়ে দেখা যায় যে গ্রিয়ারসন 'হলবি' ভাষার নমুনার মাধ্যমেই যেহেতু ছত্রিশগড়ের উল্লিখিত তিনটি সামাজিক কুড়মালি উপভাষারই সর্বেক্ষণ করেছেন তাই 'হলবি' ভাষার নমুনাও নিম্নে তুলে ধরা হল:—

নং-৮৪ হলবি (বস্তার স্টেট) স্পেসিম্যান-১

"কোনী আদমী-ছো দুই ঠান বেটা রলা। হুনী-ভিতর-ছো নানী বেটা বাপ-কে বোললো, 'এ বাবা, ধন-মাল-ভিতর-লে যে মো-ছো বাটা আই মো-কে দিআ'। তেবে হুন-কে আপন-ছো ধন-কে বাটুন দিলো। খুবে দিন নী হোউন রলী নানী বেটা সব-কে গোটকী -থানে বনাউন-ভাতি খুবে ধূর যাতে গেলো, অউর-হুথা ফটকভারী-বুদ-মেঁ দিন সারতে আপলো ধন গভাউন দিলো। যেবে হুন সব ধন-কে সারলো তেবে...... ইত্যাদি। (লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৯-৩৪১)

আবার

'হলবি' ভাষারই 'মহরী' উপভাষার নমুনাটি হল—

নং-৮৭ হলবি (বস্তার স্টেট) স্পেসিম্যান-১

"কোনী-ছো দুই-ঠান বেটা রলা। তা-ছো নানী বেটা বাপ-কে বোললো, 'এ বাবা, ধন-ভিতর-ছো যো মো-ছো ভাগ আসে তা-কে মো-কে দে। তেবে হুন-কে আপলো ধন-কে বাটা দিলো। বহুত দিন নী সারা রলী, নানী বেটা সব ধন-কে একে-ঠানে বনাঅলা, দূর দেশ গোল। অউর হুতা লাড়িআপন-মেঁ দিন সারতে রলো, সব ধন-কে বরবাদ করলো। যেবে সব ধন-কে সার-পকাঅলা তেবে..." ইত্যাদি। (লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা-৩৫৩-৩৫৫)

'হলবি' ভাষার নমুনা দুটির যেটুকু অংশ উদ্ধৃত করা হল সে দুটি যে হল অন্ততঃ গ্রিয়ারসনের পূর্ববর্তীকালীন সময়ে ছত্রিশগড়ে প্রচলিত কুড়মালি ভাষারই বিমিশ্র

রূপ সে কথাও জোর করেই বলতে পারি। কারণ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উদ্ধৃতাংশ দুটি থেকে 'আদমি', 'বোললো', 'দিলো', 'করলো', 'গেলো', 'আসে', 'অউর' শব্দ সাতটির সঙ্গে সঙ্গে 'মেঁ' এবং 'ছো' দুটি বিভক্তি চিহ্নকে বাদ দিয়ে দিলে যে অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে সেটিকে নিঃসন্দেহে কুড়মালি ভাষারই 'হাড়-গড়'-কঙ্কাল (The Skeleton of the Kurdmali Language) রূপে সনাক্ত করতে পারা যায়। গ্রিয়ারসনের দ্বারা 'হলবি' ভাষার নমুনাদুটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে যেটুকু জানতে পারা যায় তার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালি ভাষার 'হুবহু' মিল বহুলভাবে দেখতে পাওয়া যা। যথা:—

১। সর্বনাম পদ :

ক) উত্তম পুরুষ একবচন — মো , মই , মঁই, মুই , মুঁই । ম-কে , মো-কে -মোর ।

খ) মধ্যম পুরুষ একবচন— তু , তুই , তুহ- তোর , তুহার- তু-কে ।

গ) প্রথম পুরুষ একবচন —হুন, হুঁন, উন, উনী।

২। অন্যান্য সর্বনাম :

ক) নিকট নির্দেশক সর্বনাম —'ইহা' অর্থে-'ইএ', ইআ; 'তার' অর্থে -'ইএ-কর'; 'একে' অর্থে-'ইনহ্-কে'।

খ) দূর নির্দেশক সর্বনাম-ব্যক্তিবাচক-'ঐ' লোকটি অর্থে:— -'ওউ'; 'ওর' অর্থে-'ওউ-কর; 'ওকে' অর্থে- 'ওউ-কে/'উনহ্-কে'।

গ) আত্মবাচক সর্বনাম :— আপন, অপন-অপন

ঘ) অনির্দিষ্ট ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :— 'কেহ' অর্থে-কঅন? , কোন, কঅউন; 'কার' অর্থে- কাকর? 'কেন' অর্থে-কা; কায়ে? ,কাহে? কাহে-কে? 'কি কি' অর্থে- কাকা? 'কেন কেন' অর্থে-কাহে-কাহে? কাহে-কাহে-কে?।

৩। কারক-বিভক্তি :

(ক) কর্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি :- 'কে' (যথা- 'বাপ' কে, 'মো-কে'

(খ) করণকারকের বিভক্তি- করণকারকের কোনবিশেষ বা নির্দিষ্ট বিভক্ত নেই । তাই- (দ্বারা, দিয়া) সঁগে। যথা- অর্থাৎ 'দাঁড়ি-সঁগে

(গ) অপাদান কারকের বিভক্তি :- 'লে'। যথা- 'ধন-মাল-ভিতর-লে'

(ঘ) অধিকরণ কারকের বিভক্তি:- 'এ' । যথা- 'বাপ-ঘারে'

(ঙ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি -'কে' । যথা- ' বাপ-কে'।

(চ) সম্বোধন পদের বিভক্তিঃ- 'এ' (-র)। যথা- 'এ বাপ'

৪। ক্রিয়ারূপ :

(ক) যৌগিক ক্রিয়াপদঃ- ক্রিয়াপদের রূপে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ তিনটি কালে বাস্তব পরিস্থিতি দ্যোতক অস্ত্যর্থক 'হাঁ'-বাচক সংযোগবাহ একাধিক ক্রিয়াপদযুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদ প্রয়োগের প্রবণতা হল কুড়মালি ভাষারই অনুরূপ। যথাঃ- 'মুই নির্দিষ্টার্থক ঘটমান বর্তমানের 'দেখছি' অর্থে-দেক্-হ অত-হঅওউঁ' এবং 'মুই দেক্-হঅত-হঅউঁ। ঘটমান অতীতের 'দেখেছিলাম' অর্থে- 'মুই দেক্-হঅত-হঅউঁ। 'মুই দেক্-হঅত-রহেঁও', 'মুই দেক্-হঅওউঁ এবং 'মুই দেক্-হএ-হঅউঁ। আবার এই পুরাঘটিত বর্তমানকালে 'দেখেছি' অর্থে কুড়মালির অনুরূপ 'হওঅই' প্রত্যয়টির ব্যবহারও দেখা যায়। যথা:- 'মুই' দেক্-হেও-হওঅই'। পুরাঘটিত অতীতকালের 'দেখেছিলাম' অর্থে- মুই-দেখ-রহে-অও।

(খ) সহায়ক ক্রিয়াপদ এবং অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ :-

মূল কুড়মালি ভাষার একটি বিচিত্র ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যই হল কর্তৃপদের বচন অনুসারে ক্রিয়াপদেরও রূপের পরিবর্তন ঘটে থাকে। বলাবাহুল্য আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বাংলা-উড়িয়া-হিন্দী-মারাঠীর মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। আর তাই দেখা যায় ছত্রিশগড়ে প্রচলিত পূর্বোক্ত ভাষা তিনটিই মূলতঃ কুড়মালি হওয়ার কারণেই এইগুলিতেও কর্তৃপদের বচন অনুসারে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন পদ্ধতিটির অনিবার্যভাবে প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়:-

উত্তম পুরুষ একবচন- 'আমি হই' অর্থে- হওউঁ/হওঁ।
উত্তম পুরুষ বহুবচন- 'আমরা হই' অর্থে- হওউ/হউ।
মধ্যম পুরুষ একবচন- 'তুমি হও' অর্থে- হওস/হস।
মধ্যম পুরুষ বহুবচন- 'তোমরা হও' অর্থে- হওউ/হউ।
প্রথম পুরুষ একবচন- 'সে হয়' অর্থে- হওই/হই।
প্রথম পুরুষ বহুবচন- 'তাহারা হয়' অর্থে- হওইঁ/হইঁ।
উত্তম পুরুষ একবচন- 'আমি ছিলাম' অর্থে- রহেঁও/রহঅউ।
উত্তম পুরুষ বহুবচন- 'আমরা ছিলাম' অর্থে- র'হন।
মধ্যম পুরুষ একবচন- 'তুমি ছিলে' অর্থে- র'হস/রহস।
মধ্যম পুরুষ বহুবচন- 'তোমরা ছিলে' অর্থে- র'হও।
প্রথম পুরুষ একবচন- 'সে ছিল' অর্থে- রওই/রহঅঅ।
প্রথম পুরুষ বহুবচন- 'তাহারা ছিল' অর্থে- রহইঁ/রহঅঁঅ।

(গ) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ :-

গ্রিয়ারসনের দ্বারা ছত্রিশগড়ের ভাষার সর্বেক্ষণে উপলব্ধ 'ছততিসগড়ি' , 'হলবি' ও 'সুরগুঁজিআ' এই ভাষা তিনটির মধ্যে প্রচলিত অসমাপিকা । ক্রিয়াপদের উদাহরণ পাওয়া যায় সেগুলির প্রায় অনুরূপ প্রচলন কুড়মালি-মূলীয় মানভূম-সহ ঝাড়খন্ডের আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার মধ্যেও দেখা যায়। যথা:-দেক্হঅত, দেক্-হঅতে, দেক্-হ', দেক্হ-কে।

উত্তম পুরুষ একবচন- দেক্-হঅউঁ ।

উত্তম পুরুষ বহুবচন- দেক্হঅন ।

মধ্যম পুরুষ একবচন- দেক্হঅস ।

মধ্যম পুরুষ বহুবচন- দেক্হঅন ।

প্রথম পুরুষ একবচন- দেক্-হঅই /দেক্-হঅয়।

প্রথম পুরুষ বহুবচন-দেক্হে ।

(অনুজ্ঞা):-

মধ্যম পুরুষ একবচন-দেক্-হ' /দেক্-হে' ।

মধ্যম পুরুষ বহুবচন-দেক্-হ-অউ' /দেক্হি , দেক্-হা ।

প্রথম পুরুষ একবচন- দেক্-হে ।

প্রথম পুরুষ বহুবচন- দেক্-অহঁ ।

৫। ভাববাচক ক্রিয়াপদ:

উত্তম পুরুষ একবচন- মড়াঅউঁ ।

উত্তম পুরুষ বহুবচন- মড়াঁও ।

মধ্যম পুরুষ একবচন-মড়াস ।

মধ্যম পুরুষ বহুবচন- মড়াওঅস ।

প্রথম পুরুষ একবচন- মড়াঅই ।

প্রথম পুরুষ বহুবচন- মড়াঅইঁ ।

৬। অনিয়মিত ক্রিয়াপদ :

'হওয়া' অর্থে- হঅন; 'যাওয়া' অর্থে- জান; 'করা' অর্থে- কঅরঅন; 'দেওয়া' অর্থে- দেন; 'লওয়া' অর্থে-লেন (অনিয়মিত অতীত ক্রিয়া বিশেষণ) ।

(সংযোজক ক্রিয়াবাচক বিশেষণ) : 'ভঅয়ে',গঅয়-এ,কঅর-এ /কিয়এ,দিহএ /দিয়এ, লিহএ/লিয়এ।

৭। 'হলবি' শব্দ ভাণ্ডার :-

বলাবাহুল্য 'হলবি', 'সুরগুঁজিআ' এবং 'ছততিসগড়ি' ভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানভূমের কুড়মালি ভাষার মিল তো আছেই তাছাড়াও শব্দভাণ্ডারের হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। যথা:-

মুঁ, মুড়, জিব, পেট, পিঠ, লহা, সোন , রুপ, দাদা, ভাই, বাবা, বহিন, মেহরার, ভূত, ভগওবান, বের, বেরা, তারা, আইগ, পানি, গাই, কুকুর, বিলাই, চিরাই, যা, খা, আবা, মার, উঠ, মর, পরার, উপর, লাগে, দূর, আগো, পাছো, কায়, আরু, হঁ, নাই/নাহি, বদমাস, খুবে, হওন, মারণ ইত্যাদি।

পরিশেষে এইভাবে যথাযথ তথ্য তথা যুক্তিনির্ভর আলোচনার দ্বারা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, গ্রিয়ারসন যদিও ছত্রিশগড়ে প্রচলিত সামাজিক কুড়মালি উপভাষা 'ছততিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি' কে পূর্বী হিন্দীর উপভাষা বলে প্রথমে মন্তব্য করেছেন তবুও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত 'সাদরি-কোল' ও 'সাদরি-কোরয়া' অঙ্গ বিভাষার আলোচনা করতে গিয়ে স্ব-বিরোধী মন্তব্যের দ্বারা এই বিভাষা দুটিকে মানভূমের কুড়মালি বলে স্বীকার করতে তেমনিভাবেই বাধ্য হয়েছেন যেমনভাবে এর আগে মানভূমের কুড়মালিকে পূর্বী মাগধীর উপভাষাজাত বললেও শেষ পর্যন্ত সেটিকে দ্রাবিড়ীয় কুড়মি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকার করতে ও বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিচ্ছেদ-১

*** আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা গুচ্ছ প্রসঙ্গে :-**

কুড়মালি ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা গুচ্ছের আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারা যায় যে সৈন্ধব অঞ্চল থেকে স্থানান্তরণের পর প্রাচীন মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং ছত্রিশগড়ে কুড়মিদের পূর্বপুরুষেরা বসবাস স্থাপত করার ফলে কেমনভাবে যে 'গোলআরি', 'ছততিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' ও 'হলবি' এই চারটি সামাজিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভব ঘটেছিল তার বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়েই করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই সময়কালটিতে কুড়মালি ভাষার কোন আঞ্চলিক উপভাষার উদ্ভব ঘটেনি। কারণ তখনো পর্যন্ত কুড়মিদের সঙ্গে অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষদের কোনপ্রকারের সম্পর্কই ঘটেনি বলে কুড়মালি ভাষাটিরও স্বরূপের মধ্যেও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ছত্রিশগড়ের উত্তরাঞ্চলের সুরজপুর, বলরামপুর, যশপুর,

সুরগুঁজা, রায়গড় প্রভৃতি জেলায় বসবাসকারী কুড়মিদের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এক বা একাধিক দলে উত্তর-পূর্ব ছত্রিশগড়ের পূর্ব সীমান্তবর্তী ছোটনাগপুর মালভূমির গড়য়া, পালামৌ, চতরা, লাতেহার, ডাল্টনগঞ্জ, গুমলা প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় এসে কৃষিযোগ্য এলাকায় যখন বসবাস স্থাপন করেন তখন ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষাভাষী সাঁওতাল-মুন্ডা-হো-খাড়িয়া প্রভৃতি মানুষদের সঙ্গে কুড়মিদের মিলামিশাও ঘটতে থাকে। আর এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সংমিশ্রণে এক-এক অঞ্চলে এক-একটি বৈচিত্রপূর্ণ আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভব ঘটতে থাকে। আর বলা বাহুল্য এই উদ্ভবক্রম ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ স্থাপনের কাল পর্যন্ত চলতেই থাকে। কিন্তু সে যাই হোক, কালানুক্রমিক উদ্ভবের বিচারে আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাগুলিকে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা যায়। যথা:-

১। 'সাদরি' পর্যায়ভুক্ত আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা :-

'সাদরি' বিশেষণায়িত আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার সংখ্যা হল তিনটি। যথাঃ- উত্তর-পশ্চিম ছত্রিশগড়ের বিলাসপুর জেলার পশ্চিমাংশ সহ যশপুর প্রভৃতি জেলার **'সাদরি-কোরআ'** কুড়মালি উপভাষা, দক্ষিণ ছত্রিশগড়ের বস্তার প্রভৃতি জেলা তথা উত্তর পশ্চিম ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত গড়য়া, পালামৌ প্রভৃতি জেলার **'সাদরি-কোল'** কুড়মালি উপভাষা এবং ব্রিটিশ আমলে আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে 'এমিগেশন অ্যাক্ট' প্রভৃতির মাধ্যমে ছোটনাগপুর থেকে দেশান্তরিত কুড়মি জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য কুড়মালি লোকভাষাভাষী ১০৮ টি 'চা জনগোষ্ঠীর' (টি ট্রাইব) মধ্যে প্রচলিত **'সাদরি-কুড়মালি'** উপভাষা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই 'সাদরি' বর্গীয় আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাগুলির উদ্ভবের প্রসঙ্গে বলতে পারা যায় যে, 'ছততিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ' তথা 'হলবি' কুড়মালি সামাজিক উপভাষাগুলির উদ্ভবকালীন সময় পর্যন্ত অন্য ভাষাভাষী অন্য কোন গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে কোনপ্রকার পরিচয়ই ছিল না। ফলে এই সময়কাল পর্যন্ত কুড়মালি ভাষাটিও (তা 'গোলআরি', 'ছততিসগড়ি', 'সুরগুঁজিআ', 'হলবি' প্রভৃতি সমাজিক কুড়মালি উপভাষাগুলির ভাষাছাঁদে পারস্পরিক কিছু পার্থক্য ঘটলেও) ছিল বিশুদ্ধ। কিন্তু পরবর্তীকালে ছত্রিশগড়েই সর্বপ্রথম কোল গোষ্ঠীভুক্ত কুড়ুখ গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে কুড়মিদের পরিচয় ঘটে এবং প্রথমে উভয়গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকলেও পরিশেষে কুড়মিরাই বিজয়ী হলেও কালক্রমে উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে যে হিত-মিতান-ফুল-সইহার পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল সে কথারও সমর্থন পাওয়া

যায়।

বলাবাহুল্য বিজয়ী কুড়মিদের দ্বারা বিজিত মুন্ডাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের মূলে ছিল কুড়মিদের দূরদর্শিতা। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুখে শান্তিতে কৃষিকার্য করে জীবনধারণ করতে হলে মুন্ডাদের সঙ্গে শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে মিত্রতা স্থাপনই হল সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাছাড়া কৃষিকার্যে কোল-মুন্ডাদের সহযোগিতাও ছিল একান্তভাবে কাম্য। আর এইভাবে উভয়গোষ্ঠীর মানুষ একসঙ্গে মিলে মিশে জীবন-যাপন করার ফলে কুড়মিদের মধ্যে একদিকে যেমন কুড়মালি ভাষা প্রচলিত ছিল তেমনি মুন্ডাদের অন্যদিকে মুন্ডাদের মধ্যে মুন্ডারী (বা ব্যাপকার্থে 'কোল' ভাষা) ভাষার প্রচলন থেকে যায়। আর এই অবস্থায় মুন্ডারা কুড়মিদিগকে যেমন বলতেন 'সাদান' বা সেদান' (অর্থাৎ মুন্ডা নন এমন জনগোষ্ঠী বা কুড়মি)। তেমনিভাবে কুড়মালিকেও কোল মুন্ডারা বলতেন 'সাদানি' বা 'সেদানি' ভাষা (অর্থাৎ যাঁরা মুন্ডা নন তাঁদের বা কুড়মিদের ভাষা)। আর পরবর্তীকালে এই একই অর্থে উদ্ভূত হয় 'সাদরি' (অর্থাৎ কুড়মালি) শব্দটির।

১। ড. বিনয় মাহাত ঃ লোকায়ত ঝাড়খন্ড ঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ.-৩৩,৩৪।
২। ই. টি. ডাল্টন ঃডেস্ক্রিপটিভ এ্যাথনোলোজি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা-৩১৭।
৩। দি ট্রাইবেল কালচার অব ইন্ডিয়া ঃ পৃষ্ঠা-৩১।
৪। তরুণদেব ভট্টাচার্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-৩, পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৭৯।
তরুণ দেব ভট্টাচার্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-৩, পুরুলিয়া- প্র.পৃ. ১৯৮৬, পৃ-২৭৯)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'সাদানি', 'সেদানি' 'সাদরি' প্রভৃতি সব শব্দই হল মুন্ডারি (বা কোল) অর্থ হল- যাঁরা মুন্ডা নন এমন জনগোষ্ঠী কুড়মিদের ভাষা 'কুড়মালি'। এই 'সাদরি' শব্দটি হল মুন্ডারি এবং এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিও হল- 'সাদরি' < সাদান (অর্থাৎ মুন্ডাদের দ্বারা অভিহিত 'কুড়মি' শব্দটির সমার্থক শব্দ) + 'রি' প্রত্যয়; ('মুন্ডারি' শব্দটির অন্ত্য প্রত্যয় 'রি' সম্বন্ধার্থে) > সাদান-রি > সাদরি। আর এইভাবে জানতে পারা যায় যে সাদরি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও হল 'কুড়মালি'।

এইক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই 'সাদরি' শব্দটির অর্থ 'কুড়মালি' হলেও 'সাদরি' পর্যায়ভুক্ত 'সাদরি-কোরআ', 'সাদরি-কোল' তথা 'সাদরি-কুড়মালি' এই তিনটি আঞ্চলিক কুড়মালি ভাষার নামকরণের ক্ষেত্রেই 'সাদরি' শব্দটি বিশেষণের মতই ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে মুন্ডাদের ভাষার সংমিশ্রণে জাত ভাষাগুলিই হল 'সাদরি-কোল' 'সাদরি-কোরয়া' 'সাদরি-কুড়মালি প্রভৃতি ভাষা।

তবে যেহেতু ছত্রিশগড়ের বস্তার জেলার 'সাদরি-কোল' ও যশপুর জেলার

'সাদরি-কোরআ' নামক কুড়মালি উপভাষা দুটির সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে তাই আর পুনরুক্তি না করে ছোটনাগপুরে কুড়মিদের আগমনের পর গঢ়য়া-পালামৌ-চাতরা, গুমলা প্রভৃতি জেলায় উদ্ভূত 'সাদরি-কোল' আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার আলোচনা থেকে আরম্ভ করে ছোটনাগপুর মালভূমিতে উদ্ভূত অপরাপর আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাগুলির ক্রমানুসারী আলোচনা করে প্রত্যেকটির উপভাষা ভৌগলিক ক্ষেত্রের পরিভাষা তুলে ধরা হল। যথা:-

*** ছোটনাগপুরিআ 'সাদরি-কোল' :-** ছোটনাগপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কুড়মিরা যখন ছত্রিশগড় থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসেন তখন গঢ়য়া, পালামৌ, চাতরা, গুমলা, ডাল্টনগঞ্জ, লাতেহার প্রভৃতি সুবিস্তৃত এলাকায় পূর্বাবধি বসবাসকারী কেল মুন্ডাদের আধিপত্য ছিল। আর স্বাভাবিক কারণেই এই সব এলাকায় কোল-মুন্ডাদের 'কোল' বংশীয় ভাষাও প্রচলিত ছিল বলেই পরবর্তীকালে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে কোল-মুন্ডাদের 'কোল' ভাষার মিশ্রণে সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয় 'সাদরি-কোল' নামক কুড়মালি আঞ্চলিক উপভাষার। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে 'কুড়মি-কোল সম্বন্ধ' -এর কথা বলতে গিয়ে এর আগেই ছোটনাগপুরে উদ্ভূত আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা 'সাদরি-কোল'-এর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে সংক্ষেপেই বলা হল।

*** আসামে প্রচলিত 'সাদরি-কুড়মালি' :-**

আসামের 'সাদরি-কুড়মালি' উপভাষাটির প্রসঙ্গে জানতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'ইন্ডিয়ান এমিগ্রেশেন অ্যাক্ট', 'ইনল্যান্ড এমিগ্রেশন অ্যাক্ট' প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমিক যোগানকারী আড়কাঠি (ঠিকাদার)দের দ্বারা আসামের চা-বাগানের শ্রমিক হিসাবে কুড়মিসহ অসংখ্য কুড়মালি ভাষাভাষী ছোটনাগপুরের লোককে চালান দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ জানতে পারা যায় যে, একমাত্র ১৯৮৪ সালেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসামের চা-বাগানে যে শ্রমিক দেশান্তরিত হয়েছিল তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৮০,৮৩১ জন। আর শ্রমিক সংখ্যার ৪৪.৭/ প্রতি শত (অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক সংখ্যক) শ্রমিকই ছিল ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত কুড়মালি ভাষাভাষী কুড়মিসহ মুন্ডা, ওঁরাও, ভূমিজ, সাঁওতাল, ডোম, রাজোয়াড়, বাউরি,কামার, কুম্হার, মাহলি প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ। বলাবাহুল্য ১৯৮৪ সালেই এঁদের সংখ্যা ছিল মোট সংখ্যা ১,৮০,৮৩১ জনের মধ্যে ৪৪.৭ শতাংশ প্রতি শত অর্থাৎ ৮০,৮৩১ জন।

(ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাত ঃ 'ঝাড়খন্ডের বিদ্রোহ ও জীবন ঃ প্র.পৃ. ১৯৮২, পৃ.-৪৯)। কাজেই ১৯৮৪ সাল থেকে অদ্যাবধি ১৩৫ বছরে (প্রায় ৫/৬ 'পিড়হি' পরে) কুড়মালি ভাষাভাষী লোকদের সংখ্যা যে কয়েকগুন অধিক হয়েছে সেকথাও অনায়াসে অনুমিত।

প্রসঙ্গতঃ এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মানভূম থেকে ব্রিটিশ আমলে আসামের চা-বাগানে দেশান্তরিত কুড়মি জনগোষ্ঠীর বর্তমান উত্তর পুরুষদের অন্যতম আসামের কুড়মালি ভাষা সংস্কৃতি গবেষক- সুরেশ কুড়মি (সাঁখুআর) মহাশয়ের (গ্রাম-রঙ্গোলী, পোঃ- রঙ্গোলী-ভাইয়া-মোরন, জিলা- তরাইদেও, আসাম) কাছ থেকে উপলব্ধ তথ্যানুসারে জানতে পারা যায় যে বর্তমানে ২০১৯ সালের এন.আর.সি রিপোর্ট অনুসারে আসামের ১০৮ টি 'গ্রুপ ' বা দলভুক্ত লোকেরা 'চা-জনগোষ্ঠী' (টি ট্রাইব) নামে পরিচিত লোকদের সংখ্যা হল প্রায় ১ কোটি ৩৬ লাখ। আর এই জনসংখ্যার মধ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে মানভূম-সিংভূম, রাঁচী, হাজারিবাগ প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশান্তরিত কুড়মিদের বর্তমান প্রজন্মের জনসংখ্যা হল প্রায় চার/পাঁচ লাখের মত যাঁরা আসামের ২০টি জেলায় দলবদ্ধভাবে বসবাস করে চলেছেন। বলাবাহুল্য এই ১০৮ টি 'চা-জনগোষ্ঠী' (বা 'চা-জনজাতি' নামে পরিচিত) মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে লোকভাষার প্রচলন রয়েছে তা 'সাদরি-কুড়মালি' নামেই বহুল পরিচিত। 'সাদরি-কুড়মালি' নামক আসামের কুড়মালির এই উপভাষাটির সাম্প্রতিক নমুনা হল নিম্নরূপ—

"হামদের ইঁহাকে এক এক জিলাক এক এক রকম ভাষা আহেই। তবে হামদের তরাইদেও জিলাকের সাদরি-কুড়মালি ভাষা নিচে লিখলঁ—

তদের ১০/১৫ লকেক মারচ মাসেঁ আওআর কাথা সুনি ইঁহাক সভে খুসি হেলাহি। তহরা জদি একবার আওঅইতেলা তবে হামরা বহুত খুসি হথি। এহে দইআ করিকে একবার আউআ। তহরা আউলে হামরাউ চার ঝনমান জাঅম। তহরাক উঁহালে হামরা পুরুইলা, মানভুম, হাজারিবাগ ঘুরি ফিরি দেখা সুনা করি আঅম। মঁই ভাল আহঁ। চিঠি দিহা। ইতি-

তহরাক
সুরেশ কুড়মি।
(১৫/৮/২০১৯)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উল্লিখিত 'সাদরি-কুড়মালি' নামক কুড়মালি উপভাষার নমুনাটি মূলতঃ হল বাংলাদেশের পাবনা জেলার 'কুড়মি মাহাতো ভাষা' নামে প্রচলিত উপভাষাটিরই ভাষান্তরিতকরণ।

২। 'নাগপুরিআ' আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল :

পূর্বোক্ত 'সাদরি-কোল' আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাটির উদ্ভবের প্রাসঙ্গিক আলোচনার খেই ধরে বলতে পারা যায় যে, আলোচ্য 'নাগপুরিআ' নামক আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাটি হল ছত্রিশগড় থেকে ছোটনাগপুর মালভূমিতে স্থানান্তরনের পরবর্তীকালীন উদ্ভূত দ্বিতীয় প্রাচীন আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা। বলাবাহুল্য, এই 'নাগপুরিআ' উপভাষাটির উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র এবং পূর্বোক্ত 'সাদরি-কোল' উপভাষাটির উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র যে হল একই তারও সমর্থন পাওয়া যায় যখন জানতে পারা যায় যে, ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজাদের প্রাচীন ('নাগপুর রাজ্য' বা 'নাগভূমরাজ্য')-এর পরিসীমা সম্পর্কে কেউ মন্তব্য করেন-"সুপ্রাচীনকালে ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজাদের প্রশাসন ক্ষেত্রটি 'নাগভূম' বা 'নাগপুর' নামে অভিহিত হত। বর্তমান রাঁচী জেলা ও তৎসংলগ্ন হাজারিবাগ, রামগড়, চাতরা, পালামৌ প্রভৃতি ঝাড়খন্ডের সুদূর পশ্চিমস্থিত সুবৃহৎ এলাকা জুড়ে ছিল এই নাগপুর রাজ্যের বিস্তৃতি। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে এই নাগপুর বা নাগভূম রাজ্যটি ছিল বর্তমান পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমে অবস্থিত। (তরুণদেব ভট্টাচার্যঃ প.ব. দর্শন-৩, পুরুলিয়া, প্র.প্র. ১৯৮৬, পৃ-১৭)। মন্তব্যটি থেকে স্পষ্টতই জানতে পারা যায় যে, 'সাদরি কোল' তথা 'নাগপুরিআ' নামক আঞ্চলিক উপভাষা দুটিরই প্রচলন এলাকা হল একই। আর ঝাড়খন্ডের এই সুবৃহৎ অঞ্চলে কুড়মিরা যে বহুকালাবধি ঘনভাবে বসবাস করে আসছেন সেকথাও হল অনস্বীকার্য সত্য।

প্রসঙ্গতঃ একথা বলতেও বাধা নেই যে, কুড়মালি ভাষাটি পূর্বোক্ত 'নাগভূম বা নাগপুর' রাজ্যের লোকভাষা রূপে প্রচলিত থাকার কারণেই এতদ্ঞ্চলে উদ্ভূত কুড়মালি উপভাষাটির নামকরণটিও 'নাগপুর' অঞ্চলটির নামানুসারে স্বাভাবিকভাবেই 'নাগপুরিআ' কুড়মালি হয়ে পড়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে বোধ হলেও একটি কথা উঠে আসে যে ঐ প্রাচীন নাগপুর রাজ্যে কুড়মিরা যেহেতু স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁদের কুড়মালি ভাষাটিও যেহেতু সেখানকার লোকভাষারূপে প্রচলিত থাকার কারণেই 'নাগপুরিআ' নামক আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাটিরও উদ্ভব সুপ্রাচীন কালেই ঘটেছে।

৩। 'পাঁচপরগনিআ' কুড়মালি উপভাষা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল :

উপরোক্ত 'সাদরি-কোল' তথা 'নাগপুরিআ' আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার

ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাল বসবাস করার পর কুড়মিদের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আরও কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে রাঁচী জেলার অন্তর্গত মূলতঃ রাহে, বুন্ডু, তামাড়, সোনাহাতু ও খুঁটি-এই পাঁচটি পরগনা সহ পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বসবাস স্থাপন করেন। আর এই পাঁচপরগনিআ আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাটি উদ্ভবের আনুমানিক কাল হল 'নাগপুরিআ' আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষার উদ্ভবের কিছুকাল পর থেকে আরম্ভ করে ব্রাত্যকালীন প্রাক্-খ্রীষ্টাব্দীয় কাল পর্যন্ত।

সম্ভবতঃ এই সময়কালে থেকেই কুড়মিদের সঙ্গে সাঁওতাল-মুন্ডা-হো-খাড়িয়া, বীরহড় প্রভৃতি অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে কুড়মালি ভাষার স্বরূপ বা ভাষাছাঁদ নানান গোষ্ঠীর মানুষদের লোকব্যবহারের ফলে বেশ কিছু ভিন্নরূপ গ্রহণ করে। আর যেহেতু উল্লিখিত পাঁচটি পরগণাকে কেন্দ্র করে এই ভাষাটির প্রচলন ঘটেছিল তাই 'পাঁচপরগণা' শব্দটির নামানুসারে এই উপভাষাটিরও নাম হয়ে পড়ে 'পাঁচপরগনিআ' কুড়মালি উপভাষা। পরবর্তীকালে এই 'পাঁচপরগনিআ' উপভাষাটি সমগ্র ডাল্টনগঞ্জ, লোহারদাগা, সিমডেগা, সিংভূম, সরাইকেলা-খরসোঁয়া প্রভৃতি জেলাতেও কুড়মিদের কালানুসারী স্থানান্তরণের সূত্র ধরে সর্বত্র প্রচলিত হয় পড়ে। এইভাবে জানতে পারা যায় যে, কুড়মালির আঞ্চলিক উপভাষার উদ্ভবের বিচারে 'পাঁচপরগনিআ' হল তৃতীয়।

৪। 'সিখরিআ' কুড়মালি উপভাষা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল :

কড়মালি উপভাষার উদ্ভবের দিক থেকে 'সিখরিআ' আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাটিও হল মূলতঃ প্রাক্-ঔপনিবেশিক এমনকি প্রাক্-পৌরাণিককালীন উদ্ভূত চতুর্থ আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উল্লিখিতভাবে কুড়মি জনগোষ্ঠীর কালানুক্রমিক ছোটনাগপুর মালভূমিতে স্থানান্তরণ ও বসবাস স্থাপন পশ্চিম ও দক্ষিণ ছোটনাগপুরের প্রায় সমগ্র সুবিস্তৃত অঞ্চলে হওয়ার পর তাঁদের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আরও পূর্ব মুখে অগ্রসরিত হয়ে বিন্ধাচল পর্বতমালার পূর্ব প্রান্তস্থিত সর্বশ্রেষ্ঠ 'সমেতশিখর' বা 'পরেশনাথ' পর্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে বসবাস স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য এই 'সমেতশিখর' বা 'পরেশনাথ' পর্বতকে কেন্দ্র করে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে মহারাজা দামোদর শেখর ২ শকাব্দে (৮০ খ্রীষ্টাব্দে) 'পাঁচেট' বা 'পঞ্চকোট' রাজ্য স্থা পন করেন। আর এই রাজ্যটি 'শিখরভূম' রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল বলেই এই 'শিখর' রাজ্যের লোকভাষা, এমনকি রাজভাষা রূপে প্রচলিত থাকার কারণে কুড়মালি ভাষা থেকে

উদ্ভূত আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা হল 'সিখরিআ' এবং এটি হল চতুর্থ আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুড়মালি ভাষাটি যে 'শিখরভূম' রাজ্যের রাজভাষা হিসাবেও প্রচলিত ছিল তার সমর্থন পাওয়া যায় যখন কোন গবেষক বলেন যে—'মানভূম গেজেটিয়ার' সন ১৯৩১, পৃ- ২৭৮ তে পাঞ্চেত বা পঞ্চকোট (কাশীপুর) রাজার এক প্রাচীন রাজপ্রাসাদের উল্লেখ রয়েছে। ঐ রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন দ্বারের নাম হল 'আঁখ দুআর', 'দুআর বন্দ', 'খড়িবাড়ি দুআর' 'বাজারমহল দুআর' প্রভৃতি এক বিশেষ প্রকারের লিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। এই বিচিত্র লিপির ভাষা হল কুড়মালি। (ডঃ নন্দ কিশোর সিংহ ঃ কুড়মালি কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন, প্রথম সংস্করণ-২০০৮, পৃষ্ঠা-প্রবেশক -ii)

৫। ঠেঠ কুড়মালি, ঠাঠ কুড়মালি, ঠাড় কুড়মালি, ঠার কুড়মালি, থার কুড়মালি ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল :

কড়মালি ভাষার যতগুলি উপভাষা রয়েছে সেগুলির মধ্যে আলোচ্য ঠেঠ/ঠাঠ/ঠাড়/ঠার/থার কুড়মালিটি হল সবিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিশেষণাত্মক 'ঠেঠ', 'ঠাঠ', 'ঠাড়', 'ঠার', 'থার', এই পাঁচটি শব্দই হল যেমন সমার্থক তেমনি এইগুলির উদ্ভবও একই মূল 'ঠেঠ' (অর্থাৎ নির্ভেজাল, খাঁটি, মূল, আসল) শব্দ থেকেই হয়েছে; ঠেঠ > ঠাঠ > ঠাড় > ঠার > থার। আর এইভাবে বলা যায় যে, এইসব বিকল্প বা পর্যায়বাচী নামগুলি দিয়ে অবিমিশ্র কুড়মালি ভাষার বিশিষ্ট স্বরূপ বা ভাষাছাঁদকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এই 'ঠেঠ', 'ঠাঠ' আদি বিভিন্ন সমার্থক নামে অভিহিত আঞ্চলিক কুড়মালি উপভাষাটির ক্ষেত্র হল মূলতঃ প্রাচীন বৃহত্তর মানভূম জেলা সহ সরাইকেলা-খরসোঁয়া জেলা তথা পার্শ্ববর্তী সুবৃহৎ অঞ্চল। উপলব্ধ তথ্যাদি থেকে জানতে পারা যায় যে সম্ভবতঃ এইসব এলাকাগুলিতে কুড়মিদের আগমনের পূর্বে কোল-মুন্ডাদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু কুড়মিরা এইসব এলাকা থেকে তাঁদের আরও দক্ষিণ দিকস্থ বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে দিয়ে কৃষিযোগ্য নানান স্থানে ঘনভাবে বসতি স্থাপন করেন।

আর সম্ভবতঃ প্রাক্-ঔপনিবেশিককাল থেকেই মূলতঃ কুড়মিদের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি ভাষাভাষী অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেও কুড়মালি ভাষাটির প্রচলন থাকার কারণেই কুড়মালি ভাষাটির স্বরূপে বা ভাষাছাঁদে মূলতঃ কোন পার্থক্য ঘটেনি। অর্থাৎ প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালে যেহেতু এইসব ঝাড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা

সমাচ্ছাদিত সু-বিস্তৃত এলাকাতে জীবনযাপনোপযোগী কোন উপায় ছিলই না বলেই বাংলা-উড়িয়া- হিন্দী, ভোজপুর, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাভাষী কোন লোকদের এতদ্‌ঞ্চলে আগমনেরও কোন প্রশ্নই ছিল না। যার ফলে কুড়মালি ভাষাটিও মূলতঃ কুড়মিদেরই বোলচালে থেকে যাওয়ার কারণেই ভাষাটির স্বরূপও থেকে যায় একেবারে 'ঠেঠ'/'ঠাঠ'/ 'ঠার'/'ঠাড়'/থার (বা নির্ভেজাল বা মূল বা আসল) অবস্থায়।

৬। খঠ্‌ঠা কুড়মালি/খোর্ঠা কুড়মালি/খঠঠাহি কুড়মালি :

আলোচ্য 'খঠঠা কুড়মালি' / 'খোর্ঠা কুড়মালি'/ 'খঠঠাহি কুড়মালি' আঞ্চলিক উপভাষাটি হল ব্রিটিশ উপনিবেশোত্তর কালে উদ্ভূত কুড়মালির একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপভাষা। অবিভক্ত প্রাচীন মানভূম জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাংশের সুবিস্তৃত এলাকার পাড়া, রঘুনাথপুর, কাশীপুর, সাঁতুড়ি, নিতুড়িয়া, ধানবাদ, গিরিডিহ, ঝরিয়া, কাতরাস, বাঘমারা, তোপচাঁচী, বোকারো, কসমার, গোলা, রায়গড়, হাজারিবাগ প্রভৃতি সুবিস্তৃত ভূ-ভাগে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম-শিখ-ইসাই প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষীর অসংখ্য জন সাধারণের মধ্যে লোকভাষা রূপে প্রচলিত কুড়মালি ভাষাটি সাধারণতঃ 'খঠঠা কুড়মালি' /'খোর্ঠা কুড়মালি'/ 'খঠঠাহি কুড়মালি' নামেই সুপরিচিত রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ঐতিহাসিক সূত্র ধরে এই উপভাষাটির উদ্ভবের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ স্থাপনের সময়কালে বাংলা-উড়িয়া, ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী অজস্র মানুষ ব্রিটিশ সরকারের অফিস আদালতে কাজ করার জন্য এবং রেলওয়ে, কয়লাখনি, চা-বাগান, জঙ্গল কেটে পথ-ঘাট-গড় নির্মাণ প্রভৃতিতে শ্রমিকের কাজ করে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে এইসব অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। আর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ স্থাপনের বহু পূর্ববিধি এই সব অঞ্চলে যেহেতু কুড়মালি ভাষাটি লোকভাষা রূপে প্রচলিত ছিল এবং যেহেতু প্রধানতঃ কুড়মিরাই ছিলেন খাদ্যান্ন উৎপাদন ও সরবরাহকারী (অর্থাৎ খাদ্যান্ন বিক্রেতা) তাই হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে বহিরাগত বিভিন্ন ভাষাভাষীরা কুড়মালি ভাষার সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ ভাষার শব্দ মিশিয়ে যেন-তেন প্রকারে কাজ চালানো ভাষায় কথাবার্তার আদান-প্রদানের ফলে খিঁচুড়ি জাতীয় কুড়মালির যে বিশেষ ভাষাছাঁদ গড়ে উঠে তাই হল মূলতঃ 'খঠঠা কুড়মালি' বা 'খঠঠাহি কুড়মালি'।

আবার আলোচ্য কুড়মালি উপভাষাটির নামকরণের প্রসঙ্গে বলতে পারা যায় যে, কুড়মালি ভাষাতে 'অতিশয়' অপরিষ্কার' অর্থে 'খঠর্ঠা, 'খঠঠাহা' শব্দগুলি বহুল

প্রচলিত রয়েছে। আর এইভাবে বলতে পারা যায় যে, কুড়মালির সঙ্গে কালানুসারে বাংলা, ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে যে অপরিষ্কৃত রূপে কুড়মালির উপভাষার উদ্ভব ঘটে এবং এটিই হল আসলে 'খঠঠা কুড়মালি'। গ্রিয়ারসন এটিকে আবার 'খঠঠাহী' ও বলেছেন। তাছাড়া কারও মতে কুড়মালি ভাষাটি বাঙালীদের নিকট 'অতিশয় শ্রুতিকটু' কর্কশ , অপ্রীতিকর হওয়ার কারণে এই ভাষাটিকে 'খঠঠা' বলা হয়ে থাকে। ১। শ্রীমতী রেখা সিংহ ঃ মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষ ঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, প্রাককথন১১৩৮; ২। ক্ষুদিরাম মাহাতঃ কুড়মালি ভাখিক ইতিহাস ঃঃ প্রঃ প্রঃ ১৯৮২, পৃ-৬; ৩। তরুণদেব ভট্টাচার্য ঃ প.ব. দর্শন-৩, পুরুলিয়া, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৬, পৃ-২৭৯।

এইভাবে কুড়মালির বিবিধ উপভাষার কালানুসারী উদ্ভব ও সংশ্লিষ্ট উপভাষা ভোগোলিক ক্ষেত্রগুলির ক্রমানুসারী সন্নিবেশের দ্বারা সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চল থেকে ছোটনাগপুর মালভূমিতে কুড়মি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের স্থানান্তরণ পথের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি অঞ্চলে বসবাস স্থাপনের সুস্পষ্ট উল্লেখ উপভাষাগুলির আঞ্চলিক নামকরণের নিহিতার্থের মধ্য থেকেই যে পাওয়া যায় সেকথাও হল ভাষা-বৈজ্ঞানিকভাবেই যথার্থ।

• উড়িষ্যার কুড়মালি প্রসঙ্গে :- তবে উড়িষ্যায় প্রচলিত কুড়মালি ভাষার কোন স্থানবাচক আঞ্চলিক বিকল্প নাম পাওয়া যায়নি। তবে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার রায়রঙ্গপুর, পাঁচপীর, সদর মহকুমা, কেঁওঝর, চম্পুয়া, অনন্তপুর, সুন্দরগড়, ঢেঙ্কানল, সুখিন্দা প্রভৃতি সুবিস্তৃত এলাকাতে কুড়মিরা যে সুপ্রতিষ্ঠিত চাষী হিসাবে সুদীর্ঘ কালাবধি বসবাস করে আসছেন সেকথাটিও হল অবিসংবাদিত সত্য। (ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতঃ ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন ঃ প্র. প্র.-১৯৮২, পৃ-৫৯) অনরূপভাবে একথাও ঠিক যে উড়িষ্যায় বসবাসকারী কুড়মিদের ভাষাটিও মূল নামানুসারে 'কুড়মালি' নামেই আজও প্রচলিত রয়েছে। অনুরূপভাবে এই কুড়মালি ভাষাটি আবার স্বাভাবিক কারণেই 'মাহাতালি ভাষা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গতঃ এইক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণে বলতে পারা যায় যে, উড়িষ্যার উত্তরে সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ডের সিমডেগা, সিংভূম, সরাইকেলা-খরসোঁয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী মূলতঃ কুড়মালি ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠকুড়মিদের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ প্রাক্-ঔপনিবেশিককালেই উড়িষ্যাতে স্থানান্তরিত হয়ে বসবাস স্থাপন করেছে বলে অনুমিত। আবার ঔপনিবেশিককালীন সময়ে বিশেষতঃ মানভূম,

সরাইকেলা-খরসোঁয়া, সিংভূম, সিমডেগা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অত্যাচার উৎপীড়ন যখন শুরু হয় তখন বহু সংখ্যক কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষ পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার বিভিন্ন নিরাপদ অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েও যে বসবাস স্থাপন করেন সেকথাও অনুরূপভাবেই অনুমিত।

প্রসঙ্গতঃ কারও মতানুসারে আবার ময়ূরভঞ্জ ও কেঁওঝর জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী কুড়মিরা মূলতঃ 'যৌতুক প্রজা'। (ডাঃ পশুপতিপ্রসাদ মাহাতঃ ঝাড়খন্ডের বিদ্রোহ ও জীবন) হিসাবে উড়িষ্যাতে বসবাস স্থাপন করার ফলে তাঁদের মধ্যে প্রচলিত কুড়মালি ভাষাটি সাধারণতঃ 'কুড়মালি' ও 'মাহাতালি' এই দুটি নামেই প্রচলিত রয়েছে।

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত "কুড়মালি ভাষা ও তার ভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র' সম্পর্কিত সুদীর্ঘ ভাষা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর নিঃসন্দেহে বলে পারি যে, সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চল থেকে কুড়মিদের যে স্থানান্তরণ যাত্রা শুরু হয়েছিল সে যাত্রা এসে থেমে যায় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-কেঁওঝর জেলাতে। এই ক্ষেত্রে বলতে পারা যায় কুড়মিদের এই যাত্রাপথটিকে মোটামুটি ভাবে 'কুড়মিদের সুবিধানুসারী স্থানান্তরণ পথ, বলতে পারা যায়। কারণ এই পথে তাঁরা স্বয়ং নিজেদের সুবিধা অনুসারেই অগ্রসারিত হয়েছিলেন।

৭। 'রাঢ়ি বোলি' বা 'কুড়মালি উপভাষা' :-

প্রসঙ্গতঃ জানতে পারা যায় যে, 'রাঢ় দেশ' অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমদিকস্থ সুবিস্তৃত ভূ-ভাগ'-এ (শব্দবোধ অভিধানঃ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ-১১৫৮) একদা কুড়মালি ভাষাটি প্রচলিত থাকার কারণে 'রাঢ়দেশের বোলি' বা ভাষার সুবাদে কুড়মালি ভাষাটি 'রাঢ়ি বোলি' নামে অভিহিত হয়ে পড়ে। আর পরবর্তীকালে এই 'রাঢ়িবোলি' বা 'কুড়মালি ভাষার' সঙ্গে বিশেষতঃ বাংলা ভাষার প্রত্যয় বিভক্তির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয় কুড়মালির নানান উপভাষা-'মানভুঁইআ কুড়মালি' 'ধলভুঁইআ কুড়মালি', 'মেদিনীপুরিআ কুড়মালি' প্রভৃতি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এইসব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এর আগে যথাস্থানে করা হয়েছে বলে আর পুনরাবৃত্তি না করে সংক্ষেপে উপভাষাগুলির ভৌগোলিক ক্ষেত্র সমূহের একুনে যে পরিসীমা পাওয়া যায় তাই হল একাধারে কুড়মিদের বসবাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি ভাষাটিরও ভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র। এ যেন হল 'টাকার এপিঠ-ওপিঠ' এর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের মত। অর্থাৎ যেখানেই কুড়মিরা বসবাস স্থাপন করেছেন সেখানেই এক-একটি কুড়মালি

উপভাষারও উদ্ভব ঘটেছে। তাই বলা যায়-"কুড়মালি ভাষাই বহন করে চলেছে কুড়মিদের ইতিহাস।"

প্রসঙ্গত জানতে পারা যায় যে, (ও.ডি.বি.এল-এর প্রথম খন্ডে গ্রিয়ারসন প্রদত্ত ভূমিকা থেকে) গ্রিয়ারসন যখন তাঁর ভাষা সংরক্ষণের কাজ করছিলেন সেই সময়কালে ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জী গ্রিয়ারসন সাহেবের নির্দেশনায় তাঁর গবেষণার বিষয় 'ও.ডি.বি.এল.'-এর কাজ করছিলেন। আর এই সময় গ্রিয়ারসন যে কুড়মালি ভাষার নমুনাটি নিয়ে কুড়মালি ভাষা সর্বেক্ষণ করেছিলেন (তৎকালীন মানভূমের স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু শীতল চন্দ্র চ্যাটার্জী প্রদত্ত) সে নমুনাটি (কুড়মালির নিজস্ব লিপি প্রচলিত না থাকার কারণে) বাংলা হরফে কুড়মালি লেখা হয়েছিল তাই সেই সময় থেকেই গ্রিয়ারসনের মতানুসারে 'SOME' নামোল্লেখহীন বাঙালী পন্ডিত কুড়মালি ভাষাটিকেই বাংলা ভাষার উপভাষা বলে দাবী করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই দাবীটি অত্যন্ত প্রবল রুপ ধারণ করে এবং 'টুসু সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের মাধ্যমে ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ সালে কুড়মালি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড মানভূমকে খন্ডবিখন্ড করে পুরুলিয়া জেলার নামে বঙ্গভুক্তিকরণ করা হয়। আর আসলে এইখান থেকেই শুরু হয় কুড়মালি ভাষা সংস্কৃতির দুরারোগ্য ব্যাধি যক্ষারোগের। আর তাই দেখা যায় গ্রিয়ারসন কুড়মিদিগকে দ্রাবিড়ীয় অ্যাব্রোজিনাল ট্রাইব বলে সনাক্ত করলেও এবং তাদের মাতৃভাষাকে কুড়মালি (কুড়মিদের মাতৃভাষা অর্থে) উল্লেখ করলে ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জী তাঁর ও.ডি.বি.এল.-এর ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪০-এ 'রাঢ়ি কুড়মালি' বা প্রাচীন রাঢ়ের লোকভাষা কুড়মালিকে 'রাঢ়ি বাংলা' বলে মন্তব্য করে কুড়মালি ভাষার অস্তিত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দেন। আর তাই দেখা যায়, ও.ডি.বি.এল.-এর (দুটি খন্ডে প্রকাশিত) আদ্যন্ত কোথাও 'কুড়মি' বা 'কুড়মালি' ভাষার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখমাত্র করা হয়নি। আর তাই যদিও গ্রিয়ারসন 'SOME' বাঙালি বলেছেন, কোন নামের উল্লেখ করেননি, তবুও বলতে বাধা নেই যে ওই 'SOME' বাঙালি ছিলেন ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জী। সত্যি কথা বলতে কি কুড়মালির উপভাষা- 'মানভুঁইআ কুড়মালি উপভাষা', 'ধলভুঁইআ কুড়মালি উপভাষা', 'মেদনিপুরিআ কুড়মালি উপভাষা' অর্থাৎ এককথায় এইসব 'রাঢ়ি কুড়মালি উপভাষা'গুলির ভাষাছাঁদ হল একইধরণের। যথা-ইঁড়্কিছে, রগ্দিল, উম্কিছে, পিদ্কিছে, ঢন্কিছে, ঘেঁঘাছে, কেঁসকিছে, পুচ্কিল, সঁড়্গিল প্রভৃতি শব্দগুলি মূলতঃ হল কুড়মালি শব্দ। শব্দগুলির সঙ্গে শুধু বাংলা ভাষার ইল, ইছি, ইবে প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'রাঢ়ি কুড়মালি উপভাষা'গুলির সৃষ্টি করেছে। আর তাই এদিক থেকে

বলতে গেলে উল্লিখিত কুড়মালি উপভাষাগুলিকে এককথায় 'বাংলা প্রত্যয় বিভক্তি সমন্বিত কুড়মালি উপভাষা' বলাই সমীচীন। অর্থাৎ এগুলিকে কিছুতেই বাংলা ভাষা বলা যায় না। কারণ এইসব শব্দের মধ্যে সংযুক্ত বাংলা প্রত্যয়গুলির পাতলা আবরণ টুকুকে খুলে ফেলে দিলেই কুড়মালি ভাষার হৃৎপিন্ডকে (মৌলিক শব্দভান্ডারকে) ধুক্‌ধুক্‌ করতে দেখা যায়। আমার মতে এইটিই হল কুড়মালি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের অনালোচিত একটি দিক।

কিন্তু সে যাইহোক 'গোলআরি' উপভাষার উদ্ভবের পরবর্তীকালীন ক্রমানুসারী উদ্ভূত কুড়মালি উপভাষাগুলির ভৌগোলিক ক্ষেত্রগুলি যথাক্রমে হল-মূলতঃ

১। ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত:-

* ছত্রিশগড়ি উপভাষা ক্ষেত্র: রেবা, কোরিয়া, সুরজপুর, বলরামপুর প্রভৃতি জেলা।

* সুরগুঁজিআ উপভাষা ক্ষেত্র : সুরগুঁজা, যশপুর, বিলাসপুর, রায়গড় প্রভৃতি জেলা (তথা ঔপনিবেশিককালীন 'বামরা' সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য)।

* হলবি উপভাষা ক্ষেত্র : বস্তার জেলা সহ পার্শ্ববর্তী কোন্ডাগাঁও, রাজগাঁও, কোড়গাঁও, দন্তবাড়া অঞ্চল (তথা ঔপনিবেশিকালীন বস্তার রাজ্য)।

২। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত :-

* সাদানি-সাদরিকোল উপভাষা ক্ষেত্র: ঝাড়খন্ড।

* নাগপুরিআ উপভাষা ক্ষেত্র: ঝাড়খন্ডের অন্তর্গত 'সাদানি', 'সাদরি-কোল', 'নাগপুরিআ' প্রভৃতি উপভাষা সংশ্লিষ্ট সম-মূলীয় ভৌগলিক ক্ষেত্র- গড়ুয়া, পালামৌ, চাতরা, ডাল্টনগঞ্জ, লাতেহার, রাঁচী, হাজারিবাগ, রামগড়, লোহারদাগা প্রভৃতি জেলা (একদা নাগবংশীয় রাজাদের 'নাগপুর' রাজ্য নামে সুপ্রতিষ্ঠিত)।

* পাঁচপরগনিআ উপভাষা ক্ষেত্র: বিশেষতঃ রাঁচী জেলার অন্তর্গত পাঁচটি পরগনা রাহে, বুণ্ডু, তামাড়, সোনাহাতু, খুঁটি প্রভৃতি।

* সিখরিআ উপভাষা ক্ষেত্র : সিখরভূম বা পাঁচেট (পঞ্চকোট) রাজ্যের অন্তর্গত সমগ্র বৃহত্তর মানভূম জেলা সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলা।

* ঠার কুড়মালি উপভাষা ক্ষেত্র : পূর্বোক্তি মানভূম জেলাসহ সরাইকেলা-খরসোঁয়া, ধলভূম, সিংভূম, চাইবাসা প্রভৃতি সুবিস্তৃত এলাকা। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য- কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)।

* ঔপনিবেশকালীন খঠ্ঠা বা খঠ্ঠাহি উপভাষা ক্ষেত্র: যা মূলতঃ হল- মানভূম

জেলা সহ রামগড়, রাঁচী, হাজারিবাগ প্রভৃতি সুবিস্তৃত এলাকা।

*** মাহাতালি কুড়মালি উপভাষা ক্ষেত্র :** উল্লিখিত সুবিস্তৃত ভূ-ভাগটি ছাড়াও যেহেতু কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা উড়িষ্যার বিভিন্ন এলাকাতে বসবাস স্থাপন করে আজও এইসব অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত চাষী হিসাবে ঘনভাবে রয়েছেন বলেই কুড়মালি ভাষাটিও প্রচলনে রয়ে গেছে এবং এই ভাষাটি সাধারণতঃ **'মাহাতালি ভাষা'** নামেই সুপরিচিত।

*** রাঢ়ি বোলি (তথাকথিত 'রাঢ়ি বাংলা' /ঝাড়খণ্ডী বাংলা) বা রাঢ়ি কুড়মালির উপভাষা ক্ষেত্র :** মানভূম, ধল ভূম, পশ্চিম বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা সহ পার্শ্ববর্তী সুবিস্তৃত পশ্চিম রাঢ়ভূমি।

৮। কুড়মালি লোকোক্তি বিধৃত কুড়মালির উপভাষা ভৌগোলিক পরিসীমা : বাস্তবিকপক্ষে বর্তমান ছত্রিশগড় ও ঝাড়খণ্ডের সুবিস্তৃত এলাকাসহ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী সুবিস্তৃত আরণ্যক অঞ্চলই হল কুড়মিদের বর্তমান বাসভূমি সহ কুড়মালির উপভাষা-ভৌগোলিক ক্ষেত্র।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বহুল প্রচলিত —

'সিখ-সিখর-নাগপুর
আধাআধি খড়গপুর।'
এবং
সিখ-সিখর-নাগপুর
আঠার পরগনা খড়গপুর।'

কুড়মালি লোকোক্তি দুটি থেকেও মূলতঃ কুড়মি জনগোষ্ঠীর বর্তমান অধিবাসভূমির সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি লোকভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাচীন ভৌগোলিক পরিসীমার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেও উপরোক্ত অঞ্চলগুলিরই সমর্থন পাওয়া যায়। যথা—

১। 'সিখভূম বা ময়ূরভঞ্জ রাজ্য টি হল উড়িষ্যার বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য।

২। 'সিখরভূম' সিখভূম রাজ্য'টি হল 'পাঞ্চেত' বা পঞ্চকোট রাজ্য।

৩। 'নাগভূম' বা 'নাগপুর রাজ্য' টি হল ছোটনাগপুরের প্রাচীন নাগরাজ্য।

৪। খড়গপুরে পশ্চিমস্থিত পশ্চিম মেদিনীপুরের ১৮টি পরগনা। যথা- বাঁকুড়া জেলার খাতড়া সাবডিভিশনের অন্তর্গত ভেলাইডিহা, ফুলকুসমা, রায়পুর, সুপুর, অম্বিকানগর, শিমলাপাল, কুইলাপাল, ছাতনা এই ৮টি পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম সাবডিভিশনের ঝাঁটিবনী, জামবনী, খালাড়, বলরামপুর, মল্লভূম, কল্যাণপুর, ভঞ্জভূঁই (শালবনী), ভাটভুঁই, রোহিনী, সারেঙ্গা এই ১০ টি পরগনা। সব মিলে ১৮ টি পরগনা।

উপরোক্ত চারটি ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যেই যে কুড়মিরা ব্রাত্যদেশীয় কালাবধি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী রূপে আজও ঘনভাবে বসবাস করে আসছেন সেকথাও হল অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইচ. এইচ. রিজলে তাঁর 'দি ট্রাইবস এন্ড কাস্টস অব বেঙ্গল'- 'এ্যাথনোগ্রাফিক গ্লোসারি', ভলিউম-১, পৃষ্ঠা-৫২৮-৫৩৭ তথা জি.এ. গ্রিয়ারসন তাঁর 'লিঙ্গুয়েস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' ভলিউম-৫, পার্ট-২, ১৪৫-১৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে কুড়মালি ভাষার প্রচলন ক্ষেত্রের যে ভৌগোলিক পরিসীমার কথা বলেছেন তার সঙ্গে প্রথমোক্ত কুড়মালির উপভাষা ভৌগোলিক ক্ষেত্র তথা দ্বিতীয়োক্ত কুড়মালি লোকোক্তি বিধৃত কুড়মিদের প্রাক্-পৌরাণিক বসবাস স্থাপন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমার বিশেষ কোন পার্থক্যই দেখা যায় না।

আবার প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাতিসত্ত্বার বিচারেও উপরোক্ত ছত্রিশগড়ের রেবা, কোরয়া, বলরামপুর, যশপুর, সুরগুঁজা, রায়গড়, বস্তার প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়খন্ডের গড়য়া, পালামৌ, চাতরা, ডাল্টনগঞ্জ, লোহারদাগা, লাতেহার, সিংভূম, ধলভূম, মানভূম, রাঁচী, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণাা প্রভৃতি সুবিস্তৃত ভূ-ভাগে বসবাসকারী টোটেমিক দ্রাবিড়ীয় কুড়মিরা মূলতঃ হলেন এক অভিন্ন।

আবার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর, সুন্দরগড় প্রভৃতি সুবিস্তৃত ভূ-ভাগে বসবাসকারী কুড়মিদেরও সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাতিসত্ত্বার সঙ্গে ছত্রিশগড় ও ঝাড়খন্ডের কুড়মিদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জাতিসত্ত্বার কোন পার্থক্যই দেখা যায় না।

পরিশেষে একথাও উল্লেখ্য যে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যাতে সার্বজনিক ক্ষেত্রে (স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, হাট-বাজার প্রভৃতি) বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় দায়ে পড়ে কথা বলতে বাধ্য হলেও কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের গ্রামীণ পরিবেশে, ঘরে-ক্ষেতে-খামারে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধার্মিক রীতি নীতি- পূজা-পার্বণ প্রভৃতির সর্বক্ষেত্রেই অনিবার্যতঃ কুড়মালি ভাষারই ব্যবহার করে থাকেন। আর তাই সম্পূর্ণ ছত্রিশগড় ও ঝাড়খন্ড প্রদেশসহ পশ্চিমবাংলা ও উড়িষ্যার উল্লিখিত কুড়মালি ভাষা-ভৌগোলিক পরিসীমার অন্তর্গত সুবৃহৎ ভূ-ভাগে যেহেতু কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সুপ্রাচীন কালাবধি শুধু যে বসবাস করেই আসছেন তাই

নয় এতদ্‌ঞ্চলের কৃষি অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি-সভ্যতারও **কেন্দ্রীয়** শক্তি রূপে আজও ক্রিয়াশীল রয়েছেন বলেই এই ভূ-ভাগটিকে যথাযথ**ভাবে** 'কুড়ম দেশ' বা 'কুড়মাঞ্চল' বলে অভিহিত করাই সমীচীন।

বলাবাহুল্য এই ভূ-ভাগটির ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং **কুড়মি** জনগোষ্ঠীটির নানান যুগীয় পরিচিতিমূলক তথাকথিত 'ব্রাত্য' নিম্নশ্রেণীভূক্ত হিন্দু (শূদ্র), রূপে পরিগণিত করা হলেও বিপরীতভাবে এঁদের মধ্যে 'অ-হিন্দু' বা 'অন-আর্য' জনজাতীয় সুলভ নৃবংশীয় দ্রাবিড়ীয় টোটেমিক কৃষিভিত্তিক জাতিসত্ত্বার বিদ্যমানতার বৈচিত্র্য বিদ্যমান। অথচ দেখা যায় প্রাগার্য -দ্রাবিড় গোষ্ঠীভূক্ত জনগোষ্ঠী হলেও বিপরীতভাবে এঁদের মাতৃভাষা দ্রাবিড়ীয় কুড়মালিকে বিশেষতঃ বাংলা ভাষার উপভাষারূপে কুক্ষিগত করার বৈচিত্র্যময় চিন্তাভাবনা আদির কারণেই গ্রিয়ারসনও যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, কুড়মিরা যেমন হলেন বিচিত্র মানুষ, তেমনি এঁদের বাসভূমিও হল বিচিত্র, এমনকি এঁদের ভাষাও হল তাই।



কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার সম্পর্ক সূত্রের সন্ধান

কিরীটি মাহাত

ভারতবর্ষের আদিম জাতি ও জনগোষ্ঠীগুলির অন্যতম হলো সাঁওতাল এবং কুড়মি। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতিরও এরাই ধারক এবং বাহক। উভয় জনসমুদায়েরই রয়েছে প্রায় অভিন্ন সামাজিক কাঠামো সমাজ শাসন পদ্ধতি, নিজস্ব ভাষা, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরা। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, সামগ্রিক অর্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে একে খেরোয়াড় সংস্কৃতি বলা হয়েছে। অথচ আজকের নৃতত্ত্বের বিচারে সাঁওতাল ও কুড়মি দুটি পৃথক জাতি বা জনগোষ্ঠী। আরও জানা যায় ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের আদিমতমকাল থেকে এরা এক জনপদ, একই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরম্পরা লালন পালনও করে আসছে। কিন্তু আজকের পন্ডিতি বিচারে সাঁওতাল ও কুড়মি দুটি পৃথক মানবগোষ্ঠী। ভিন্নতর জাতিসত্ত্বা, ভিন্ন এর সংস্কৃতি। সাঁওতালি ও কুড়মালি দুটি পৃথক পরিবারের ভাষা। এই নিবন্ধে, আমাদের বিচারে আমরা দেখে নেব এর সত্যাসত্য কতটুকু।

ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় তার সময়কাল

৮-১০ হাজার বছর প্রাচীন বলে দাবী করা হচ্ছে। প্রত্নবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ যাকে সিন্ধুঘাটি সভ্যতা বা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে চিহ্নিত ও অভিহীত করেছেন। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষকদের পক্ষ থেকেও দাবী উঠেছে কুড়মি ও সাঁওতাল জাতির মানুষ সরাসরি এই সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে নাকি যুক্ত ছিল। কোন লিখিত ইতিহাস, হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার অথবা সুস্পষ্ট প্রামান্য কোন লিখিত ইতিহাস, হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার অথবা সুস্পষ্ট প্রামান্য কোন নিদর্শন না থাকলেও উভয় জাতির oral tradition অর্থাৎ লোকপূরাণ কথা, ব্রতকথা, কারাম-বিনতি, মাহারাই, সোহরাই সহ নানা গীত, কথা,কাহিনী, প্রবাদ প্রবচন, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের স্মৃতি, শ্রুতি, স্মারক সূত্র ও চিহ্নগুলি সর্বোপরি ভাষা, বাক ও লিপি চিহ্নগুলিকে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকে উড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

বলা হয়ে থাকে কুড়মি ও সাঁওতাল জাতি বাচক দুটি বাচক দুটি শব্দই তুলনামূলক নিতান্তই অর্বাচিন। প্রাগ-ঐতিহাসি কাল পর্বে সম্ভবত এরা খেরোয়াড় জাতি হিসেবেই পরিচিত ও অভিহীত হতো। একই খেরোয়াড় জাতিসত্ত্বার অন্তর্ভূক্ত ছিল। যদিও সাম্প্রতিক নৃতত্বের বিচারে সাঁওতাল জাতিকে অস্ট্রোএশিয়াটিক গোষ্ঠী রূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। আবার কুড়মি জাতির বিষয়ে নৃ-বিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন মতে বিভক্ত। একদল বলছেন কুড়মি দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতি, কারও কারও মতে ভূমিজ সাঁওতাল বা অস্ট্রিক শাখার সঙ্গে এদের কোনও তফাৎ নাই আবার কেউ কেউ সরাসরি দাবী করেন এরা ইন্দো-ইউরোপিয়ান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

সমাজ বিজ্ঞানীও নৃবিজ্ঞানীদের মতামত যাই হোক উভয় গোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও পরম্পরা সূত্র এবং লোকপুরাণ কথাকে ভিত্তি করে পন্ডিত মঙ্গল চন্দ্র সরেনের "সাঁওতালি জমসিম বিনতি" গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তা অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। গ্রন্থে বলা হয়েছে—"সেদাই মিত হড়ে বার এরালেন। আদ বুড়কি হপন বার হড়, ছুটকি হপন দ মড়ে হড়। বুড়কি হপনকে কুড়মি আর মুনডা, আর ছুটকি হপনগে হড়, মাহালে, কড়া দেশোয়ালি, বীরহড়। উনকো বাতমিৎ ঠেনগেকো তাঁহে কানা, মিত ঠেনগেকো বঁগা আ।" অর্থাৎ আদিমকালে একব্যক্তির দুইটি স্ত্রী ছিল। বড় স্ত্রীর দুই ছেলে এবং ছোট স্ত্রীর পাঁচ ছেলে। বড় স্ত্রীর ছেলে হলো কুড়মি আর মুন্ডা এবং ছোট স্ত্রীর ছেলেরা হলো সাঁওতাল, মাহালি, কড়া, দেশোয়ালি, বীরহড়। সেই সময় এরা জোটবদ্ধ ভাবে বসবাস করত এবং একই সাথে ধর্ম পালন করত।" কুড়মালি প্রবাদেও স্বীকার করা হয়েছে—"সাঁওতাল কুড়মি মসিঅত ভাই।" অর্থাৎ সাঁওতাল ও কুড়মি জাতি হলো

পরস্পর মাসতুতো ভাই। তাই আজও সাঁওতালরা কুড়মিদের বড় ভাই হিসেবে এবং কুড়মিরা সাঁওতালদের ছোট ভাই হিসেবে সম্মান দিয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ বা কোন উচ্চবর্ণ নয় একমাত্র কুড়মি ঘরেই সাঁওতালরা নির্দ্বিধায় অন্ন গ্রহণ করে থাকে। জনম, মৃত্যু, বিবাহ সংস্কার উভয়ের প্রায় একই। ধর্ম ও সাংস্কৃতির আচার, অনুষ্টান, রীতি বিশ্বাস এবং নৃত্য ও গীতেও রয়েছে প্রায় সার্বিক মিল।

অতীত ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পন্ডিত কালোয়াম হাড়াম কথিত এবং Skrafsrud লিখিত— "হড় কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা" গ্রন্থেও বলা হয়েছে "চাম্পা ধাবিচ আলে আর মুন্ডাকো, বিরহড়কো, কুঁড়বিকো অ্যামান তেন কো কারওয়ার ঞুতুম তেলে বিকাউঃ ক কান তাঁহে কানা। অর্থাৎ চাম্পা দেশ পর্যন্ত আমরা এবং মুন্ডারা, বিরহড়রা, কুড়মিরা এবং আরো অনেকেই খারওয়ার নামে অভিহীত হতাম।" সুতরাং খারওয়াড় শব্দটি উভয় জাতির ক্ষেত্রেই বিশেষ তাৎপর্যপূণ ও গুরুত্বের দাবী রাখে। আর এই চাম্পা দিশম বলতে অধিকাংশ পন্ডিত সিন্ধু উপত্যাককেই চিহ্নিত করেছেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় কুড়মালি প্রাচীন প্রচলিত করম ও বাঁদনা গীত বিনতিতে ও সিন্ধু হড়প্পা সভ্যতার বিস্তৃত অঞ্চলের উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে। এই সিন্ধু সভ্যতা ছিল একটি উন্নত কৃষি ও কৃষি বাণিজ্য কেন্দ্রীক সভ্যতা। কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষা সংস্কৃতির গবেষকগণ মনে করেন এই কৃষি সভ্যতা ছিল খারওয়ার বা খেরওয়াড় জাতির মহান অবদান।

অবশ্য এই খেরোয়াল বা খেরওয়াড় শব্দটির বুৎপত্তি ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পন্ডিতদের মধ্যে বহু মত ও বিভ্রান্তি রয়েছে। আমার অনুমান মূল খের বা খেড় শব্দটি থেকেই খেবওয়াড় শব্দটির উৎপত্তি। খেরো, খের ও হড় এই দুটি শব্দের সম্মিলনে খেরওয়াড় শব্দটি গঠিত। "খেড়" শব্দটির অর্থ তাৎপর্য শষ্য বা ধানের সঙ্গেই সরাসরি সম্পর্কিত। তাই খেরহড় বা খেরওয়াড় শব্দের অর্থ হয় কৃষক অথবা শষ্য বা ধান্য উৎপাদনকারী মানুষ হওয়ায় যুক্তিসঙ্গত। কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে শব্দটির ব্যাপ্তি এমনি। নৃ-বিজ্ঞানীগণ বলেন নবপোলিও যুগে এতদ্অঞ্চলেই মানুষ ভূমিকর্ষণ ও কৃষির আবিষ্কার করেছিল। আমার মতে কুড়মিদের জাওয়া করম (Germination), রহিন ও হারপুইনহা আচার ও উৎসব এই ঘটনার সঙ্গেই সম্পর্কীত ও স্মৃতি বহন করে চলেছে। এছাড়াও সহরই বাঁদনা, টুসু, রহিন, জিহুড় ইত্যাদি কৃষি অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলি একমাত্র খেরওয়াড় জাতির মানুযেরাই আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকে। এইগুলি হলো খেরওয়াড় সংস্কৃতি জাতি সত্ত্বারই অনন্য নিদর্শন। Cultural Enthropology এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথা বলা যায়।

সিন্ধু থেকে সুমেরের নদী উপত্যকা অঞ্চলেই যে, কোনো এক সময়ে প্রকৃতিকে অতিক্রম করে মানুষের প্রথম উৎপাদনী আবিষ্কার কৃষি সূচনা ঘটেছিল লুইস হেনরি

মর্গান তাঁর "এনসিয়েন্ট সোসাইটি" গ্রন্থে সংস্কৃতির স্রষ্টা এবং ধারক বাহক কারা তা রহস্যে ঢাকা, ইতিহাসও এখানে নীরব এই কথা বলেছেন জোনাথন মার্ক কেনোয়ার। আবার পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে দমিল বা দ্রাবিড় জাতির মানুষেরাই এই অসামান্য ও যুগান্তকারী কৃতিত্বের অধিকারী। হয়ত এই কারণেই আমরা দেখি অসুর, রাক্ষস, পনি, খেরওয়াড়, ক্রিবি, বঙ্গৃদ, অহি আদি জনগোষ্ঠীর মানুষদের সরব উপস্থিতি সভ্যতা বিকাশের ঠিক এই সময় কালটিতেই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও পাওয়া যায় এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাঁর কথায়—"বাবিরুষ অধিকার করেন কাশিয়গণ। তাঁহাদিগের সর্বপ্রাচীন দেবতার নাম সূর্যস, পবন দেবতা, মরুওস ইহারা আপনাদিগকে "খারি" নামে অভিহীত করিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে 'খারি' কি খেরওয়াল শব্দেরই প্রত্ন বাক বা আদিরূপ? লক্ষ্যনীয় বিষয় মূল ধাতুরুপ "খের" বা "খেড়" শব্দের সঙ্গে "খারি" শব্দটির ভাষাতাত্বিক তফাৎ সামান্য,। 'খের' বা 'খেড়' শব্দের সঙ্গে 'হড়' (মানুষ) শব্দটির সম্মিলনে খেরওয়াল বা খেরওয়াড় শব্দটি গঠিত যার অর্থ হয় শষ্য বা ধান্য উৎপাদনকারী কৃষক বা মানবগোষ্ঠী। "কাশিঅ" শব্দটি কছুঅ বা কাছিঅ শব্দেরও বিকৃতরুপ হতে পারে। টোটেম বিশ্বাস অনুযায়ী যার অর্থ হতে পারে কাছিম গোত্রভূক্ত মানুষ। তাই দেখা যায় এই খেরওয়াড় সমাজে সিংবোঙা বা প্রধান দেবতায় হলেন সূর্য। তিনি নানা নামে নানা অভিধায় পূজিত। খেরওয়াড়দের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজও তাই হড়, হ, হো, হাড়ি, হোরো বা হোরোকো, হো আদি নামে কথিত বা পরিচিত এবং প্রত্যেকটি জনজাতির অন্যতম টোটেম হলো কাছিম। সৃষ্টিতত্ব কথা তথা পূরান কথার যুগ থেকে কাছিম এদের উপাস্য এবং অন্যতম প্রধান দেবতা। এরা আজও কাছিম হত্যা করে না বা খায় না। এই খেরোয়াড়দের অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠীটিই হলো কুড়মি (কুরু/কুড়ম শব্দ জাত?) যারা আজও ভারতবর্ষের প্রধান কৃষিজীবি সম্প্রদায়।

সম্ভবত এরাই অতীতে কোনো একদিন মানব সভ্যতায় কৃষির আবিষ্কার ও সূচনা করেছিল। জাওয়া করম (Germination) উৎসব হলো সেই ঘটনারি স্মৃতি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী এ.এল.বশম গৌরবময় স্তুতি করে বলছেন, "প্রাক-আর্য যুগে এ দেশে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋণি। ঐতরেয় আরণ্যক স্বীকার করা হয়েছে অনার্যরা পৃথিবীর সন্তান এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে আর্যরা কৃষিকাজ জানত না। লাঙ্গল অশুদ্ধ তাই উচ্চবর্ণের লোকেদের তা স্পর্শ করা উচিত নয় বলেও মনুর নির্দেশ ছিল। আবার এই ভূমিকর্ষণ বা কৃষি ছিল মানুষের কৃষ্টিরও বুনিয়াদ। আশ্চর্যের বিষয় কৃষি বা Cult

শব্দটি এবং ধান্য অর্থে ব্রীহি শব্দটির একটি বিশ্বজনীন রুপ দেখা যায়। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি গ্রন্থে বলা হয়েছে কুল্য শব্দের মূল "কুল" বা লেটিনে Colo অর্থে কর্ষণ বা চাষ করা বোঝায়। কুল শব্দটি কৃষ্টি অর্থে সমস্ত কৃষকের দল বোঝাত। কোল, কুলুম্বি, কুরুম্বি বা কুড়মি শব্দের খুবই কাছাকাছি। আরও লক্ষ্য করার বিষয় দ্রাবিড় ভাষা অনুসারে কুড্ডু বা 'কুরু' মানে চাল এবং কুড্ডু অর্থে ধানও হয়। According to the Anthropological Survey of India the term Kunbi is derived from 'Kun' and 'bi' meaning people and seeds respectively. কুড়মালি জাওয়া গীতে উল্লেখ ও উপস্থিতি রয়েছে ব্রীহি শব্দটির—

ইতিইতি জাওয়া কিআ কিআ জাউআ
জাওয়া জাউলঁ মঞ ধান বিরুআ।"

অথবা

"কিআ সুতাঞ গাঁথব বিরিন ফুলা না।"

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (৩য়) গ্রন্থে বলা হয়েছে—" পশ্চিম এশিয়ায় বিভিন্ন ভাষায় Birinj, Vrize, Brinj প্রভৃতি রুপ ধারণ করে।

গ্রীস—aruza
ইং—Rice
ফরাসী—Riz
জামনী—Reis

আদি খেরওয়াড় ভাষার এই ব্রীহি শব্দের বিশ্বজনীন বিস্তৃতি, বিকৃতি,বিবর্তন সত্যিই অভিনব ও চমকপ্রদ বইকি।

হয়তো এই জন্যই সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম ছিল ব্রীহিয়া। আরও আশ্চর্যের বিষয় নিউজিল্যান্ডের আদিম জনজাতি 'মাওরি'দের প্রধান খাদ্য চাল তারা বলে 'আরি'। আজও কুড়মালি ভাষায় চালকে বলা হয় আরুয়া। আসলে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বিশেষ ভাবেই লক্ষ্যনীয় বিষয় অতিপ্রাচীনকালেই কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার একটি বিশ্বজনীন উপস্থিতি ও বিস্তৃতি রুপ পরিলক্ষিত হয়। কম্বোডিয়ার মনখমের ভাষা এবং মুন্ডারী ভাষা একই গোষ্ঠীর বলে পন্ডিতগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভিয়েতনামের ভাষায় হো শব্দের অর্থ এবং কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষায় হড় বা হো শব্দের অর্থ একই অর্থাৎ মানুষ।

তাই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার নদী, পাহাড়, স্থান, নামের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও আজও থেকে গেছে। কুড়মালি, সাঁওতালি গীতে কান্দাহারি, আমুদরিয়া, সিরদরিয়া, কুড়ুমপাহাড়, কুড়ুমনদী, সিন্ধু, হারাতা পাহাড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দভান্ডারের বীজ আজও এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। T.K. Rapas তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "এই আরারাত পাহাড়ের আশেপাশে "উরআরতু" নামে এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। "উর-আরতু" শব্দের অর্থ পাহাড়ের দেশ। "উর-আরতু" ভাষার সঙ্গে সুমেরিআন ভাষার সাদৃশ্য থেকে জানা যায় এটি অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত।" দ্রাবিড় ভাষা অনুসারে "উরু" শব্দের অর্থ হয় গ্রাম, বসতি, আধার, আবাস। আবার অস্ট্রিক ভাষা অনুসারে আরতু বা আতু শব্দের অর্থও হয় গ্রাম। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় একটি শব্দে দুই ভাষা সংস্কৃত ভাষার আদি ব্যাকরণ অষ্ট্যাধায়ীর লেখক পাণিনির জন্ম গান্ধারের 'শালাতুর" গ্রামে। শব্দটি শাল ও আতু দুটি শব্দের সংযোগে সৃষ্টি তা অনুমান করা যায়। লক্ষ্যনীয় দুটি শব্দেই প্রথম অংশ দ্রাবিড় ও শেষাংশ অস্ট্রিক।

সম্ভবত এই খেরওয়াড়রাই হলেন ঋগ্বেদে উল্লিখিত ব্রীচিবান অর্থাৎ ব্রীহিবানেরা। ঋগ্বেদে ষষ্ঠমন্ডলে বলা হয়েছে, ইন্দ্র হরিযুপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বৃচীবানের বংশধরদের তিনি বধ করেন। ভাষাতত্ত্বের নিয়মেই 'চ' বা 'ছ' বর্ণ 'হ' বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। তাই বরশিখ পুত্র বৃচীবানেরা যে শিবপুত্র ব্রীহিবান বা ধান্য উৎপাদনকারী কৃষকদের বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট। কারণ তারাই ব্রীহিবান এবং শিখ বা শিবের পুত্র। কুড়মালি ভাষার বেরহন, বীচ, বিহন, বিরিন শব্দগুলিব্রীহি শব্দেরই বিকৃত রুপ মাত্র। সিন্ধু বা মেলুহ দেশের অধিবাসী বলেই এরা আজও মেলুহ বা ম্লেচ্ছ। রাশিয়ান ঐতিহাসিক গ্রিগোরি বেনগার্দ লেভিনের মতে 'অনার্য উপজাতিরাই ব্রীচিবান বা ব্রীহিবানরাই হলো ম্লেচ্ছ। ঋগ্বেদ অনুসারে এরাই দনু পুত্র, বৃত্রাসুর, অহি, ক্রিবি, শম্বর,বঙ্গৃদ আদি জনগোষ্ঠীর মানুষজন। লোক পরম্পরা অনুসারে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের পর এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়।

তাই এঁকই খেরওয়াড় জনগোষ্ঠীর মানুষ হলেও এরা আজ পন্ডিতদের বিচারে কেউ অস্ট্রিক কেউ বা দ্রাবিড়। কিন্তু উভয় জাতির ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা সুত্রে বলা হয়েছে তারা হলো এক বাপের দুই স্ত্রীর দুই ছেলে। কুড়মালি প্রবাদের ভাষায় সাঁওতাল কুড়মি মসিঅত ভাই। কুড়মি বড়ভাই, সাঁওতাল ছোট ভাই। আজও উভয় জাতির এই রক্তসম্পর্ক ভাষা বিজ্ঞানীদের এই বিভাজন কতখানি সত্য তা আজ প্রশ্নের মুখে। সিন্ধুর ভাষা কি ছিল তা আজও অনাবিষ্কৃত। তা আবিষ্কৃত হলে ভারতীয় আদিম ভাষাটির মৌলিক স্বরূপটি কি ছিল তা জানা যাবে। কিন্তু এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় ও একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন যে অধ্যাপক জোনাথন মার্ক কেনোয়ার এর কথায় "সিন্ধু ও বালুচিস্থানে

আজকের দিনে মুন্ডারি ও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় স্থান ও নদীর নাম পাওয়া যায়।" আমার 'সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি" গ্রন্থে আমি দেখিয়েছি সিন্ধু সভ্যতার পীঠস্থানগুলির আদিম নামগুলি কেবলমাত্র কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও অর্থ তাৎপর্যেহ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বোধ হয় দুটি উদাহরণেই এই বিষয়টিকে পরিস্ফুট করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। যেমন পূর্বেই বলেছি সংস্কৃত ভাষার প্রবক্তা পুরুষ পাণিনির জন্ম স্থানটিই হলো সাঁওতালি ভাষার। শালাতুর গ্রাম নামটি যে শাল বৃক্ষের গ্রাম অর্থ প্রকাশ করে তার নিদর্শন এই অঞ্চলেও রয়েছে। বাঘমুন্ডি ব্লকের আজও একটি গ্রাম হলো 'সারজুমাতু বা সারজমআতু"। আর ভারতবর্ষের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির পীঠস্থান ও তক্ষশীলার আদিনাম হলো যথাক্রমে—ভিড়টিপি, সিরকাপ এবং সারইকলা। তিনটিই কুড়মালি এবং সাঁওতালি নাম। ভিড়, টিপি, সিরকা, সারই,কলা সবই। কুঁড়া,কঁড়ি,কলি,কলা, কুঁড়ি একই শব্দেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। পাঞ্জাবি ভাষাতে আজও কুঁড়ি বা কুড়ি শব্দ রয়েছে যার অর্থ ছোট। এইভাবে প্রাচীন কাল থেকেই সিন্ধু ধ্বংসের পর খেরওয়াড় ভাষাগুলি আজকের শত শত ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সিন্ধু ধ্বংসের পর আত্মরক্ষার্থে এরা পূর্বে মধ্য ভারতের পাহাড় জঙ্গালাকীর্ণ ঝারিখন্ড অঞ্চলে দলে দলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই এদের ভাষা ও সাংস্কৃতির আদিম রূপটি আজও অবিকৃতভাবে টিকে থাকতে পেরেছে। কিন্তু এর ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় সংশ্লেষণ ও সংমিশ্রনের রূপটি ক্রমান্বয়ে ধরা পড়ে ঋগ্বেদ থেকেই। পন্ডিতগণ স্বীকার করেছেন ঋগ্বেদে প্রচুর দ্রাবিড় শব্দের উপস্থিতি এমনকি সংস্কৃত ভাষায় অস্ট্রিক শব্দের উপস্থিতি ৪০০ (চার) শতাধিক বলেও দাবী করা হয়। এবং এই কথা তো আমরা সকলেই জানি যে ভারতবর্ষের একমাত্র কোল, হো এবং সংস্কৃত ভাষাতেই বচন রয়েছে তিনটি। একজন কুড়মালি ভাষাবিদ মনে করেন কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার উপাদানগত সম্মিলনেই সংস্কৃত ভাষা গঠিত হয়েছে। তবে এই বিষয়ে নিবিড় ও প্রামান্য গবেষণা আরও প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সংস্কৃত ভাষা গঠনে দ্রাবিড় উপাদান প্রসঙ্গে ডঃ সুহৃদ ভৌমিক বলছেন—"কোনো কোনো ভারততত্ত্ববিদ মনে করেন সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ সমূহ দ্রাবিড়দের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। অনেকে তামিল গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাকে 'Proto-Sanskrit' বা প্রত্ন বলতে আপত্তি করেন না। অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দ স্বরান্ত অক্ষর বা Open syllabic দিয়া। শব্দের সমাপ্তি আনয়নের জন্য নাসিক্য 'ম্' অথবা 'ন' এর ব্যবহার। যেমন মন্ডপ > মন্ডপম্, বিশাখাপত্তনম, মহাবলীপুরম্, রাধাকৃষ্ণণ ইত্যাদি। সংস্কৃত উচ্চারণ রীতির ইহায় প্রাথমিক লক্ষন।" এই ভাষা রীতিটি কেবল দ্রাবিড় বা সংস্কৃত ভাষাতেই নির্দিষ্ট নয়। এর একটি বিশ্বজনীন রূপ পরিলক্ষিত হয়

এবং আমার মনে হয়েছে আদিবাক্‌রূপ কুড়মালি 'ওম্' এবং সাঁওতালি 'ইঞ' তত্ত্বই এখানে স্বরূপে বর্তমান। মানুষ, জীবজন্তু বা সকল প্রাণীর জীবনচেতনার প্রাথমিক স্তর হলো আমি বা আমি সত্ত্বা। সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলা হয়েছে ইঞ। সংস্কৃতে 'অহম্', ইংরেজীতে I (আই), কুড়মালিতে 'ম্'। সত্তার দুটি রূপ। একটি ব্যক্তি আমি এবং অপরটি ব্যাপ্তরূপে বিশ্বজনীন আমি। আমার মনে হয়েছে ব্যাক্তি আমি হলো "ইঞ" এবং বিশ্বজনীন যে আমি তা হলো "ওম" (ব্রহ্মণ/ Supersonic)। জানা যায় প্রাচীন চীন দেশেও চেতনার দ্বৈতসত্বা হলো Yang আর Yin। 'ওম্' শব্দের স্বরূপটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— "Aum is the holiest word in our religion.... It is considered to be the Primivel sound of nature. The hymn of the universe." পরমহংস যোগানন্দ বলছেন, "ওম্ হলো তিব্বতীদের পবিত্র 'হম্', মুসলিমদের 'আমিন', এবং মিশরীয়, গ্রীক, রোমক, ইহুদি, খৃষ্ঠানদের আমেন। পৃথিবীর মহৎ ধর্মীয় মতবাদগুলিতে বলা হয়েছে যে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় "ওম্" বা আমেনরূপী মহাজাগতিক কম্পন শক্তি থেকে যা হলো শব্দ (Word) বা পবিত্র আত্মা Holyghost"।

এই 'ওম্' শব্দ সংস্কৃত বা আর্য সংস্কৃতি জাত নয়। এর উৎস হলো তন্ত্র, শিব বা কুড়মালি সংস্কৃতি। এই শিব ও শৈব ধর্ম ও সংস্কৃতি একসময় মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পন্ডিতদের মতেই এই অঞ্চলের সর্বত্র লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। এইজন্য আজও মক্কাকে শৈব সাধুরা শিবস্থান মনে করেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় প্রাচীন অহুর বা অসুর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এই অঞ্চলেই ইউফ্রেটিস বা সিরদরিয়া নদীর পূর্বকূলে। সম্ভবত তাই প্রাচীন মিশরের শব্দগুলি "হর" শব্দেরই রূপ ও কাল ভেদ মাত্র। এশিয়া-ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ভাষায় আজও অল, আল, আন, বান, হর, আর বিভক্তি ও প্রত্যয়ান্ত রূপটি দেখা যায়। 'ইঞ' এবং 'ওম্' বিভক্তির প্রয়োগ এবং নাসিক্য ভবনের এই বিশ্বজনীন প্রবণতা খেরওয়াড় ভাষা অর্থাৎ কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষারেই অবদান। কয়েকটি উদাহরণ—

সংস্কৃত-১। শুঙ্কং ভূতানাং শোযণ হেতুং এতন্নামকং অসুরং।

২। আপতিতম্ সুখম্ সেব্যম।

অশোকের শিলা লিপি—দেবান পিয়েন পিয়দসিন।

খারবেল অনুশাসন—৩। অইরেন মহারাজেন মহামেয় বাইনেন চেদিরাজ বঁশ বঘনেন প্রঘাখসু তনখনেন।

ইংরেজি: — ৪। He is coming. Ram is going.

কুড়মালি: — ৫। ঠঁপা ঠঁপা চাঁপা ফুলেঁ খঁপউআ সাজাইকে
মঞ রেঁগঁ ভুঁইএঁ কঁহেঁ কঁহেঁ তঁইঞে। (অনন্ত)

সাঁওতালি :- ৬। ইঞ জামাঞ/ আমি খাই/খাব
আম জমাম- তুমি খাও/খাবে।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পরম্পরায় নাসিক্যভবন বা আনুনাসিকের আরোপ করা হয় ভূত, প্রেত, অসুর, রাক্ষস, দত্যি, দানব আদি চরিত্রের বাক রূপ ও ভাষার ক্ষেত্রে। এদেরই অপর নাম খেরওয়াড়। এই খেরওয়াড়দেরই প্রতিনিধি স্থানীয় দুটি ভাষা হলো কুড়মালি এবং সাঁওতালি। সম্ভবত ঋগ্বেদে এই ভাষা সম্বন্ধেয় কটাক্ষ করে বলা হয়েছে— "ভারতবর্ষের প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের অধিবাসীর পরিচয়" গ্রন্থে বিশিষ্ট গবেষক ননীমাধব চৌধূরী উক্তিতে— "ঋগ্বেদ ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হইতেছে না। কটাক্ষ করা হইয়াছে এইরূপ দুইটি কথা পাওয়া যায়। যথা—বধ্রিবাচ ও মৃধ্রবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে শত্রুভাবাপন্ন বা অসম্পূর্ণ রূপে উচ্চারিত ভাষাভাষী of hostile or imperfect speech এবং বধ্রিবাচ পদের অর্থ করা হইয়াছে বৃথা ভাষাভাষী of vain speech."

এই কটুক্তি যে ভারতের মূলবাসী মানুষদের ভাষাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং সম্ভবত সেই ভাষাটি হলো সিন্ধুর ভাষা। তবে সে ভাষা কতগুলি গোষ্ঠী/জাতি ভাষায় বিভক্ত ছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। ওল্ড টেস্টামেন্টের মতে সমগ্র মানব জাতির ভাষা ছিল একটিই। বাবিলেই সে ভাষা বিভক্ত হয়। সিন্ধু বা ঋগ্বৈদিক যুগে সে ভাষা কতভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তা গবেষণার বিষয় তবে কিছু কিছু ভাষা যে জাতি ভিত্তিক বা জাতিবাচিক অভিধা পেয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমান পাওয়া যায়। কারণ অব্যবহীত পরবর্তী কালের রচনা ভরতের নাট্য শাস্ত্র অনুসারে "দেশ প্রয়োগ অনুসারে ভাষা চতুর্বিধ-অতিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা এবং জাত্যন্তরী ভাষা। জাতি এবং জাত্যন্তরী ভাষায় ম্লেচ্ছ শব্দাদির মিশ্রণ ছিল। এটি ছিল ভারতের প্রচলিত ভাষা।" (নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত চিন্তা /ডঃ রাজ্যেশ্বর মিত্র)

উক্তিটিতে দুটি কথা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এক জাতিও জাত্যন্তরী ভাষায় ম্লেচ্ছ শব্দাদির মিশ্রণ, দুই এটিছিল ভারতের প্রচলিত ভাষা। এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতবর্ষে জাতি ভাষাগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ভাষা হল কুড়মালি এবং সাঁওতালি। এই ভাষা গুলির সঙ্গে ম্লেচ্ছ ভাষার সম্পর্ক মানে 'মেলুহ' ভাষার বা সিন্ধুর ভাষার সম্পর্কের সূত্রটিকেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে এবং যে কথা কুড়মালি ও সাঁওতালি পন্ডিতগণ দীর্ঘদিন দাবী করে আসছেন। এই ভাষা সম্পর্কে নাট্য শাস্ত্রে আবার বলা হচ্ছে যে এটি ছিল ভারতের প্রচলিত ভাষা। প্রচলিত অর্থে মূলবাসী বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ এই ভাষায় ছিল সাধারণের ভাষা বা দেশ ভাষা। ভারতের সমকালের ভাষাটিকে তাই বলা হয়েছে প্রাকৃত অর্থাৎ original, natural, artless, normal, ordinary, usual অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে জাত। বিপরীতে সংস্কৃতকে বলা হয়েছে—"Sanskrit is not a natural language but an artificial language"।

সিন্ধুর ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকেই সংস্কৃত, কুড়মালি এবং সাঁওতালি ভাষাকে আমরা খতিয়ে দেখতে পারি। সিন্ধুর ভাষার অন্যতম গবেষক আই.মহাদেবনের দাবী অনুসারে সিন্ধুর অধিবাসীগণ নিজেদের "মিল-এচ্" বলে পরিচয় দিত এবং তিনি নাকি সিন্ধু লিপির দুটি সিলমোহরের মধ্যে এই শব্দ পেয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে ভাষাতত্ত্বের আধারেই 'চ' বা 'ছ' বর্ণের রূপান্তর 'হ' বর্ণে হয়ে থাকে। এই ভাষা রীতিটি অর্থাৎ 'চ' একটি কর্তা উহ্য অব্যয় হিসেবে সিন্ধুর ভাষা থেকে সংস্কৃত এবং কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষাতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার উদাহরণ দেওয়া হলো—

সংস্কৃত :- ১। অহ দুশ্চর লাঢ়ং অচারী বজ্জভূমিং চ সুব্বভূমিং চ। (আচারাঙ্গ সূক্ত)

২। সুখানি চ দুখানি চ চক্রবৎপরিবর্তন্তে।

৩। বোধিসত্ত্ব শুভেঃ সর্ব্বেজগৎ সুখিত মস্তু চ।

৪। "দ্বি বিধা জাতি ভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা
ম্লেচ্ছ দেশ প্রযুক্তা চ বর্বমাশ্রিতা।"

সাঁওতালি :-

১। ঞেল সামটাওএইচ্।

২। সাসা পাড়াওইচ্

৩। ইঞ রামচাঁদ আমিচ্ হপন আডি গেচঞ কাংলা।

কুড়মালি :-

মাড়চ্, লালচ্ (লাল্হা-'চ' বর্ণ 'হ' বর্ণে রূপান্তর)

থেপচ্, ঢেঁকচ্, ঢঁকচ্, লাইলছা, কাইলছা,মইলছা ইত্যাদি।

"হেঁকেচ্, পেঁকেচ্, কেঁকেচ কাঠ
তাকর উপর রাম ভাট।"

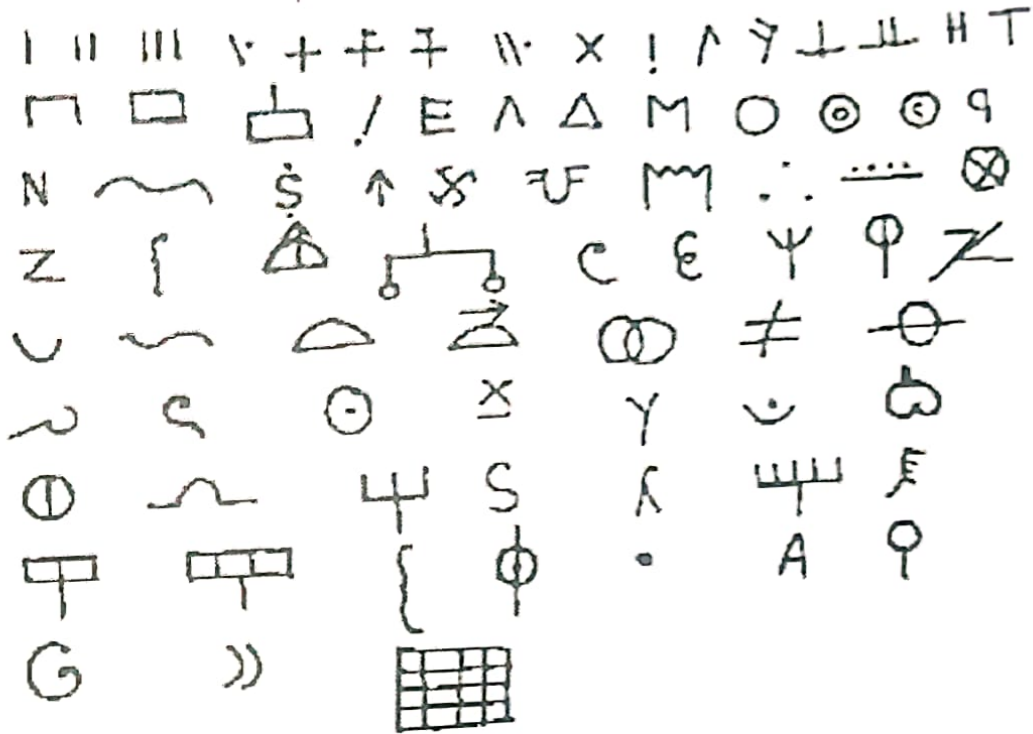
চাঁচর "বিনাহ ঠেঁগেকের হরিনা রে" পদে 'চ' বা 'ছ' এর পরিবর্তে 'হ' বর্ণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সিন্ধু সভ্যতার তাৎপর্যপূর্ণ দিক হোল তার লিপির ব্যবহার। বহু ভাষাবিদ ও পন্ডিতের অভিমত পরবর্তীকালের ব্রাহ্মীলিপি হলো সিন্ধুলিপিরই বিবর্তিত রূপ এবং পরবর্তীকালের বহু ভারতীয় লিপির জন্ম নাকি এই লিপি থেকেই হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলেও আজও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধাব কার সম্ভব হয়নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় সিন্ধু লিপি প্রায় অবিকৃতভাবে আজও ব্যবহার করে চলেছে কুড়মি ও সাঁওতাল জাতির মানুষ। কিছু লিপিগুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সাঁওতালি বঁশ দাগ বা লিপি



কুড়মালি বঁশ দাগ বা লিপি



স্বীকার করা ভাল লিপি সংগ্রহের কাজটি আজও অসম্পূর্ণ এবং এইলিপি গুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য কি তা আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। দুটি সম্প্রদায়ের মানুষজনই এইগুলিকে বঁশদাগ বা লিপি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আরও প্রকাশ থাকে এই বিষয়ে দৈনিক আদিবাসী বার্তা (সম্পাদক-মহাদেব হাঁসদা) এপ্রিল ১৯৯৪ সংখ্যায় মূল হিন্দীতে লিখিত নির্মল কুমার বর্মার প্রবন্ধ বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত হয় যার নাম "আমাদের ইতিহাসে কী পূনর্বিবেচিত হবে"। প্রবন্ধ থেকে জানা যায় লেখক সাঁওতালি লিপি দ্বারা সিন্ধুলিপি পাঠোদ্ধারের দাবী করেছেন এবং তাঁর এই দাবী তিনি ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ভারত ইতিহাস কংগ্রেসে পাঠ করেন। কুড়মালি ভাষাবিদ ও পন্ডিতদের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য মতামত দিয়েছেন ভাষাবিদ ডমন মাহাত মহাশয় এবং তার দাবী সিন্ধুর ভাষা ও লিপি হলো কুড়মালি।

সিন্ধুর ভাষা, লিপি এবং কুড়মালি, সাঁওতালি ভাষার তুলনামূলক অধ্যয়ন ও

গবেষণা আরও নিবিড়ভাবে হোক। উপরোক্ত আলোচনা দুটি জাতি ও দুটি ভাষার প্রায় ১০ হাজার বৎসরের সম্পর্ক ও ইতিহাসে এদের ঐক্য ও অভিন্ন সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। সাধারণ দৃষ্টিতেই দুটি ভাষার আরও কয়েকটি মৌলিক গঠন, চরিত্র, বৈশিষ্ট্যের দিক ও বিষয়ের উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১। শব্দভাণ্ডারের সমতা :-

কুড়মালি	সাঁওতালি
সঁপড়া	সাপড়াও
কুলা	কুলাউ
গিদর	গিদরী
আউসান	আওসান
নেউতা	নেওতা
চউহরা	চারহাও
রাউ	রড়
জিরা	জিরাউ
বাইসি	বাঁইসি
কমিআ	কাঁমি
খন	খন
খজ	খজ
উচার	উচাঁড়
থথি	থুতি
ডহর	ডাহার
বের	বের
পহিল	পাঁহিল

২। সাঁওতালি ভাষাতে যে কোন শব্দকে ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কুড়মালি ভাষাতে যে কোন শব্দকে না হলেও বিশেষ্যপদকে ক্রিয়াপদে পরিণত করা যায়। যেমন— হাঁথ > হাঁথড়া, গড় > গঁহড়ন, টেহনি > টেইহনান, পাথর > পাথরান ইত্যাদি।

৩। কুড়মালি ভাষার মতই 'কর' বা 'কের' বিভক্তির প্রয়োগ সাঁওতালি ভাষাতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন— পায়গর পানাহি অর্থাৎ পায়ের জুতা।

কুড়মালি—পায়েকর জুতা।
সাঁওতালিতে 'কর' শব্দ 'গর' রুপে উচ্চারিত হয়
অনুরুপ :- অতেগর, বাহাগর, সোনেগর, রুপেগর, ধুবিগর ইত্যাদি।
কুড়মালি :- বুইদগরিআ, হুলগরিয়া, পাইটগরিয়া, মাইনগর।
দক্ষিণ ভারতের কুড়ুম্বা ভাষাতেও 'কর' বা 'গর' বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। জিপসিদের ভাষাতেও তাই।

৩। কুড়মালিতে "লেঞ" এবং সাঁওতালিতে "লেনা" বিভক্তি রুপ।
কুড়মালি :- পুরুইলালে বই গিলিন কিনিলেই আনলেঞ।
সাঁওতালি :- অস্ট্রেলিয়ারে এটা থকরেন মানওয়াক সাঁও বাঁক সলম লটম লেনা।

৪। 'ঠিন' বা 'ঠেন' প্রত্যয়ের সাধারণ ব্যবহার।
কুড়মালি :- অহ ঠেন আহেইক। গুরুকঠেন জানি লিহিন।
সাঁওতালি :- অড়াঃক ঠেন-ঘরের দিকে। গুরুঠেন কুলি জংমে-গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা কর।

৫। কুড়মালিতে 'লে' এবং সাঁওতালিতে 'রে' প্রত্যয়ের রুপ।
কুড়মালি :- বনলে আনলাক।
সাঁওতালি :- বিররে।

৬। Intentional বা অভিপ্রায় মূলক প্রত্যয়গুলি দুটি ভাষাতেই একই।

কুড়মালি	**সাঁওতালি**
ত	দ
কেনে	কানা
লেখেন	লেকান

কুড়মালি :- অখরাই ত জাতা তঞ না জাই কেনে।
সাঁওতালি :- শায় সেরমা পুরাও দ মারাং কাথা দ বাং কানা।
কুড়মালি:- খাইএক পিএক মই নাই, বড় ঘারেক বহুক বড়ি জালা। মাছেক মাঞেক লেখেন পুতেক সক।
সাঁওতালি :- জত লেকান সেরেঞক, রাহাক, রু ক বাড়ায় কান তাঁহে কানা।

৭। Affermative and negative অর্থাৎ হ্যাঁ ও না সূচক ধ্বনী সমতা :-
সাঁওতালি— হৗই, হৌই, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওই, আঁ, এ্যাঁ, হ্যাঁক, অঁ, হঁ ক্, উঁ, হুঁ, ক্-না বাঙলা উহুঁ এর সমার্থক।
কুড়মালি :- হই, হউ, হেঁ, হিন, হিম, হঁ, হুঁ, অ, অহ,হাঁ হাঁ।
সাঁওতালি :- বাবা রে, এ্যা বাবা, বাবা গ, আয়ো (মা)

কুড়মালি :- বাপ রে, এ্যা বাপ, বাপ গ, এহে গ, মাঞ গ।
সাঁওতালি :- আহা হা, আহা, হাহা।
কুড়মালি :- আহা হা, এহেরে, হাঁহাঁ।
৮। পন্ডিত প্রবর লেভি পশিলুস্কির মতে—
খাঁখা, কুলিন্দ-পুলিন্দ, অঙ্গ-বঙ্গ,উড্র-পুন্ড্র, খোকা-খুকি এই সকল যমজ নামকরণ পদ্ধতিই অস্ট্রিক বা সাঁওতালির।
কুড়মালি শব্দ:- সাঁসাঁটে, সিগির-সিগির, হাঁহাঁইকারা, তিরিঁগরিগাঁ, ভভকাল, থেরেথেপে, টিরটিরাঞ, ফরফরাঞ, দরদরাঞ, মনমনাঞ, ফদফদাঞ, লদলদাঞ, গাসাগাসি, লহরচহর, গহরগদর ইত্যাদি।
৯। কুড়ি শব্দ ও কুড়ি পর্যন্ত গণনা রীতি এবং গন্ডা শব্দও গণনারীতি অস্ট্রিক বলে পন্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেন।
কুড়মালি ভাষাতেও গণনা রীতি কুড়ি পর্যন্তই এবং গন্ডা শব্দও গণনা পদ্ধতি কুড়মালি ভাষাতে রয়েছে।
১০। ক্রিয়াপদের সমতা :-
সাঁওতালি— আঁকতা, বিড়া, নেহর, ধিপা, বাছা, দাঁড়া, গাদা, চুসা, জগা, ফদড়া, গালমারা, লেবদা, সাপড়াও, থুতি।
কুড়মালি ভাষাতেও ক্রিয়াপদগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
১১। ভরতের নাট্য শাস্ত্রে সিন্ধুর ভাষা বৈশিষ্ট্যটির বিষয়ে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় যা কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার উচ্চারণরীতির সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।
নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—
"হিমবৎ সিন্ধু সৌবীরান যে হন্যে জনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
উ কার বহুলাং তেষু নিত্যং ভাষাৎ প্রয়োজ্যয়েৎ।।
অর্থাৎ হিমালয়, সিন্ধু ও সৌবির দেশে যে সকল লোক থাকে তাদের উ-কার বহুল ভাষা সর্বদা প্রযোজ্য।
কুড়মালি :- করতউ, খাতউ, যাতউ, লেগতউ, উভতউ ইত্যাদি।
সাঁওতালি :- গিদরৗ, পৗহিল, ঞিদৗ, তৗরিক, তালা ঞিদৗ, কুলৗউ ইত্যাদি।
১২। কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার সম্পর্ক সূত্রের সন্ধানে দুটি ভাষার কিছু মৌলিক চরিত্রগত তফাতের কথা অনেকে তুলবেন। যেমন সমস্ত কোল ভাষা, হো ও সাঁওতালি ভাষায় বচন তিনটি কিন্তু কুড়মালি ভাষার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ সাঁওতালি ভাষায় বচন তিনটি কিন্তু কুড়মালি ভাষায় বচন দুটি একবচন ও বহুবচন। ভারতীয়

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা ছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে যে ২০০টি ভাষা আছে তাদের সব কীর্তিতেই একই চরিত্র লক্ষিত হয়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সমস্ত ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার মধ্যে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই বচন তিনটি কেন? এটি যে ভারতের আদিম ও মূল ভাষার প্রভাবেরই পরিণতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মালয়ালম সহ ৩/৪ টি আদিবাসী ভাষাতেও তিনটি বচন বর্তমান রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা অনুমান করতেই পারি কুড়মালি একটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে এই ভাষাতেও হয়তো কখনো তিনটি বচন বর্তমান ছিল। দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর চরিত্র বৈশিষ্ঠ্য এদের ঐক্য ও আত্মীক সম্পর্কটিকেই প্রমাণিত করে।

১৪। বাংলা কাব্যের ছন্দরীতি গুলি যে লৌকিক ঐতিহ্য থেকে গৃহীত তা স্বীকার করেছেন বাংলার বহু বিশিষ্ট ছান্দসিকগণ হাজার বছর প্রাচীন চর্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান" পর্যন্ত ছন্দ রীতিটি যে লৌকিক ও সাঁওতালি ছন্দের কাছে ঋনী তা দেখিয়েছেন ডঃ নীলরতন সেন এবং ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক। বাস্তবতা হলো এই লৌকিক ছন্দরীতিটি কেবল সাঁওতালির নয় তা অবশ্যই কুড়মালিরও। সাঁওতালি গীতি কাব্যের বিপুল ভান্ডারের মত এই অঞ্চলে কুড়মালি লোককাব্যের ভান্ডারটিও বিপুল ও অসাধারন কাব্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সাঁওতালির ছন্দরীতিগুলির হুবহু উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি কুড়মালি লোক সাহিত্যের মধ্যেও। কয়েকটি উদাহরণ—

সাঁওতালি গিদরী বাউলি জাতীয় ছড়া ও ছন্দ :

<u>সাঁওতালি</u>

টিরমুঠি। সিরি জালা (৪+৪)
কানুরে । গোয়ালা (৪ । ২)
পুরুখাই । ডাহারীলি (৪+৪)
গাইয়া । জোয়ারে (৪ । ২)
পুরুবীহি । ডাহারীলি (৪+৪)
গাইয়া জো (৪)

<u>কুড়মালি</u>

এরাই । মেরাই
ঝিনুক । ঝেরাই
সাঁক । মাদইল
পঁড়কি । মাদইল

ঘিচউরা । মউরা
পাইখা । গেলাক
পাইখ । মারেলাই
পাইখ । না পাই
ভাইকে । মারেই
ভাই। গুড়গুড়
দলাই । চঘে
সুজ্‌জি । বরণ
বরণ । কি
কান । ধরন
ধরন।

মাদড়িয়ী তাল :-

বাংলা

বৃষ্টি পড়ে । টাপুর টুপুর । নদেয় এলো। বান
শিব ঠাকুরের । বিয়ে হবে। তিন কন্যা । দান

সাঁওতালি ছড়া

তেহেঞ পেড়া । তেহেন মেসে । তেহেঞ তোআ। দাকা
গাপা পেড়া। তাহেন মেসে। গাপা জেল। দাকা

কুড়মালি ঝুমইর

১। একবেরা । জনহাইর মাড়। আর এক বেরা । কুঁঢ়া
খাএক দসে। গ মর। জুআন মরদ । বুঢ়া
২। আঁখ বাড়িঞ। সিআর রাজা । বনেক রাজা। বাঘ
বিহা ঘারে। জেনি রাজা। অরাসরা । ভাগ

ভারতের সাঁওতাল ও কুড়মি উভয়ই ভারতের আদিম জনজাতি। এদের ভাষাও তাই। আদিবাসী বা খেরওয়াড় ভাষার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাই এই কয়েকটি মতামত বা এইটুকু আলোচনা শেষ কথা নয়। আলোচনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। ১০ হাজার বছর বা তারও প্রাচীন দুটি ভাষার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, ভাষাতত্ত্বের গঠন প্রক্রিয়া, এবং বিবর্তনের ধারাটির সঠিক মূল্যায়ন ও রেখাপাত সহজ সাধ্য নয়। এরজন্য আনুষঙ্গিক গভীর ও নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন। আরও যোগ্য ব্যক্তি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহন করবেন এই কামনা করি।

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস ও পতনের পর খেরওয়াড় সমাজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ঘনিয়ে আসে সভ্যতার সংকট। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানুষে মানুষে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যোগসূত্র। অবক্ষয় ও বিভেদ দেখা দেয় ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি তথা জাতির চেতনার সর্বস্তরে। আনুমানিক ১০ হাজার বছরের এই বিভেদ ও দূরত্ব প্রভাব ফেলেছে ভাষা ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে কিন্তু অস্তিত্বের ঐক্য ও যোগসূত্রকে আজও বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। সম্পর্ক ও সমন্বয়ের সেতু আজ আবার রচিত হোক দশ হাজার বছর পরে।

সহযোগি গ্রন্থ :-

১। সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ— রেভাঃ পল ও লাভ বোর্ডি।
(বাংলা অনুবাদ:- সুহৃদ কুমার ভৌমিক)।

২। সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত— পরিমল হেমব্রম।

৩। ভারতবর্ষের প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে অধিবাসীর পরিচিয়—ননীমাধব চৌধুরী।

৪। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫। সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে—পরিমল হেমব্রম।

৬। সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি— কিরীটি মাহাত।

৭। প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস— রমেশচন্দ্র দত্ত।

৮। আদিবাসী সমাজ ও পাল-পার্বন—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।

৯। এনসিয়েন্ট সোসাইটি—লুইস হেনরি মর্গান
(বাংলা অনুবাদ :- অসিত চৌধুরী, অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়)।

১০। সাঁওতালি ভাষার সহজ পাঠ—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, অনিমেষ কান্তি পাল।

১১। পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত— নিগুঢ়ানন্দ।

১২। সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপা ও সমস্যা— ডঃ অতুল সুর।

১৩। সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান—ক্ষুদিরাম দাশ।

১৪। ঝুমুর ও চর্যাপদ— কিরীটি মাহাত।

১৫। ভারত ইতিহাসের সন্ধানে—দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১৬। ভরত নাট্যশাস্ত্র—অনুবাদ: সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

১৭। ঋগ্বেদ সংহিতা— রমেশ চন্দ্র দত্ত।

সহযোগী ব্যাক্তি :-

গোমস্তাপ্রসাদ সরেন, শক্তিপদ বঁশরিআর, মহাদেব হাঁসদা।



আদিম কিরসি সইভতাক গনতি

সসাঁক সেখর মাহাত

কিরসি সইভতাকেই পিরথিমিক পহিল সইভতা কহা হেউএইক। হড়্প-পা্ সিনধু সইভতাকরউ আরেক নাম কিরসি সইভতা। সইভতাটা আরজঅনিখাক হাথেঁ ঢাহান হেলউ সভেকাই নেহি মরঅত বা বস হেউঅত। এখনউ নিখরালে ভারতেই কাঁহ না কাঁহ আহাত। গটা বছর কিরসিক আধারে জে লকগিলিনে এখনউ নেগ-নিতি পরব-তিহার করঅত তাখরাই অহ সইভতাক লক হেতা ইটাএঃ কনঅ দইসত নাএঃ। সেই নমুঁদ কুড়মি কুড়মালি গঠেক লকেক ঠিন আজউ বাঁচি আহেইক। নাম-অমুক, জাইত-কুড়মি, পেসা-চাস, দলিল-পঁড়চাএঃ এখনউ উখড়ি চলঅলাহেইক। কিরসিক উচরেইন পরব "করম"। পিঢ়িক পিঢ়ি বেটি ছউনারা পালি আউঅহত। ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পঁথিএঃ ৩২ পাতেঁ লেখঅল আহেইক - "মেয়েরা খাদ্য শস্য যোগাড় করতে করতে মস্ত বড়ো একটা আবিস্কার করে ফেললোঃ তারা লক্ষ্য করলো, শস্য বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায়। তখন তারা মাটিতে শস্য বীজ পুঁততে আরম্ভ করলো। এভাবে ধীরে ধীরে **সংগ্রহ বৃত্তি থেকেই উদ্ভব হলো কৃষিব**। এটা ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় ৯ হাজার বছর পূর্বে"। "করম" পরব জে কিরসি উচরেইন আধার সেটাএঃ আর কনঅ কহেক নাএঃ।

একর পইততে সহরই পরঅব। ইটাউ কিরসিক আধারেঁ। এহে সইভতাক লকেঁ সঁচলা, কিরসি কামে গটা বছর রউদ, সিঁত, জাড় কনে কনে সহঅলাহাত। কন কন সামান কামে লাগঅলাহেইক তাকরে পরব। ই কথা কহে জাইহ এহে কারনে, জে এহে পরবেক গিতগিলিনেই গনতি আহেইক। জে গিত গিলিন তখনে সিরজাই এখনউ গাহহত। পিঢ়িক-পিঢ়ি চলি আউএহেইক।

বিহা গিতেউ গনতিগিলিন আহেইক। পিথথিমিঞঃ পহিল কাখরা বিহাক চল উচরাউলাহাত, সেটা একর লঁসিদ কেহু দেউএ নেহি পারতা। মেনেক এহে, সইভতাক

লকেক পাসেই চিনহা মুদা আহেইক। পহিল বুঢ়াবাপ আর মাহামাঞেক বিহা দেইকে এখরাই হড় সমাজে বিহাক চল সিরজঅ লাহাত। বছরি-বছরি বুঢ়াবাপ আর মাহামাঞেক বিহা দেথিন ফাগুন মাসেক আমাইস তিথিক ১৪ দিনে। কুড়মি-কুড়মালি সমাজেঁ ফাগুন মাসে এখর বিহাক বাদে বিহা করঅত। জেটা কনঅ সমাজ বা গঠেক ই রিতিটা নেখেইক। আরঅ আরঅ গিত বা নেগ-নিতিঞ গনতিগিলিন রহলেউ এহে তিন নিঅর গিতে ভালঅ সির ফইরছা আহেইক।

গনতিক উচরেইন ইঁগগিতে। পহিলে মানুস ববা রহেহেলা। কাম করেহেলা ইঁগগিতে। একর বাদে ভঁগগি। ভঁগগিলে ভাখি। গনতি করেক কামে লাগাউলা আঁগুর। দিঅ হাঁথেক আঁগুর দসটি। তঅ পাথরেক জুগেউ মানুস ডাবকে ডাব বা গুট বাঁধি রহেতেলা জিউ-জিনগানিক খাতিরে। সিকার করি পেট পসেতেলা। হাঁথাইর পাখড়/পাখনা। কনে কইটা হাঁথাইর লেলা সেটা হাঁথেক আঁগুরে ইঁগগিতে দেখাউতেলা। জেঞ একটা লেইসাহে অঞ একটি দেখাউতেলাক। এসনে কই জেঞ জইটা লেউএতেলা তেঞ তইটা আঁগুর দেখাউতেলাক। দসটা লেলে দিঅ হাঁথেক দসটি দেখাউএতেলা। এগার হেলে আরেকবার ১টি দেখাউলেই হেউএতেলেইক। এসনে কই দুইবার দেখাউলে বিস, তিনবারে তিরিস দশবারে "সঅ"। আঁগুর দেখাইএ দস-দসে 'সঅ' হেউএইক সেটা সিখলা। ইটা একটা একক বনলেইক।

ববাক খনেই সিরজাইরহেইক খেইল, কুদ। রাউ নেহি ফুটলেউ ইসারাঞ গনতি করেহেলা। একুইরা নঅ জড় জড়। পাখড় জুগে পহিল সিরজাইরহেইক "কইত" খেইল। খেইলঅ হেউএতেলেইন আর হাঁথাইরেক কামউ হেউএতেলেইন। গতর চাঁগা রাখে খেলেহেলা তির ডাঁটা, ভাড়ু-গুড়ু, ছুর হেনঅ তেনঅ। তির-ডাঁটা খেইলে গনতি আহেক। ইটা খেইলেক গনতি। এড়ি, দড়ি, ঘুরন, চাল, চম্পা, ঢেইগ, সুতি/সুতইল। দুই দলে ভাগ হেই খেলঅত। ভাগ হেলেই গনতি চলেইক। মির, ঢঁড় হেউএক বাদে উচরেইক খেইল। সুরু হেউএইক গভেক উপর তির সুতাই ডাঁড়িঞ উটকা। ই-গনতি গিলিন হেউএইক কেসন কই খেলতা তাকর গনতি। এড়ি হেলে তির এড়িঞ (সুপলি ভইড়েক উপর) রাখি ডাঁটাঞ মারথিক। দড়িঞ মুড়েক সইরে হাঁথে ধরি দউড়ে (তির) রাখি, ঘুরন হেলে ঘুরাই, চাল হেলে মুঠাক উপর রাখি, চমপা হেলে তর হাঁথে রাখি, ঢেইগ হেলে হাঁথে ধরল ডাঁটাক উপর তির রাখি আর সুতি হেলে গভেঁ সুতাই উটকথিক। ই-গনতিটা খেইলেকেরে কামেই চলেইক। পাঁচেন-ছইএন খেহলটাউ অহ নিঅর। পুরা-পুইর গনতি নহেইক।

রাউ ফুটলেইন। গঢ়লা বসকইত। সিরজালেইক ভাখি। তাগিদদেই মানুসে সিরজেক বাট খজঅত। ধিরি ধিরি মুহে মুহে গনে সিখলা। সিরজালেক কিরসি। উবজা

ফসল উমনাউএক বা বেরহন ভুতা, খাটালি আর সমাজেক নেগনিতিঞ আরঅ ঢেইরকই গনতিক তাগিদ গিরলেইন। চাসবাস বা আপন তাগিদে দিন, মাস, বছর গনতিঞ আনে হেলাহেইন। ঘারে আহথিন পসুআ জিউ। গনতি না রাখলে কমা-বাঢ়া কেসে জানতা? চাসবাসেক খাতির আদিম ভারতিঅরা ৩৬৫ দিনে বছর হেউএইক সেটাউ জানেতেলা। কাহে নঅ ৩০ দিনে মাস গনলে ৩৬০ দিনে বছর পুরেহেইক। বছরি ৫দিন ঘাটতি রহলে মরসুম জাতেইক বগড়াই। মাসেক নেতেই মরসুমউ গনতিক হেউএইক। কমা-বাঢ়া হেলে গনতি ভুল হেই জাতেইক। বিহন-বিচ ফেলা, রপা, নিকান, কাটা সভে সমইএ হেতেইক নেহি।

খিরিসটান সমাজে বড়দিন উচরেইক ২৫ ডিসেমবর। আর কিরসি সইভতাক বড়দিন উচরেইক পহিল মাঘ। বছরেক পহিল দিন। দিনটাকে আখানউ কহা হেউএইক। চাসানিখাক গনতিঞ আইজ লে চাসবাসের উচরন করত হার পুইনহাক নেগ-নিতিঞ। আড়াই পাক হার জতি চাই কদাইরে আড়াই চট চটাইকুহুন। টুসু পরবে পাঁচদিনেক অলগ অলগ নাম আহেইক। আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর আর আখান। পহিল মাঘ আখান দিনে আদিম কিরসি সইভতাক লকে জানেতেলা সুরুজদেব দখখিনাইঅন লে উততরাইঅনে ডহরেই। আর তিল-তিল করি দিন বাঢ়ইতে রহেইক। এখরাক গনতিঞ আইজ লে দিন বাঢ়েইক কহি এহে দিনটাকে আখান জাতরাক নেগ-নিতিঞ বড়দিন মানথিক। দিনটা বাড়তেইক তাকর চাইর দিন আগুলে আড়াপাটা চলেইক। দকখিনাইঅনলে উততরাইঅনে জাউআক আড়াপাটাকে কহা হেউএইক আঁউড়ি। চাঁউড়ি মানে চঁউরা। দাহিনা দিগেলে নেগা দিগে চঁউরতি। বাঁউড়ি হেলেইক বাঁউআ দিগে চাই নেগা দিগে। নেগা দিগে ঘুরইতে রহতি। এক পাক ঘুরইতে সমই লেইক ৩৬৫ দিন। মকর হেলি বেরা। আইজ থুম মারেই। আর আখান দিনলে সুরুআত হেউএইকক দকখিনাইঅনলে উততরাইঅন ডহরে চলা। ই-পরবটাঞ তিল খাইএক নেগ আহেইক। সভেকাই কহত- তিল খালেই দিনটা তিলে তিলে বাঢ়তে রহেইক। খিরিসটান সমাজে বড়দিন আর আদিম কিরসি সইভতাক বড়দিনে ফরক কাহে? সভেকাই জানিঅ বিরটিসেক সঁগ ভারতেক সমইএক দমা ফরক। ছউ ঘড়ি। অখর সুরুজ উগেই হামরাক লে ছউ ঘড়ি আগু। এহে ফরকেক তেঁহে এহে সইভতাক বড়দিন ১ মাঘ।

অহ সইভতাক লকে জানেতেলা জিউ-জগতেক সিরজনেক আধার পুরুস আর পরকিতি। সুরুজদেউতা আর মাটি মাঞ। ঘারে আল ছউনা জনমলেই সুরুজ দেউতাক মানত করত। লহাক বেড়ি পিঁধাউথিক ছউনাটাকে। একরে দারাজে জিউএক সিরজন কহি একে মুল দেউতা কহি মানথিক। এখরা সুরুজ উপাসক। সুরুজ দাহিনা বাটলে নেগা বাটে

ঘুরাক খাতির এখরাক নেগ-নিতি, আচার নেগড়ালি। চারিটাক নামউ নেগাচারি।

কাকরউ ঘার বেরহইনা কাম করলে পাঁচিরে চিস দেউএহেলথিক। কতেক বেরহন পাউআতেইক হিসাব করে জানেতেলা। সিরজঅরহত ছটাক, পুআ, পাই, পইলা, সের। বাগাল খাটেতেলা বারঅ মাইসা, নউ মাইসা, ছউ মাইসা। গনতি রহে হেলেইক কহি এহে গিলা রহেহেলেইক। এখনউ আহেইক। কুতে চাস করেহেলা। গনে নেহি জানলে কেসে কুতি করতা চাস? গনতিএঃ ই-গিলাউ রহেহেলেইন ১০ সেরে সলি, ২০ সেরে দুইসলি/আধমন/খনডি, তিরিস সেরে তিন সলি, ৪০ সেরে চার সলি/মন।

কিরসি সইভতাক লকগিলিনে হাজার-হাজার বছর আগুলে আপন চারিএঃ, গিত, আহানা হেনঅ তেনঅ গাহি বা কহি আউঅহত। পুরখেনি গিত গিলিনে গনতিক চিনহামুদা পাউআ জাহেইক। হেঁঠেক গিতটাএঃ আহেইক-

(১) আইজ রে করঅম গঁসাএঃ
ঘারে দুআইরে রে, ঘারে দুআইরে
কাইল রে করঅম গঁসাএঃ কাঁস নদিক পারে।
জাহু জাহু করঅম গঁসাএঃ
জাহু ছউঅ মাসরে, জাহু ছউঅ মাস
আউঅত ভাদর মাস আনবউ ঘুরাই।

গিতটাএঃ ছউ মাসেক কথা আহেইক। জানা জাহেইক ছউ মাসে বছর দিন। ই-গিতটাএঃ ছউ গনতি পাউআ গেলেইক।

(২) বাপে মকে বিহা দেল সমুনদর পার
কি সমুনদর পার
অগঅ সমুনদর, সমুনদর ভরলঅ ছউঅ মাস।
বাপকে মর কহি দিহা দিনা চারি লেগঅতা
কি দিনা চারি লেগঅতা,
অগঅ পরব তিহার, পরব তিহার সাসেকে অধিন।

ছউ গনতিক সগেঁ চাইর গনতিকটাউ আহেইক। বাপকে কহি দিহাক দিনা চাইরেক লেগতা। আজাকে নাতিনেক গিতে তই-

৩) আজা, আজিএঃ মকে সুপতি দেলি
খেলু নাতিন দুআরাঁহি গউ (২)
আজা তঁহি মকে অবলাহিঁ বিহা দেলে
কবহু নেহি খেলে দেলে গউ (২)

আজা, চাইরঅ ধারিঞ চাইরঅ মুঠা খেড়উআরি
হামে হেলঁউ ঘারেক ভারি গউ (২)
গিতটাঞ চাইর গনতি পসটঅ পসটঅ আহেইক।
৪) দু'অ মিলি গেলে দেউরা
একা ঘুরি আউলে হউ
কাঁহা রাখলে পিঠেক ভাই।

দুইঅ মিলি গেলে একা ঘুরি আউলে। ই-গিতটাঞ এক পাউআলেইক। দুইঅ পাউআলেইক।

৫) এক ফাভড়ে দুই ফাভড়ে পাড়বেঞ গাছেক আম
আনা বাবু গাথেক গামছা পঁছাউবহন ঘাম।

সমাজে আম বিহা আহেইক। গিতটা আম বিহাক। ই-গিতটাঞ ফইছঅ এক, দুই গনতি আহেইক।

৬) একঅ ডাবকা দেল মাঞ গঅ, দুইঅ ডাবকা দেল
তিনি ডাবকাঞ, সে তঅ জবুনা সুখাই গেল
তিনি ডাবকাঞ-

গিতে তিনি ডাবকাক কথা আহেইক। তিনি মানে তিন। আখড় বগড়নে তিনি তিন হেলাহেইক।

৭) ধনি গে পাঁচপুতা কনে জগাইএ দেতউ
না নঅ জাঁঞ নইহর গউ।

গিতটাঞ পাঁচ পুতাক জগাইএক কথা আহেইক। পাঁচ গনতি ঢেইর-ঢেইর ঠিন দেখে পাউআইক। জেসন গুটি খেইলে গনঅত-পাঁচেন, ছউএন, সাতেন, আঠেন নিমক। সমাজে পনচাএত কথাটা দমা এখনউ চালু আহেইক। পনচা মানে পাঁচ। অহিরা গিতে পাঁচ আহেইক। পনচঅ/পাঁচঅ পুতাঞ দসঅ ধেনু গাই"। দসঅ পাউআহেইক। পাঁচ ভদরান, পাঁচ লক (সমাজ নেতা) চল আহেইক। কিরসি সমাজেক ধান রপেক নেগে আহেইক পাঁচআটি।
বিহাগিতে আহেইক—

আজা, সাতঅ সমুনদরঅ পারে বিহা দেলে
কেইসে আউঅম করঅম খেলে (২) গউ।

ইটা হেকেইক মাড়ুআ বাঁধা গিত। খেইলে পাউআহেইক সাতেন। আরঅ কহত সাতুল দেখি দুখ পারাই। কথাঞ কথাঞ কহিঅ-'সাত-পাঁচে নাঞ'। করম

গিতে আহেইক—

সভে সঁগি আই গেল, একা সঁগি রহি গেল (২)
অগঅ একা সঁগি - একা সঁগি পড়লঅ বেজার।
দলা-ডাঁড়ি ছাঁদঅব 'তাউ এ সঁগি আনঅবঅ (২)।
অগঅ, মরদেসে- মর দেসে আহে কবিরাজ।
কবিরাজকে দেবেঞ মঞ সাত হাঁথেক ধতিআ।
অগঅ, দাইলে চারে- দাইলে চারে করঅবঅ বিদাই।

গিতে সাত হাঁথেক ধতিক কথা আহেইক। তাহেলে সাত গনতিটাউ গিতেই পাউআহেইক।

আট গনতি গিতে নিহি পাইঅ। রহলে রহেউ পারেইক। মেনেক খেইলে আটেন কথাটা আহেইক। জেটা আগুই লিখালাহেইক। কথাঞ আহেইক- আটঅ অঁগগে তর লাজ নাঞ। আসিন মাসেক ইজতিআক আট দিনে খেত জাগা বা ধান জাগা হেউএইক।

নউ গনতি হড়েক দমা দামি গনতি। আর দরকারি। আসাপতি/পুআতি জেনিঞ নউমাসে নউমাসি খাত। গনতিটা এহে খেনলেউ উচরন হেউএ পারেইক। দস মাস পুরি পাইরালেই মাঞ- ছউআ বেলগ হেউঅত। মানে মাঞেক গবভঅ সুইনঅ হেউএইক বা খালি হেউএইক। এহে কিরিআটাঞ নউ গনতি পাউআ জাহেইক।

নউ গনতি বাদে সুইনঅ গনতিঞ আহেইক এহে খেনলেই দুই সঞখাক উচরেইন। বিহা গিতে আহেইক—

বাবা, সুখাইএ সুখাইএ ফুলা ঝড়ি গেলা
হাইরে বনা সুইননঅ হেলা, হাইরে বনা সুইননঅ হেলা গউ।
বাবা, ডাঁড়িআ কাঁদাইএ বেটি চলি গেলা
হাইরে ঘারা সুইননঅ হেলা, হাইরে ঘারা সুইননঅ হেলা গউ।

ই-খেন সুইননঅ গনতি পাউআ জাহেইক। একেক বাদে সুইননঅ বসাউলে দস হেউএইক। গিতে আহেইক—

কনঅ পিঢ়িঞ লাগাউএ আমু রে জামু
কনঅ পিঢ়িঞ লাগাউএ মহুল ডাইর।
এক পিঢ়িঞ লাগাউএ আমু রে জামু
দসঅ পিঢ়িঞ লাগাউএ মহুল ডাইর।

গিতে দস গনতিঅউ পাউআ গেলেইক।

ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস প্রাচীন যুগ, পথিঞ ১১৯ পাতে আহেইক ‘গনিত শাস্ত্রে শুন্যের অবদান প্রাচীন ভারতীয়দের।’

সুইননেক সিরজন পুরনা ভারতিঅরাক হেলে গিতেক গনতিগিলাউ অখরে হেকেইন ইটাঞ কনঅ ভেল নাঞ।

নেগে-জগে কথাঞ-কথাঞ বা আহানাঞ গনতি পাউআইক। জেসন— ডেঢ়রি, ডেইঢ়া, ডেঢ়ি, ডেঢ়, দেঢ়। মুল গনতি ঢেইঢ়া। উসরনেক হেরফেরে বা আখড় বগড়নে দেড় হেলাহেইক। ডেইঢ়া...ডেইঢ়...ঢেড়...দেড়-ঞে থমকি আহেইক। দবড় কথাটাকরউ চল আহেইক।

আঢ়াই কামড়। গনতিটা আহেইক জিতিআ পরবে। কেতরল খিরা পরবতিআঞ আঢ়াই কামড় খাত। আঢ়াই এখন আড়াই কহত। আরঅ আহেইক আড়াই কাঠিক বাজনা। ভগতা পরবে ই বাজনাটা বাজাউঅত। কথাঞ-কথাঞ কহত আড়াই বুঝেই তঅ দেড় নেহি। তেসনে ছাগইর-ভেড়াক পটা ধউএক খনে কহত পাঁচ ঘাইরা ভালঅসির ধউবে। কেউ মরলে কেউ কেউ সুধিআউথিন— আইজ কইদিন। জবাবে কহথিন তিন দিন বিতলে কহথিন আইজ তিন- তেল খইর। সাত দিন হেলে কহথিন- আইজ সাতদিন, কাঁধকাইঠা। কেহু কেহু কহত দস ঘাইটা নঅ বারঅ ঘাইটা। নউআ গিদর আউলে এহে গনতি গিলাই কহত-তিন দিনে নারাতঅ, ছউদিনে ছউঠি, একুইস দিনে একুইসা। বিহা ঘারেউ তেসনে আহেইক। কইদিনেক লগন? তিন দিনেক নঅ পাঁচ দিনেক। লগন বাঁধাঞ কইটা গিঁট দেথিক সেই গনতিটাউ মুখে ফদড়ত।

কিরসিজিবি মানুসগিলাঞ কামেক খনেউ গনত। ডাবকা ঝিঁটলে কহত দুইএক ডাবকা দিঁহি নঅ। এক সাইট দিঁহি। এক সাইট মানে ৩৬০ ডাবকা। কদরাইএক খনে নেহি পারলে কহত— ধিরি ধিরি দুই এক কদাইর দিহি। কই মাড়া আহউ সুধিআউলে কহত- দুইএক মাড়া আহি। কড়াকড়িক খনেউ কহত এক পাহি, দুইপাহি, তিনপাহি বা জইপাহি আহেইক সেটাই কহত। হার বাহেক খনে এক আঁতর, দুই আঁতর, পাঁচ আঁতর বা ঢেইর রহলে সেই পারা গনি জাত। ঘারেক সাঁগা ছললে বাঢ়হিকে কহথিক চাইর পইহলা করি দেঁ। হেনঅ-তেনঅ।

জান কেহনিহুঁ আহেইক---

১) দস ঠেঁগ তিন ভুঁঠি
উড়ুর-কুচুর বাহেই মাটি।
২) লাল দামড়া

এক কামড়া।

৩) একটি বুঢ়িক ঘার আহেইক
তঅ দুআইর নাঞ।

৪) ইগেল-ইগেল-ইগেল
দিগেল কাঁহা গেইল
দস ঠেঁগেক জনতু মারি
আইগ মাগে গেইল।

৫) একটা গাছে পাঁচটা ফুল।
কঁহে কিনা?

৬) তিন কুইনা বাবাজি
মন হেলে ঠেলি দেলে
তরকারি কে তরকারি
বাবাজি কে বাবাজি।

৭) আট ঠেঁগ সউলঅ হাঁঠু
মাছ ধরে গেলাক টাটু,
সুখনা ডাঁগাঞ আড়ি জাল,
মাছ খাই চিরকাল।

এহে সমাজেক লকগিলিনেক এসনে দমা গনতিক কেহনি আহেইক। আহানাঞ পাইঅ-বারঅ দিনে বারনি, তেরঅ দিনে রহনি। মেহেরারুঞ গাইর দেথিন-আটকুঁড়ি,বারঅ ভাতারি, বারঅ বেধুআ। কহত-এক বেটাক মাঞ ঠাকুর, পাঁচ বেটাক মাঞ কুকুর। পলাসেক তিনে ভেঁখু। সঅ কথাঞ সতিভুলেই। আরঅ আহেইক সউলঅআনা, সউলঅআনাক মজলিস, গাঁউএক নাম বারঅমাইসা, সতের, সাত সিমইলা। পরগনাক পাঁচ পরগনা। আহানাহিঁ আহেইক—

"টঁড় কুড়মি একাসি।"

জে বছর বরিসা কুলাই জাইক সে বছর চাসাঞ কহেই সউলঅ আনা নেহি আঠারঅ আনা ধান হেতেইক। ধান সিঁসে রহেইক সউলঅ কাহলি বা কমবেসি সেটাউ কহত। ডাঁগর বা জড় মেল কাড়া লড়লে কহত-না বাবু জড় হেলাহাত। উনিস-বিস আহাত।ধান পাকেক খনে চাসাক বানি-ফুলা ফুটা উনতিরিসা ঘড়া মুহা তেরঅ।

ছউআ ভুলা গিতে আহেইক-----

চালারে ছউনারা মাছ ধরনে জাম

মাছেক কাঁটা গড়ে গড়লে দলাঞ চাপি জাম
দলাঞ আহি ছউ পন কড়ি
গনি গনি জাম।

খেইআল হেই গেলি টুসু গিতে তিরিস গনতিটাউ আহেইক। সেটা হেউএহেইক-----

তিরিস দিন রাখলিঅউ টুসু তিরিসটা ফুল দেইএ গউ।
মকর হেলউ বাদি টুসু আর রাখে লারিঅউ গউ।।

নেগ-জগ,কথাক-কথা, আহানা,কেহনি,গিত হেনঅ-তেনঅ আজুক নহেইক। হাজার হাজার বছর আগুই কিরিসি সইভতাক জুগ বা তাকর আগুই সিরলাহেইক। উপরেক কথা গিলিনে গনতিক চিনহামুদা পাউআ জাহেইক তখন গনতি গিলিনউ তখনেই সিরজালাহেইক। এক লে দস তক গিতে দমা পাউআ জাহেইক। অহ সঁগে বারঅ, তেরঅ,সউলঅ,সতেরঅ,আঠারঅ, উনিস,কুড়ি/বিস,একুইস, উনতিরিস, তিরিস, একাসি, সঅ গনতিঅউ পাউআহেইক।

কথাঞ কথাঞ কহত গরিবেক সাইট দউস। রহলাক বরদা ঘারে অকর দুখ তিনকালে। আট হাথেক ধতি আর গারঅ হাথেক ঠেঁঠি। নউআঞ নউ গনডা। হাজারে গুজার নাঞ। বা-রে কুড়মিক জিউ ১ সের নুনে তিন সের ঘিউ। বারঅ মাইসা রগ। একর তিন পিড়িঞ কেহু নাঞ। লাখউ লিক হেউএই-লিকউ লাখ হেউএই। কথাগিলিনে সাইট, তিন, আট, নউ, গারঅ, বারঅ, হাজার, লাখ গনতি পাউআহেইক।

দেউতাক নাম আহেইক পাঁচ বহনি, সাত বহনি। জমি জরিপে তেহেড়াক খজ হেউএইক। আরঅ আহেইক দ-পথা, তে-মাথা, চউ-মাথা। দ-দুই, তে-তিন, আর চউ মানে চাইর কথাগিলিন চলত আহেইক।

এতেক জখন গনতিক চিনহা-মুদা বা সবুদ পাউআহেইক তখন আদিম কিরসি সইভতাক লকগিলিনেই সিরজঅলাহাত সেটাঞ কনঅ দইসত নাঞ। আগুই কহলাইহ অহ কিরসি সইভতাক লকগিলা ভারতেই আহাত। তাকর চিনহাপ জাখরা এখনউ কিরসিক আধারে নেগ-জগ,পরব-তিহার হেনঅ-তেনঅ গটা বছর পালি আউঅহত। সেই লকগিলিনে হেলা কুড়মি বা কুড়মালি গঠেক। ভারতেক পহিল গনতিক সিরজন এক লে সঅ, হাজার, লাখ এহে জনজাইতেকেরে সেটাঞ কনঅ ভেল নাঞ। জেটা এহে সমাজে এখনউ চলতে আহেইক।



আদি জনজাতিগুলির সব ভাষারই গোড়া হল কুড়মালি ও তার সংস্কৃতি

সমীর মাহাত

এদেশে সামাজিকভাবে আদিকালে যাঁরাই বসত গড়ে তোলে, তাঁরাই আদিবাসী। প্রতিটি জনজাতিই নিজেদের ভাবপ্রকাশ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষা কৌশল ব্যবহার করে। তাই 'কুড়মি' আদি জনজাতি বিষয়টি আশমান থেকে উড়ে আসা নয়। একেবারে প্রাচীনকালে এদেশের সীমারেখা বা ভৌগোলিক অবস্থান একটা গোটা পরিধির মধ্যেই ছিল। কুড়ম নদী সাতটা নদীর মধ্যে একটি, যা পরবর্তীকালে সপ্তসিন্ধু। ইতিহাসে পাওয়া গিয়েছে কুড়ম উপত্যকা। আগে জনজাতিরা সবাই জঙ্গলেই বসবাস করত। বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ জঙ্গল থেকেই পাওয়া যেত। এখনও পর্যন্ত যা সাব্যস্ত তারা, খেরোয়াল বংশোদ্ভুত। প্রকৃতি তথা বৃক্ষ পূজা বা টোটেমিক' শ্রেণীর মনে রাখতে হবে, আদিবাসীদের কাছে এই দেশটি আগ্রাসনের। এখনো ভাষা কারবারি বা বিজ্ঞানীরা 'ইন্দো-আরিয়ান' তথা বৈদিক বা আর্যাবর্তের ভাষা ও বাকি সব মানে অষ্ট্রিক এই দুই স্রোত নিয়েই নাচনকোদন জারি রেখেছে। কোনকালেই সেই চর্চায় 'কুড়মালি' ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাতে কাউকে

দেখা যায় নি। কেননা প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি ভাষা তাহলে সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে খেয় হারিয়ে ফেলত। সম্প্রতিকালে ভারত সরকার এদেশের আদি জনজাতিদের লুপ্ত প্রায় ভাষা সংরক্ষণে ব্রতী হয়েছে। ঢের দেরি হয়ে গিয়েছে। এই উদ্যোগ অন্তত আরও ৫০ বছর আগে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভাষা সংরক্ষণ বিভাগ দ্বারা এই কাজ শুরু হয়েছে, অনেকের তালিকায় কুড়মালি ভাষা লুপ্তপ্রায় নয়। কেবল এই কুড়মালি ভাষা নিয়েই ইউনেস্কোও তাদের মধ্যে দ্বিচারিতা সামনে এসেছে। যেমন—১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কো কুড়মিদের সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করেছে ভারতে মোট কুড়মি ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৪ হাজার। বিশ্বে কুড়মিদের সংখ্যা ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯ হাজার। ৩টি দেশে কুড়মিদের অবস্থান। এই তথ্য মতে কুড়মিদের প্রাথমিক ভাষা হিন্দি (বলেন ১ কোটি ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার)। ভোজপুরি, তেলেগু, মাগধী, মৈথিলি, কানাউজি, বুন্দেলি, সাদরি, মালডি, বাংলা, আওয়াধি, ছত্তিশগড়ি, আশামেসি, বাখেলি, ওড়িয়া, অঙ্গিকা, নিমডি সহ ৪৪ টি ভাষাকে দ্বিতীয় হিসাবে ব্যবহার করে। উল্টোদিকে ইউনেস্কোর সূত্র ধরেই রাজ্যের ৩০ টি লুপ্তপ্রায় ভাষা পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তাহলে এই রাজ্যে কুড়মালি (তাদের শব্দ কুর্মালি) ভাষার অস্তিত্ব মিলল। উপক্রমণিকায় কেন এত সব বললাম। বিচার পর্বে তারও যুক্তি দিচ্ছি।

* **কুড়মালি ভাষা আসলে কী ?** নৃতত্ত্ব গবেষণা ও সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের কালরেখা নির্ভর করেই বলা যায়, এদের আদিবাসীদের (Aboriginal) একটি অংশ জঙ্গল থাপন ছেড়ে সমতলে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। কৃষি সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার আগে না পরে? আগে। এই সভ্যতার সময় নিজেদের ভাব প্রকাশের নিজস্ব ভাষা ও শব্দ:- উগাল, সামহাল, ভিটা, দেঢ়হি, দাহিন, কাঢ়হান, গাইছান, পৈড়া, সল, ডাহি, উকান, ভুলুক, হ্যাজ, যত্, হাল, জুঁয়াল, অঁদ, বঁটা, ইস, মি, বাঁহুক, চিপাখাড়ি, রপা লাগা, নকান, অয্ , থোড়।

* **ব্যবহৃত সামগ্রীর ক্ষেত্রে :-** উলআইর, দাবু, আড়াশ, ঠেকা, কুলা, মান, সের, কড়া, চাঁখর, গন্ডা, পণ। গুরুর গাড়ি সবাই বোঝেন তার অংশগুলির নাম একমাত্র এই ভাষার শব্দে পাওয়া যায় আরা, পুঁইঠা, বেলুন, ধুরি, টাঁঙ্গা প্রভৃতি।

* **বসত ঘরের নিজস্ব ভাষা শব্দ :-** দর, রাদা্, কাদাপাটা, দাঁইতা,ধন্না, ডেহর, মুধইন, আঁখডেহর, আইনগ্যা, ঢেঁকশাল, ছাঁছা, ছিটাবেড়হা, প্রভৃতি।

***শরীর বৃত্তীয় :-** এড়ি, গুঁহদা, কাঁধ, বাঁহি, লাইভুকু, তুতকা, থোথনা, দাইফনা, পানিখখা, পটা ইত্যাদি। এগুলি কণা মাত্র শব্দের উপস্থাপনা দিলাম। শব্দ :- 'অধন কাঁদছে চাঁড়ে মেরা' এই বাক্যকে যেকোনও ভাষায় করতে গেলে হুবহু আসা সম্ভব নয়। মজার বিষয় হল আদিবাসীদের যে অংশগুলি জঙ্গলেই থেকে গেলে তাঁরাও এই শব্দ রত করতে পারল না। সমতলের সাথে জঙ্গলবাসীদের যোগসূত্র বা আদানপ্রদানে তখনই ভাষার অপভ্রংশ তৈরি হল। যাঁরা বহিরাগত আর্যদের জুলুম কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরাকামড়ি দিলেন,তার কি ব্যাখ্যা দিলেন! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল প্রথম বর্ষ, সায়ন দেবনাথ 'আর্য রহস্যের অনুসন্ধানে' জানাচ্ছেন 'বেদে অনার্য মুন্ডারী ও দ্রাবিড় ভাষার প্রায় ৩০০টি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কি সুন্দর কুড়মি ভাষাকে অনায়াসে পাশ কাটা হচ্ছে ভাবুন। প্রথমেই বলেছি ভাষা হল ভাব বিনিময়ের মূল উপজীব্য। একটা তুলনা দিলে আরও পরিস্কার হয়।

বাংলা	সংস্কৃত	গ্রীক	ল্যাটিন	জার্মান	আবেস্থান	ইংরেজি	কুড়মালি	ফার্সী
আমি	অহম	এগো	এগো	ইখ	আযেম	আই	হামি	
মানুষ,মানব	মানব,মনু,মনুষ্য			মান		ম্যান	লক	
পিতা	পিতৃ	পতের		ফাটার		ফাদার	বাপ	
মাতা	মাতৃ		মতের	মুটার		মাদার	মাঁঞ	
ভ্রাতা, ভাই	ভ্রাতৃ		ফ্রাতের	ব্রুডার	ব্রাতার	ব্রাদার	ভাই	
কন্যা,দুহিতা	দুহিতৃ			খট্‌কার		ডটার	বিটি	
এক	এক	ওইস	অয়েকুস			ওয়ান	একেড়	যক
বীর	বীর	হরস	ভীর			হিরো	যঁইত	
সম্মুখস্থ	পুরস্	প্রো	প্রো	ফোর		ফোর	আগুই	
দুয়ার,দরজা	দ্বার			ট্যুর্		ডুওর	ডেহোর	

(তথ্যসূত্র : প্রথম অধ্যায়, আর্য আক্রমন তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ, **লেখক :** শামসুজ্জোহা মানিক এবং শামসুল আলম চঞ্চল)।

এখানে দেখুন, কুড়মালি শব্দ আদি থেকেই পৃথক ও নিজস্ব। বাংলা শব্দগুলি বরাবর সংস্কৃত থেকে চলে এল। আবার চলিত বাংলা সরাসরি কুড়মি শব্দ ভান্ডারে থাবা বসিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করল (ভাই)। আবার ইংরেজি 'ডু ওর' কুড়মি শব্দ 'ডেহোরে' এ ভাগ বসাল। কুড়মি শব্দ ভান্ডারের সতিত্ব তবুও নষ্ট করা গেল না। ভাষা বিজ্ঞানীরা কখনোই বললেন না 'বাংলা' আসলে সংস্কৃতের অপভ্রংশ। সলিট একটি ভাষা উপস্থাপিত

হল। এবার চৌর্যবৃত্তির উদাহরণ দিই। তা হল 'চর্যাপদ'। হিন্দি ভাষার গবেষকদের দাবি, হিন্দির আদি ভাষা চর্যাপদ। ওড়িশা ও বাংলা ভাষার গবেষকদেরও দাবি একই। আসলে তা হল কুড়মালি ভাষার আদি লেখ্যরুপ। সবকটিই ঝুমুর গান। স্বপক্ষে যুক্তি দিই—

এক : একটি বৃহৎ অঞ্চলের বাসিন্দা (পড়ুন বাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশা, আসাম, বাংলাদেশ এর কুড়মি মাহাত অধ্যুষিত এলাকা) যাঁরা বাপের জন্মে চর্যাপদ পড়েননি বা জানেননি, তাঁরা পদে ব্যবহৃত শব্দ কথ্য ভাষায় ব্যবহার করছেন। শব্দটির যথার্থ মানেও বলে দিতে পারছেন।

দুই : চর্যাপদ গীতিকোষ বা গানের ভান্ডার। তথাপি বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া কোন ভাষাতেই চর্যাপদ গুলি গাওয়া সম্ভব হয়নি। মানে ব্যর্থ। অথচ ঝুমুরে গানগুলি সুন্দর গাওয়া যাচ্ছে।

তিন : চর্যাপদ কর্তাদের প্রকৃতি কোনও ভাষা বর্ণনা দিতে অক্ষম। একমাত্র কুড়মালি ভাষায় পারে তাঁদের যথাযত বর্ণনা দিতে।

যেমন:- ভুসুক পাদ (ভুসকু অর্থে নাদুস নুদুস)

লুইপা : (লুলহা থেকে লুইপা, অর্থে একটি বিকলাঙ্গ)

কুক্করি : (কুকুইরা, অর্থে ঝগড়া লাগা আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধুত্বস্থাপন স্বভাবের)

চাটিল : (চটকদার বা ফড়েল প্রকৃতির)

কাহ্নিল : (কাহিল, ক্লান্ত প্রকৃতির)

কামালি : (কাইমলা, বেনে প্রকৃতির)

ঢেন্টন : (ঢনঢইন-ভবঘুরে বা ঢেনঢেইনা-রোগাপাতলা প্রকৃতির)

(তথ্য: 'জঙ্গল মহলের পৃথক ভাষা সংস্কৃতি' শারদীয়া কোলফিল্ড টাইমস ১৪২১ লেখক: নিজ)

এবার ভাবা বিজ্ঞানীদের ভাবা উচিৎ চর্যাপদ আসলে কুড়মালি ভাষার আদি লিখিত রূপ।

অবস্থানকালে কুড়মালি ভাষা ব্যবহার সম্প্রদায় ও তার ধারক বাহকেরা বৃহত্তর ঝারিখন্ড বা ঝাড়খন্ড সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ১৮ শতকের প্রথম দিকেই ইংরেজ দার্শনিকেরা এই ভাষার ধাঁচকে 'মাহত কাথা' বলে উল্লেখ করেছেন। ঝাড়খন্ড সংস্কৃতির বলয়টিকে খানিকটা বিহারে, ঝাড়খন্ডে ওড়িশায় ও বাংলায় খিঁচুড়ি ইংরেজরা না পাকালে কোনও ঝামেলায় হত না। ১৮০০-১৯০০ এই একশো বছরের

মধ্যে কুড়মালি ভাষাকে ছেঁড়াচোঁথা করা হযেছে। বাংলা ভাষা সাধু থেকে চলিত গঠনের সময় বাংলার মাতব্বর ভাষা বিজ্ঞানীরা এই ভাষা ব্যবহারকে তো 'ঝাড়খন্ডি উপভাষা' বলেই দাবি করলেন। দেশ স্বাধীনের পর ভৌগোলিক অবস্থান তথা রাজ্যের নাম অনুসারে বহু ভাষা প্রতিষ্ঠিত; আসাম-অসমিয়া, ওড়িশা-ওড়িয়া ভাষা, তামিলনাড়ু-তামিল, মহারাষ্ট্র-মারাঠী, কর্ণাটক-কন্নড়, এরকম প্রভৃতি। বহু কষ্টে ঝাড়খন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। হিসেবে বলছে ঝাড়খন্ড- ঝাড়খন্ডি ভাষা? ঠান্ডা মাথায় ভাবুন, এখানেও কুড়মালি ভাষাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার এটি চরম কুরোক্রেট। নিজেদের ভাষা চর্চাকে যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া। কেননা, প্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলি আর প্রসারিত হতে পারছে না, ভান্ডার বাড়াতে অক্ষম। কেননা কুড়মালি ভাষা প্রতিষ্ঠার নবজাগরণ তৈরি হয়েছে। বিশেষত: পঃবঃ রাজ্যে চুলচেরা সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে বসবাসকারী রাজ্যের অর্ধেক মানুষ 'বাংলা' কে কথ্য রূপ থেকে বিসর্জন দিয়েছে। সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও ভাষাকে যদি মানুষ ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করে, সে ভাষার বুনোট যতই কংক্রিট হোক তা ধ্বংস হতে বাধ্য। সংস্কৃত ভাষা তার প্রমান। উল্টোদিকে ব্যবহারিক ভাষা যে লেখ্য রূপে মান দিলে তা রাজ্য দেশ তথা বিশ্ব দখল করতে বাধ্য। ইংরেজি তার প্রমাণ। তা প্রথমে জার্মানি জনজাতির লোকভাষা ছিল মাত্র। তাই সবুরে মোয়া ফলিয়ে এক শতকে কুড়মালি ভাষা অন্ততঃ চার রাজ্যের মুখ্য ভাষা হবেই, দৃঢ় বিশ্বাস।

কুড়মালি ভাষা হল, এরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল ঝাড়খন্ডের, বিহার, ওড়িশা, কুড়মি জনজাতি রা নিজস্ব ভাষা শব্দে ভাব বিনিময় করে এমন একটি ভাষা। বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠিত ভাষার সাঁড়াশি চাপে শ্বাস রুদ্ধ হতে হতে এযাবৎ কুড়মালি ভাষার দুটি রূপ সামনে এসেছে। রাঁচি ও সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই ভাষার লেখ্য বা পঠন রূপ এবং প্রচলিত বা মুখ্য ব্যবহারিক কুড়মালি ভাষা। ভাষা একই বলার আদল সামান্য আলাদা। আবার ব্যবহারিক কুড়মালি ভাষাতেও প্রচুর সাহিত্য, সিনেমা অধিকাংশ ঝুমুর যাত্রাপালা তৈরি হয়েছে। যেমন বাংলা ভাষার সাধুও চলিত দুটি রূপ। যেমন—

তুঁই অরহাকে চহ্‌রাই বাইটা, হামি
পেছুই দাঁদাই যাছি-কথ্য কুড়মালি

তঁই অরহাকে চহ্‌রাইকে বাইটা, পেছু বাটে

জাইহ হামি- লেখ্য বা পাঠ্য কুড়মালি

হামার চুলহায় অদা কাঠ, কেমনি ছনকাব
বির্‌হি ডাইল। ফুঁইফড়ে গেছে সিঝা ধান
—কথ্য কুড়মালি
হামর চুলহাঞ অদা কাঠ কেসনে ছনকাম
বিরহিক ডাইল। ফুঁইফড়ে গেছে সিঝা ধান।
—লেখ্য বা পাঠ কুড়মালি।

যদি ভিনভাষিকেউ কুড়মালি ভাষা শিখতে চায় তাহলে কথ্য কুড়মালি রত করে মৌলিক শব্দ উচ্চারণ শেখা জরুরি। সাধারণ কয়েকটি ব্যাকরণগতি নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। ক্রিয়াপদ ক্ষেত্রে মূল শব্দ রাজ্যের আগে বসে যেমন—

আমি না খেয়ে যাব না- বাংলা
মঁঞ ন খাঁঞএ নি জামঅ-কুড়মালি

'ঞ' 'ঁ', 'ন' নাসিক্য ধ্বনির প্রয়োগ অধিক। একটি মাত্র 'স' ব্যবহৃত । যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয় না। যেমন, 'অক্ষয়' অকখয়। ভাষা বিজ্ঞানীদের স্মরণ করিয়ে দিই। এককালে প্রাচীন কুড়মালি ব্যবহৃত ছিল যা থেকে বিদ্যাপতি সেই শব্দকে সরাসরি শিষ্ট বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহার করেছেন—

'জতনে জতেক ধন পাপে বটোবলু'
—'মরণক' তুঅ পদ নায়'
'জাবত জনম হম'
'হাথ দরপণ মাথক ফুল'—

'থাথক, মাথক, হৃদয়ক, গীমক, দেহক, গেহক, পাখীক, মীনক, 'কহ তুঁহ মোয়' দেখা গিয়েছে, এখন লেখ্য কুড়মালির ৭০ শতাংশ শব্দের শেষে 'ক' ধ্বনির যোগ। বিদ্যাপতি প্রায় সবকটি পদেই এই ভাষা শব্দকে ব্যবহার করেছে। ভাষাবিদরা 'মাঘি' ও 'ব্রজবুলি' ভাষার সাথে একে তালগোল পাকালেও এটি ছিল প্রাচীন কুড়মালি কথ্য ও লেখ্য ভাষা হওয়ায় তা এখনও ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। যে জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতি নেই, তাদের ভাষা একদিন অবলুপ্ত হতে বাধ্য। যাঁরা বিদ্যাপতির পদ বা চর্যাপদ পড়েইনি, অথচ ভাষা শব্দে তা ব্যবহার করে ধরে রেখেছে, তাঁরাই কুড়মি-মাহাত। তাই তাদের ভাষা কুড়মালি।

এবারে ঢুকি সংস্কৃতির কথায়। কুড়মিদের সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, (১) জীবন চক্র, (২) সামাজিক ও ধর্মীয়। বাংলায় প্রবাদ আছে, জন্ম, মৃত্যু বিয়ে। তিন বিধাতা নিয়ে। কুড়মিদের ক্ষেত্রে হবে নিজ নেগাচার নিয়ে। শিশু জন্মালে তা হয় ছুইত ঘর। সম্প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প দ্ধতির আগে সন্তান সম্ভবাদের একটি কাপড়ের ঘেরায় বয়জ্যৈষ্ঠ কাকি, জেঠি, দিদিমারা প্রসবের সময় সহযোগী থাকতেন। প্রসবের পর ধাই বুড়ি বাঁশের ছিলা দিয়ে পটা কেটে রহিন মাটি (ছঁচ মাটি) লাগিয়ে দিত। নত্তা হল নয় দিনের মাথায় স্নান সেরে কাপচোপড় কেচে পরিসুস্থ হত। এক্ষেত্রে ডাক পড়ে 'মানা' বা নাপিত ধবা ঝুড়ির। ভোজে ধাই বুড়িও ডাক পান। গ্রাম বা পাড়াকে আমন্ত্রণ করলে বাড়ির মহিলারাই অনুষ্ঠানে যায়। মান বা আলতি পাতা বিছিয়ে সের, মানের (পরিমাপের জিনিস) চাল নিয়ে যাওয়াই হল উপহার। বিয়ে বা বিহা নিয়মটা অবশ্য অনেকেরই জানা। নিজস্ব রীতিতে ষোলটা সাগুল বা নিয়ম মানতে হয়। বরদেখা, টাকা বইসা, আমলো বা আমবিহা, (কনের ক্ষেত্রে মহুল) কাঁখনা বাঁধা, সিন্‌ই, শালা ধুতি বদল, বিহা, রুশইনা, ছাতাধরা, যাঁতিলুকা, বাঁধাপণ, লোগদিন, ঘুরাফেরা এরকম। এই মর্মে লেখকের 'ষোল সগুনে বিহা' নামের একটি পুস্তিকা রয়েছে। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বিষয়টি মেনে চলতে পারে।

ব্যক্তির মৃত্যু হলে গ্রামের প্রবীণ ব্যাক্তিরা পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। খবর দেওয়া হয় সেই ধোপা-নাপিতদের। মৃতদেহকে বাইরে বের করে খাটিয়ায় রাখা হয়। পোয়ার উপরে কাপাস তুলো রেখে চার পায়ার মাথায় কুড়ুল দিয়ে হাল্কা চোট দেওয়া হয়। স্বামী হারা মহিলার শাঁখা ওই পুয়ায় হাত রেখে নাপিত ভেঙে দেন। প্রসঙ্গত, কারুর অকাল মৃত্যু ঘটলে, তাঁর উপযুক্ত ভাই কাকা-জ্যেঠা বা ভাগারির কেউ থাকলে সেখানে হাজির থাকবে। নাপিত শাঁখা ভাঙতে উদ্যত হলে সেই ভাই এগিয়ে এসে ওই বউকে বিধবা হতে না দিয়ে পুনরায় তাঁর দায়িত্ব নেয়। সেই শাঁখা সবার সামনে খুলে পুনরায় পরিয়ে দেয় এবং বৌ এর মাথার সিঁদুর আঁগুলে লাগিয়ে পুনরায় ঘষে বলে, আমি এর সঁগ হলাম। যার পরিবর্তিত রূপ সাঁঘা (পুং)। যদিও সাঁঘা নিয়ে মতান্তর আছে। শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানোর পর, গ্রামের মহিলারা দলবদ্ধভাবে রোদন করে ঘাট সিনাতে যায়। পুরুষেরা পরে যায়। ফেরার পথে কাঁটা জাতীয় বেল কুল ডাল পথে বিছিয়ে তার উপর হাল্কা পা দিয়ে আসতে হয়। সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বোল তোলা হয়, 'ঘেরি বেইল ঘেরি' অর্থাৎ এর পরে বেল গাছকে ঘিরেতে হবে যা কাঁটা ডাল ভাঙাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ভিন্ন সংস্কৃতির দাপটে সেই বোল 'হরিবোল

হরি' তে রূপান্তরিত হয়। এর পর কুলহি মাথানির জইড় গাছের সাথে কল আঁকুড় করে সে গাছের টুকরো ছাল মুখে নিয়ে ঘরে ফিরবে। এতক্ষণে ঘরের বউয়ের। একটা মালসায় আগুন আনগায় রাখবে। ব্যক্তি মালসাটিকে উপুড় করে তার উপরে পা ধুবে। এটাকে বলে 'নিমছা'। ঘাট শ্রাদ্ধ নিজেরাই করে থাকে। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরাই আঠিকুঠি দেখিয়ে দেয়। সংস্কার আছে জন্মাবার সময় বা নত্তা ঘরে ঝইড়া বা বৃষ্টি হলে, ওই ব্যক্তির বিবাহ ও মৃত্যুর সময়ও বৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে 'ঝইঢ়াহা' বলা হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতিগুলির মধ্যে প্রধান করম, বাঁদনা ও আইখান এই তিনটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি।

* **করম :** কুড়মালি সংস্কৃতির ধর্ম ও কর্মের আদি উৎস হল করম পূজা ও পরব। সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাওয়া। 'জাওয়া' হল অঙ্কুরিত শষ্যের মন্ডপ। এই সংস্কৃতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ১৪ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দের গান। যা আদিকালেই আবিষ্কার করেছে কুড়মি সমাজ। যেমন:-

অকালে পুসিলি পাখি দুধু ভাতু দিঁঞে = ১৪
আইজ পাখি তুঁই হামকে ফাঁকি দিলি = ১৪

যাঁরা কুড়মিদের বেশীরভাগ সংস্কৃতিকেই কৃষি উৎসব বলে দায় সেরেছে, তাদের পক্ষে আমি নয়। টুসু হলেও কৃষি। বাঁদনা হলেও কৃষি। করম হলেও কৃষি। অকুড়মিদের কিছু বই পড়ে সহজ ব্যাখ্যায় এরা অভ্যস্ত। সংস্কৃতির সরজমিনে পা না রেখেই মনগোড়া যুক্তি দিতে অভ্যস্ত। মনে রাখতে হবে, আদিকালে এই সমাজ ব্যবস্থায় পৃথক পাঠশালা বা গুরুগৃহ ছিল না, তাই এই করম পরবেই শিশু কিশোরদের ধর্মে-কর্মে মহান হওয়া শেখানো হত। জাওয়া পাঁচ-সাতদিন আগে দেওয়া হত। 'সৃষ্টি' মাহাত্ম নিজ কর্মে শিখে নিত কঁচিকাঁচারা। তা সুরক্ষিত করার জন্য বেড়া বা অবলম্বন তাও বেড়া নাচের মাধ্যমে করা হয়। বার বা উপোস একটি শরীর গঠনের পদ্ধতি। তাই ভাদ্র মাসের একাদশীতে সেই জাওয়াকে তারা করম পুজো স্থলে নিয়ে যায়। 'বার' এ থাকা উপাসকেরা 'পরবতী' নামেও আখ্যা পায়। সারাদিন উপোসে থেকে নদী বা জলাশয়ে স্নান সেরে সেরে সেখানে ঝিঙে পাতার উপর শাল দাতুনের টুকরো নৈবেদ্য রাখা হয়। প্রকৃতি বা সূর্যকে এই বলে প্রণাম করা হয়। 'লে রে তেল নেহরি'। 'নেহর' অর্থে দন্ডবৎ। শিশু মন শিখে গেল যে স্নানের সময় প্রকৃতিকে দন্ডবৎ জানানো নিয়ম। সাঁঝের আগে বড়দের কাজ পড়ে। নতুন বস্ত্র পরিধানে লায়াকে কাঁধে চাপিয়ে করম গাছের ডাল কাটতে যাওয়া হয়।

গান

‘করম ডাল কাইটতে গেলি
করম ছলমল
রাজার বেটা বাহিরাঁএছে
টাঙ্গি ঝল মল
সরু সুতায় বাঁধব নেহরি রে
মটা সুতায় বাঁধব পানডোরি রে’

করম পরবের লায়ায় পূজারি। মন্ত্র নেই। লায়ার পাশে বসে উপাসকদের বৃহৎ করম কহনি’ শোনানো হয়। এই কহনি ‘গীতা’র আদি রূপ। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে গীতায় ধর্মবাণী শোনাচ্ছেন, তেমনি। করম কহনির দুই চরিত্রের নাম তাই করমু ও ধরমু। একদিকে সৃষ্টি বা সৃজন, পাশে প্রকৃতির পুজো, বৃক্ষ পূজো, শেষে ধর্মও কর্ম কি তার সবটুকুই শেখানো হয় এই করমে। পরের সকালে পাহ্না (১১ বা ১৩ রকমের সব্জি বিনা নুন ওতেল বিহীন তরকারি ও বাসি ভাত) উপাসকদের সাথে ঘরের বড় বা ছোট যিনি ‘ডালি’ গাড়বেন, তিনিও পাহ্না খাবেন। এই পর্বে তিন চেঙা বিশিষ্ট ধানের চারাকে ঘরে এনে পুজো করা হয়। চারাটিকে পূর্বস্থানে ফের বসিয়ে দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে পরে এই ধান গাছটিকেই ‘ঠাকুর আনা’ তে এনে খামার বা মাচায় পুজো করে রেখে দেওয়া হয়। ‘ডালি গাড়া’ -র পিছনে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ‘গণতন্ত্রের’ জন্ম দেওয়া হয়েছে। ডালির ভাগ রয়েছে, আঁখ দুয়ারে কাইলা ভেলা, গোবর গাঢ়ায় কেঁদ, কুল্হি মুঢ়ায় শাল, জমিতে পড়াশি ডাল পোঁতা হয়। সে সময় মাহাত ঘরেই করম ডাল গাড়া হত। একেই বাড়িতে ডাল গাড়া নিয়ে সবার অসন্তোষ যাতে না হয়, অর্থাৎ যার ঘরের ডালি বেঁচে উঠবে, সে খবর লায়াকে জানাতে হবে। পরের বছর তাঁর ঘরে করম ডাল পুজো হবে। এটাই গণতন্ত্র।

* **বাঁদনা :** ইতিমধ্যে বাঁদনা নিয়ে বহু তথ্য অনেকেই উপলব্ধি করেছে। পশুদেরকে ও যে মাতৃজ্ঞানে পুজো করা যায় তা আদিকালে শিখিয়েছে কুড়মিদের বাঁদনা পরব। ব্রাহ্মণ্যবাদ একে ‘কপিলা মঙ্গল’ বলে দিয়েছে। কেননা এর গুঢ় রহস্য ও গভীর। ডালি গাড়ার মত, এখানেও গণতন্ত্র কে মান্য তা দেওয়া হয়েছে। ঘর জাগা বা ঝাঁগড় বা ধেঙোয়া কার বাড়ি থেকে শুরু হবে! তা নিয়ে একটি আচার রয়েছে, বিকেলে সবার গরুকে একটি মাঠে একত্রিত করা হয়, লায়া একটি গোবরের গোলার উপর একটি ডিম স্থাপন করে, পুজো করে, নির্দিষ্ট আঁক বা চিত্র দিয়ে। তিনটি আঁক হল মাটি, সৃষ্টি,

প্রকৃতি যা আধুনিক পরিভাষায় সত্য, শিব সুন্দর বা সত্যমেব জয়তে। যার গরু ডিমটি ভাঙবে, সে কাঁদে চাপিয়ে লায়াকে ঘরে আনবে। দেওয়া হবে নতুন ধুতি গেঞ্জি, হলুদ জলে তার পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। এই ঘর থেকেই শুরু হবে ধাঁগড় বা ঘর জাগা। অহিরা অর্থে বাগাল, সওয়ার বা নিয়ন্ত্রক। তাদের সম্বোধন ও সম্মান জানিয়ে বাঁদনা গীত হয়। তাই এর ভিন্ন নাম অহিরা গীত। এই পর্বে ডহরিয়া ও অহিরা দু ধরণের গান হয়। ব্যাখ্যাকারীরা 'বাঁদনা'র মানে খুঁজতে হিমসিম। কেউ বলছে, বন্দনা থেকে, কেউ বলছে বন্ধন থেকে। আসলে প্রথমে শব্দটি ছিল বাঁদ ন (যেমন উঠ ন, বইস ন, এরকম) অর্থে মেলবন্ধন। দলমত নির্বিশেষে সম্প্রতীতে এক সুতায় বাঁধা। গরু খুঁটানোর আদিরুপ ছিল ডাহিরা খেলা। একটি ডাহিতে ভাল শক্ত কাঠের ঘেরার ভিতর একটি শুকর ছেড়ে দেওয়া হত। প্রতি ঘরে একটি করে ষাঁড় বা বয়ার গরু রাখা হত। এই গরুদের চাষের কাজে লাগানো হত না। বাঁদনার সময় কার গরু কত লড়াকু তা প্রমানের জন্য এই খেলার আয়োজন। এর কারণ হল গ্রামগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বন্য হিংস্র পশুরা যখন তখন ঘরের পশুদের খামচে নিয়ে যেত। সমাজ দেখল, মানুষের পক্ষে মোকাবিলা সম্ভব নয়, পশু দিয়ে পশু মোকাবিলা করতে হবে। তাই প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটি মোকাবিলার জন্য বয়ার গরু রাখা হত। যার পরিবর্তিত রুপ চামড়া দিয়ে গরু খেলানো বা গরু খুঁটান।

*** টুসু পরব বা আইখান :** টুসু পরব নিয়ে ভুরিভুরি বিশ্লেষণ সামনে এসেছে। কেউ বলেছে লক্ষ্মী কেউ বলেছে কৃষি দেবী। টুসু মোটেই আমোদ প্রমোদের উৎসব নয়। এটি বিয়োগান্ত পরব। অন্তত এর সংস্কৃতি তারই প্রমাণ দেয়। মনে রাখতে হবে আদিজনজাতি কুড়মিরা কোনও কালেই মূর্ত্তি পূজায় বিশ্বাসী নয়। এরা টোটেমিক। তা হলে টুসুর মূর্ত্তির পূজা করবে কেন! প্রাচীন কালে টুসুর কোনও মূর্ত্তি ছিল না। একটি মাটির গোল্লাকে ভাসিয়ে দেওয়া হত। মনগোড়া গল্পে বলা হয় টুসু সুন্দরী রাজকন্যা ছিল। ভিন দেশের রাজা জোর করে বিয়ে করতে চাইলে টুসু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ডাহা মিথ্যে কথা, এ যাবৎ গবেষকরা সেই সময়কাল, কোথাকার রাজা, আক্রমনকারী রাজার নাম কিছুই খুঁজে পায়নি। এই গল্প 'লোরচন্দ্রানী বা 'সতী ময়না' থেকে নেওয়া হয়েছে। এবার সংস্কৃতির সাথে মেলানো যেতে পারে। টুসু পরবেই 'ডুমু' পিঠা হয়। 'ডুমু' মানে গর্ভ। 'ডুমকি' অর্থে গর্ভবতী। শব্দের থেকে যদি খুঁজি তুঁষ থেকে টুসু! ছিটা বেড়া ঘর বানানোর সময় মাটির গোল্লা যাতে না ফাটে তার জন্য আগড়া মেশানো হয়। আগড়া আর তুঁষ এক নয়। তুঁষ হল ভুঁসা। ঘর করার সময়

'থুইসে বা থুসে দে' বলে শব্দ ব্যবহার করা হয়। থুস থেকে টুসু না হওয়ার কারণ নেই। টুঅর বা যুবতী হওয়ার কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। মনে রাখতে হবে, 'টুসু' গান রামায়ণ পর্ব অতিক্রম করতে পারেনি। অনার্য রাবণের প্রতি সহানুভূতি গানে ধরা পড়েছে—

'রাবণ রাজা বড় রাজা
দেখবার বড় সখ ছিল
একশ টাকার পানের খিলি গো
আঁচলে শুখাই গেল'।

'টুসু বাংলার লোক উৎসব' তথ্যচিত্র এবং শারদীয়া কোল ফিল্ডাটাইমস এর প্রকাশিত 'জঙ্গল মহলের পৃথক ভাষা সংস্কৃতি' নিবন্ধে যা যুক্তি দিয়েছি, তারই পুনরাবৃত্তি দিলাম। এই ঘটনা পাওয়া যায় রামায়ণে। রাবণের শাসনে সবাই সমান। সামান্য প্রজারা কর দিবে অথচ মুনি-ঋষিরা দিবে না, তা হয় নাকি। রাজস্বের বদলে দুই মুনীর রক্ত সংগ্রহ করে রাবণ লুকিয়ে রেখেছিল। রাণীকে তা 'বিষ' বলে জানানো হয়। পাতাল জয়কালে আসা বিলম্ব দেখে, মরে গিয়েছে ভেবে রানী সেই 'বিষ' খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তা না হয়ে রানীর গর্ভধারণ হয়। রাবণ ও এসে পড়ে। স্বামী বিনা গর্ভ! সামাজিক লজ্জা নিবারণে রাণী অকালপিন্ড প্রসব করে। সূর্য ওঠার আগে নদীতে বিসর্জন দেয়। তখন ঘুম ভাঙাতে এলার্মের কাজ করেছিল মোরগ। রোদন করে মহিলারা সমবেত হয়ে ঘাট উঠতে যায়। আদিকালে টুসু পরবের ভিন্ন নাম ছিল ঘাটে ওঠা পরব। সেই মড়া কান্নাই আজকের টুসুর সুর। এখনো টুসু পরবের রাতে মায়েরা সন্তানের তল পায়ে রাতে তেল দিয়ে দেয়, অশুভ শক্তির দ্বারা আঁচ না পেতে। নদী ঘাটে এখনও পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরা হয়। সকালে প্রথমে তিল মিশ্রিত পিঠে খাওয়ার নিয়ম। আইখান হল বছরের প্রথম শুভদিন। আই (আগন্তুক) খ্যান (নির্ঘন্ট)। সবকিছুর সাথে এই সংস্কৃতি ও বিবর্তিত। এই বর্ণনায় যে বিচার্য তা নয়, এই নিয়ে অন্যান্য যুক্তি ব্যাখ্যা থাকতেই পারে।

প্রসঙ্গত, আদিবাসীদের লুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপন্ন ভাষাকেন্দ্রের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুরে সমীক্ষার কাজ হয়। ১৫ ই আগষ্ট ২০১৯ থেকে ২৮ আগষ্ট তাঁরা প্রান্তিক এলাকার মুন্ডারী, কোড়া, লোধা, কুড়মালি, মাহালী ভাষার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপন্ন ভাষাকেন্দ্রের অধিকর্তা অধ্যাপক কৈলাশ চন্দ্র পট্টনায়েকের অধীনে থাকা সমীক্ষক ও

গবেষক দলটি এই লেখকের সহযোগী হিসেবে সঙ্গে নেয়। উপলব্ধি হয়, সাঁওতালি, মুন্ডারী, কোড়া ও মাহালী ভাষা শব্দ প্রায় এক। বলার ঢং আলাদা। কিঞ্চিৎ মৌলিক শব্দ আছে। যেমন তারা বলছে বালিস কে সিথান, এটি কুড়মালি থেকে গিয়েছে। মাথাসিথান অর্থে শোবার সময় মাথা তলায় যে কাপড় দেওয়া হয়, তা বালিস নাও হতে পারে। পায়ের নখ > জাঁগারামা, বাঁশ > মডি, কলাগাছ > কাইরা দারে, ডেহরা > দুয়ার, দাঁইতা > দাঁইতির, ধন্ন > ধন্না (মাহালী) গরু তাদের শব্দে ভিন্ন, তবে বকনা, বা দামড়ার ক্ষেত্রে বিকল্প শব্দ নেই। তখনই কুড়মালিকে বরঅ নিচ্ছে। মাহালীরাও আবার কুড়মিদের মত গরাম পুজো করে গাছের তলায় হাতি-ঘোড়া মূর্ত্তি দিয়ে। বিয়েতেও আম, মহুল গাছের সাথে বিয়ে প্রচলন আছে। তাই 'খেরোয়াল' বংশোদ্ভূত আদি জনজাতিরা বেশির ভাগই ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কুড়মি জনজাতির কাছে ঋণী বলে পরিস্কার ধরা পড়েছে।



সংস্কৃতি

কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতি

সৃষ্টিধর মাহাত

কুড়মি কৃষিজীবি আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ। এই জাতির জীবিকা চাষ অর্থাৎ কৃষিকাজ। এদের ভাষা-সংস্কৃতির নাম কুড়মালি। প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ইংরেজি ভাষা ইংরেজ জাতির কিন্তু এই ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীরও যোগাযোগের ভাষা। তেমনি কুড়মি জাতি যেহেতু ভারতবর্ষের আদিবাসী মূলবাসীদের মধ্যে অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সেই হেতু কুড়মালি ভাষাও সকলের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং কুড়মালি সংস্কৃতিও অনেকে পালন করেন ও মানেন। সেই কারণে কুড়মালি সংস্কৃতি একা কুড়মি জনগাষ্ঠীর এখন একার, এ কথা বলা ঠিক হবে না। কুড়মি জাতির পাশাপাশি বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অন্ত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কুড়মালি সংস্কৃতি বহন ও লালন করে চলেছেন।

আমরা সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বুঝে থাকি নাচ-গীত, পূজা-পার্বন ইত্যাদিকে। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র এইগুলিকেই বোঝায় না। কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বলতে তার ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শণ, ইতিহাস, সমাজ-সামাজিকতা, খাদ্যাভাষ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ী-ঘর, নৃত্য-গীত, খেলা-ধূলা, পূজা-পার্বন, পালাপার্বন সবকিছুকেই বোঝায়। অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে একটি দেশ, জাতি কিংবা জনগোষ্ঠীর সমূহ জীবনের সামগ্রীক স্বরূপকেই বোঝায়।

কুড়মি জাতি, কুড়মালি যারা পালন করেন এদের সমাজ কাঠামো রহন-সহন, নেগ-নেগাচার, পূজা-পার্বন, পাল-পার্বন সবই কৃষিকাজকে সামনে রেখেই অর্থাৎ সবই কৃষিকেন্দ্রিক। কুড়মালি সংস্কৃতি কৃষি সংস্কৃতি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সংস্কৃতি সম্মিলিত এক সমন্বয়ের সংস্কৃতি। কৃষিকাজ কখনো একা হয় না। কৃষিকাজে চায় কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি যেগুলি বৃত্তিজীবি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সরবরাহ করে থাকেন। তাঁরা সকলে এই সংস্কৃতিরই মানুষ।

এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতি। পর্যালোচনা করলে জানা যায় কৃষি সভ্যতাটাই বুঝি কুড়মালি। এই বিষয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বিষয়টি অনেক বড়। এখানে কৃষি কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত সেইগুলিই আলোচনার প্রয়াস করবো। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে ঠিক প্রত্যক্ষ নয় অথচ না আলোচনা করলে ঠিক পূর্ণতা পাবে না। অপূর্ণ থেকে যাবে সেই কারণে বাড়তি মনে হলেও দরকারি কিছু বলে নিতে চাই।

*** কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির ইতিহাস:**

"জঁদে জঁদে পানিক সত,
তঁদে তঁদে কুড়মিক জট"

অর্থাৎ যেখানে যেখানে জলের সংস্থান বা বেশী বেশী করে জল পাওয়া যায় সেই স্থানে কুড়মিরা 'জট' বা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে থাকেন। কুড়মালি ডাকপুরুষের কথায় একথা জানা যায়। আবার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে বোঝা যায়-প্রাচীনকালে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থানে এক সিন্ধু সভ্যতা নামে সুমহান কৃষি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। জানা যায় সেখানে কৃষি জমিতে জল সেচনের জন্য বড় বড় বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল। পশুপালক যাযাবর এক অসভ্য বর্বর লুঠেরা এক মানব গোষ্ঠীর ধ্বংসলীলায় সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাঁধগুলিও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। জল সেচনের অভাবে জমি নিস্ফলা হয়ে গিয়েছিল। যারা পেরেছিল, মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কথা প্রায় সকলেরই জানা কথা। কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষ সিন্ধু সভ্যতারই মানুষ ছিলেন। কুড়মালি লোকগীত ও লোককথায় সেই ইতিহাসেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। কুড়মালি একটি জাওয়া গীতে দেখা যায়—

"খিলঅ ন খেতে দেওরা,
বকলি না চরে।
সেহঅ দেখি—
দেওরা চলঅ বিদেশে।।
তঁহি জে জাবে দেওরা,—
মালনচঅ দেশে।
হামরিকে দেওরা—

সঙে লে লে জাবে।।
হামরিঅ দেশে ভউজি,—
সিসিরঅ বহুতঅ।
ভিজি জাতঅ ভউজি,—
লহরা পাটরা।।
..........................”

সেই সময়কালে কৃষক নিজেদেরকে “খেরওয়াল” গোষ্ঠীর মানুষ বলে পরিচয় দিত এবং সমস্ত মানুষকেই বলা হত ‘হড়’। অনেকেই মনে করেন হড় > তুপা কথা থেকেই এসেছে হরপ্পা নাম। যেমন কুম > হড় = কুমহার, চাম > হড় = চামার, কাম > হড় = কামার ইত্যাদি ইত্যাদি।

*** কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষের ধর্ম :** কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির ধর্ম সারি তথা সত্য ধর্ম। যার প্রবক্তা মহাহড় বুঢ়াবাবা শিব। তিনি অলৌকিক ছিলেন না। তিনি রক্ত মাংসে গড়া এই সমাজেরই মানুষ ছিলেন। এই ধর্মের সার কথা—যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। উপকারীর উপকার স্বীকার করাই ধর্ম। অন্যের ক্ষতি না করে সৎভাবে নির্ভয়ে কর্ম-সাধনার দ্বারা জীবন-যাপন করাই ধর্ম। অসহায়, দুস্থ, বিপদ গ্রস্থ মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা ও সেবা করাই ধর্ম। এই ধর্ম বস্তুবাদী, যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত। এখানে কল্পনা, অবাস্তবতা, নকল বা মিথ্যার কোন স্থান নেই। স্বর্গ, নরক, পাপ, পূণ্য, ভাগ্য পূর্ব জন্ম, পর জন্ম বলে কিছু নেই। এই সংসারেই স্বর্গ ও নরক আলাদা কোন যায়গার অস্তিত্ব নেই। বংশধারার মধ্যে সেই বেঁচে থাকা।

পূর্ব পুরুষ, বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষ সৎব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এছাড়াও সত্যবাদী, সদাচারী, সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবাদী, কর্মনিষ্ঠ, সৃজনশীল হওয়া, সামাজিক দায়দায়িত্ব প্রতিপালনই ধর্ম। লোভ, চাপ কিম্বা মোহে পড়ে কালে কালে অনেকেই নিজেদের ধর্ম ভুলে গেছেন কথায় বলে ধর্ম ভুলিলে দেবতা ভুলিলে বিপদ আসে। কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষ সত্যিই বিপদ গ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। নিজস্ব আদিবাসী ধর্ম ছেড়ে জল অচল বর্ণ হিন্দু হয়ে ন ঘরকা, না ঘাটকা হয়ে পড়েছেন।

কষি সংস্কৃতিতে কুড়মালি ভাষা : ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি কুড়মালি সংস্কৃতি কৃষি সংস্কৃতি অথবা কৃষি সংস্কৃতিই কুড়মালি। এর নিজস্ব শব্দ ভান্ডার আছে। আছে বৃহৎ সাহিত্য ভান্ডার। ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। আছে নিজস্ব লিপি। সরাসরি কৃষিকাজে

ব্যবহৃত কিছু কুড়মালি শব্দের উদাহরণ হিসাবে নীচে দেওয়া হল। তাতে করে কুড়মালি শব্দ ভান্ডার বোঝা যাবে।

*** লাঙ্গলে ব্যবহৃত এক একটি অংশের নাম:-**

১। হাল — লাঙ্গল।

২। ফাল — লৌহ নির্মিত লাঙ্গলের ফলা।

৩। পাসি— লাঙ্গলের ফলাকে আটকে রাখার জন্য লৌহ নির্মিত দুই প্রান্ত বাঁকানো পেরেক বিশেষ।

৪। ঈস্— লাঙ্গলের গায়ে লাগানো লম্বা দন্ড।

৫। বঁটা— লাঙ্গলের মাথায় লাগানো হাতল।

৬। পাট— লাঙ্গল থেকে ঈস্ না খুলে যায়, কোন প্রকারেই যেন না নড়ে সেইকারণে বিশেষ আকৃতিতে তৈরী একটি কাঠের খিল দেওয়া হয়।

৭। সুকধঁনি— লাঙ্গলের ঈসের শেষ প্রান্তে পিছনের অংশে আড়াআড়ি ভাবে একটি কাঠের তৈরী বড় লৌহার পেরেকের মত খিল ব্যবহার করা হয়। যাতে করে কোন অবস্থাতেই ঈস্ না নড়ে।

৮। জুঁয়াল— জোঁয়াল, লম্বা কাঠের দন্ড। যার দুই প্রান্তে গরু বা মহিষ জোতা হয়।

৯। সইল— গরু/মহিষকে লাঙ্গলে জোড়ার জন্য জোঁয়লে দুই প্রান্তের মাথায় লাগানো দন্ড বিশেষ।

১০। অঁদ— জোঁয়ালের মাঝ বরাবর ব্যবহৃত দড়ি। যেটি ঈস্ ও জোঁয়ালকে সংযুক্ত করে।

১১। জত্— ঈশ ও অঁদকে বাঁধার দড়ি বিশেষ।

১২। বেউনি—জোঁয়ালের প্রান্তে শইলের দড়ি। যেগুলি দিয়ে গরু/মহিষ জোড়া হয়।

*** গরুর গাড়ী কৃষিকাজের একটি অতি আবশ্যকীয় যন্ত্র। গরুর গাড়ীর এক একটি অংশের নামও কুড়মালি। যেমন:—**

১। পাই— চাকার মাঝের অংশ। দেড় হাত গোলায় এবং এক হাতের চাইতে কিছু কম (এক মুড়রা) লম্বা বিশিষ্ট কাঠের টুকরা।

২। আরা— পাইয়ের সাথে খিলানো দন্ডায়মান শক্ত কাষ্ঠ দন্ড।

৩। পঁঠা বা পাটি— আরার সঙ্গে জোড়ানো বিশেষ আকারে তৈরী কাঠের পাটা। যেগুলি খন্ড খন্ড যুক্ত করে গোলাকার আকৃতি তৈরী করা হয়ে থাকে।

৪। হাইল— চাকার চারপাশে বেড়া দেওয়া পুরু লোহার চাকতি বিশেষ।

৫। বঁদ— পাইয়ের মাথায় চারপাশ বেড়া দেওয়া পুরু লোহার চাকতি।

৬। উলা— পাইয়ের মোটা ছিদ্রের মুখে লাগানো বিশেষ আকৃতির লোহার বেয়ারিং।

৭। লিঘা— কাঠ বা লোহার তৈরী তিন/সাড়ে তিন হাত লম্বা দন্ড যেটি দুইটি চাকাকে যুক্ত করে এবং গাড়ীর বোঝার ভার সহ্য করে।

৮। উদল— ৯-১০ হাত লম্বা সোজা মোটা কাঠের দন্ড।

৯। ডংগী— লিঘার মাপে নালা তৈরী করা কাঠের দন্ড যেটি দুইটি চাকাকে সম দূরত্বে রাখতে বাধ্য করে।

১০। তেঁতলা—উদলের সঙ্গে যুক্ত মোটা কাষ্ঠ খন্ড দুই প্রান্ত উদলের সঙ্গে খিল দিয়া আঁটা। লিঘাকে শক্ত করে ধরে থাকতে সাহায্য করে।

১১। ঘৈড়া— উদলের সামনে ও পিছনের দুই প্রান্তে ছিদ্র করা কাঠের দন্ড যেটি সারিসুগাকে ধরে রাখে।

১২। কৈড়লা— উদলের দুইটি কাঠকে যুক্ত রাখার জন্য সামনের দিকে বিশেষ আকৃতিতে তৈরী করা খিলানের কাষ্ঠ খন্ড।

১৩। পাছা—উদলের পিছনের দিকে লাগানো দন্ড যা উদলকে সমান দূরত্বে রাখতে সাহায্য করে।

১৪। পাঁজরি— উদলের সঙ্গে যুক্ত এক ফুট অন্তর খিলানো কাঠের বা বাঁশের খন্ড।

১৫। বাতা— পাঁজরির উপর পাটাতনের মত বিছানো বাঁশ বা কাঠের খন্ড।

১৬। সারিসুগা— গাড়ীর উপরের জিনিস পত্র যাতে পড়ে না যায় সেই কারণে বাঁশ বা কাঠের খাঁজার মত তৈরী করা হয়।

১৭। শ্যৈল— জোঁয়ালের সামনে লাগানো কাঠ বা লোহার তৈরী এক ফুট লম্বা টুকরো যেগুলিতে গরু ও মহিষকে জোড়া হয়।

১৮। আল্‌হনি— মোটা লোহার জলুই-এর মত। যেগুলি লিঘার দুই প্রান্তের ছিদ্রে আটকানো থাকে। যাতে করে চাকা খুলে না যায়।

১৯। সুত্‌বই— গাড়ীকে দাঁড় করার পর সমান্তরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য দুইটি পরিমাপ মত কাঠের/ বাঁশের খন্ড দ্বারা তৈরী যা সামনে ঠেকানো থাকে।

২০। আড়াস্‌— ১২-১৪ হাত লম্বা সোজা মোটা কাঠ।

২১। বরহি— লম্বা মোটা দড়ি।

*** জমির এলাকা ভিত্তিক জমির নাম:-**

এক বিরাট ও বিস্তৃত অঞ্চলের জমি গুলির বেশীর ভাগ নাম কুড়মালি শব্দ জাত। প্রায় প্রতিটি গ্রামে জমির স্থানীয় নাম আলাদা আলাদা আছে। কিন্তু দেখা যায় বেশীর ভাগ নামই কুড়মালি অথবা কুড়মালি শব্দ জাত। নামগুলি বললেই গ্রামের যেকোন লোক সহজেই বুঝতে পারেন কোন এলাকাকে বলা হচ্ছে। আমাদের গ্রামের নাম জামবাদ। অনেক বড় মৌজা। পাঁচ পাঁচটি শীট বা নক্সা দ্বারা চিহ্নিত। উদাহরণ স্বরূপ আমার গ্রামের জমির স্থানীয় নাম নিম্নে উল্লেখ করলাম। যেমন:- ডাহিবাড়ী, খেড়হা কানালী, কুদরুম গড়া, কিয়াকচা, কিয়াবহাল, প্যনবাদ, ছোকাবহাল, হাবার হুবুর, উঁচবাল্যা,নাকটিকচা, হাঁসাবেড়া, ফুটলাহা, বুধার খাল, লটকাগড়া, সুয়্যাকানালী, খেন্‌নাগড়হা, পিঁপড়াপাটী, সুগড়িচাটানী,কাঙলাগাড়হা, কাঁজিহাড়হা, টুহুটু, লেপকানালী, চাপদ, শিরিশখাল, বুঢ়হাপড়া, ঘুরঘুর‍্যাবাইদ, লাকড়াখাল, ধিজ্জারকানালী, হুড়হুড়্যা, করমাচাটানী, জাহিরথান, কট্যাহার, গুঁদলুগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

*** দৈর্ঘ্য-প্রস্থর মাপ :**

দড়ি, কাঠ, গাছ, লতা-পাতা ইত্যাদি কৃষিকাজের জিনিস পত্রের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপের নামও কুড়মি শব্দ যা কুড়মালি শব্দ জাত শব্দ। যেমন:-

১। আঁগুল:— হাতের আঙ্গুল যতখানি মোটা সেই পরিমান মাপ।

২। পুয়া— হাত মুঠি করার পর বুড়ো আঁগুল উঁচু করে রেখে যে মাপ হয়।

৩। মুড়র‍্যা— হাতের আঁগুল মুঠি করে ধরার পর কনুই থেকে হাতের ওগা পর্যন্ত যে মাপ হয়।

৪। হাত— কনুই থেকে মধ্যমা আঁগুলের ওগা পর্যন্ত যে মাপ হয়।

৯। বেঁউ— দুই হাত প্রসারিত করে খেলে ধরার পর দুই হাতের মধ্যমা আঁগুলের আগা বরাবর যে মাপ হয়।

১০। সুপতি— পায়ের পাতার পুরো মাপ যতটুকু হয়।

১১। ডেগ— চলার সময় এক পায়ের থেকে অপর পায়ের যে দূরত্ব হয়।

*** উৎসব ও পাল-পার্বন :-**

(ক) আখাইন : কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষ সূর্যকে বিশ্বপিতা বলে মনে করেন ও মানেন। ১লা মাঘ সূর্যদেব মকরক্রান্তি ত্যাগ করে কর্কটক্রান্তিতে প্রবেশ করেন। যেহেতু সূর্যদেব ঐ দিন প্রথম কর্কটক্রান্তিতে প্রবেশ করেন সেই কারণে তাঁরা দিনটিকে কৃষিবর্ষের

সূচনার দিন "আখ্যান যাত্রা" বলে অবিহিত করেন। 'আখ্যান' কথার অর্থ সূচতনা ও 'যাত্রা' কথায় অর্থ শুভ বা পবিত্র। সূর্য ছাড়া কোন কিছুরই উৎপন্ন হয় না। ঐদিন তাঁরা সমস্ত কাজের সূচনা করেন। বিশ্বাস, ঐদিন কাজ আরম্ভ করলে কোন বিঘ্ন ঘটবে না। মনোমত ফল পাওয়া যাবে। কাজটি সম্পূর্ণ হবে।

আখ্যান যাত্রার দিনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল "হালপুন্হা" করা। অর্থাৎ কৃষক বৎসরের প্রথম দিনেই প্রথম হাল কর্ষণের কাজ সূচনা করবেন। ভোর থেকেই পরিবারের মা-বোনেরা প্রবল উৎসাহে আনন্দ সহকারে ঘর-আঙিনা-উঠান পরিস্কার করেন। গোবর জল লেপন করেন। দুয়ারে তুলসী তলায় আল্পনা এঁকে বাড়ীতে এক বিশুদ্ধ পবিত্র পরিবেশ তৈরী করে তোলেন।

কৃষক হাল-ফাল এনে, নূতন দড়ি দিয়ে নিজের হাতে গরু জুড়ে পূর্ব দিকে মুখ করে আড়াই পাক হাল চালাবেন। বাড়ীর গৃহিনী নূতন কুলায় ধান, দূর্বা ঘাস, প্রদীপ, সিঁদুর নিয়ে আসবেন। ঘটি ভর্ত্তি জল আনবেন। দূব-ধান দিয়ে গরুকে চুমাবেন। মাথায় সিঁদুরের টিপ এঁকে দিবেন। কুলার ধান খেতে দিবেন এবং ঘটির জলে গরুর পা ধুইয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী হাঁটু গেড়ে প্রণাম করবেন।

আখ্যান দিনেই কৃষক নিজ নিজ খামারে মুনই চড়ান। কৃষক স্নান করে এসে খামারের মাঝ বরাবর তিন দিক থেকে তিনটি শাল কাঠি পুঁতে উনানের মত তৈরী করেন। ঐ উনানের উপর কুমারের দেওয়া নুতন সরায় দুধ, গুড়, আতপ চাল রেখে উনানে চড়ান। নীচে আগুন করে দুধ-গুড়কে ফোটান। আঁচ পেয়ে আতব চাল ফুটে ওঠো। সরা ভরে যায়। দুধ-গুড় উপছে খামারে মাটিতে পড়ে। দুধ-গুড় দিয়ে ফোটানো চালকে বলা হয় "মুনই"। বিশ্বাস, মুনই উপছে পড়লে খামার ভরা ফসল হবে। ঐ মুনই দিয়ে "খামার বুড়হি" ও "সন্ন্যাসী" ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে গাঁজা-কলিকা দেওয়া হয়। ভোগ নিবেদন করে কৃষক দুধ ঢাল, জল ঢাল দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেন। দুই হাত জোড় করে খামার বুড়হি ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

"হালপুন্হ্যা" "মুনই" দেওয়া হয়ে গেলে গৃহকর্তী কৃষককে জল ঘটি হাতে দিয়ে খাবার খেতে আহ্বান জানান। কোঠাঘরে পিঁড়ি দিয়ে স্বামীকে কাঁসার থালায় দই, চিড়ে, গুড় সহযোগে খেতে দেন। ঐ খাবার শেষ করে খাবার নিয়ম নেই। কিছুটা রেখে দিতে হয়। খাওয়া হলে গেলে পরে গৃহিনী গামছা কিংবা নিজের আঁচলের কাপড় দিয়ে হাত-মুখ মুছে দেন।

আখ্যান দিনেই গাঁ গরাম, গুঁসাই রায়, জাহির মাঞ প্রভৃতি আদিবাসী লোক

দেব-দেবীর পূজা দেওয়ার দিন। চাষী পরিবারের লোকজন কাঁসার থালায় দুধ, ঘি, গুড়, ধূপ, দীপ, সিঁদুর, তুলসী পাতা পারলে কলাপাকা মিঠাই সাজিয়ে কুমোরের দেওয়া মাটির তৈরী নূতন হাতি ঘোড়া নিয়ে পূজার থানে যায়। লায়া পূজা করেন। এক একটি দেব-দেবীর জন্য আলাদা লায়াও থাকেন। যার যেমন মানত সেই মত পায়রা, মুরগী, পাঁঠা, ভেড়া পূজার জন্য দেওয়া হয়। পাঁঠা-ভেড়া পূজা দিলে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ার জন্য পাড়া প্রতিবেশী, ফুল-পরান, আত্মীয়-স্বজনদের ডাকা হয়। বছরের শুরুতে সখ্যতার আদান-প্রদানও হয়ে যায়। পরব দিনে খেয়ে খাইয়েই সুখ-আনন্দ। বিশ্বাস, দেব/দেবীদের হাতিঘোড়া দিলে ঐগুলিতে চেপে ঘুরে বেড়াবেন। গ্রামের ফসল, মানুষজন, পশুপাখীদের রক্ষা করবেন। বাইরের কোন খারাপ কিছুকেই গাঁয়ের সীমানায় ঢুকতে দিবেন না।

(খ) শিবের গাঁজন-চড়ক পূজা:- শিব পূজা সরাসরি কৃষির সঙ্গে যুক্ত না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন ও মেনে চলেন। তাঁরা মনে করেন শিব ঠাকুর তাঁদের ঘরের লোক। তিনি সঠিকভাবে প্রথম কৃষি কাজ চালু করেন। তিনি তাঁদের আদি গুরু-ধরম গুরু। সেই কারণে এই সংস্কৃতির মানুষ শিবকে নাম ধরে ডাকেন না। জেঠা, বাবা, ঠাকুরদাদাকে যেমন কেউ নাম ধরে ডাকে না। বিশ্বাস, নাম ধরে ডাকলে তাকে ঘোরতর অসম্মান ও অমান করার সামিল হয়ে যায়। বাবার বাবাকে যেমন ঠাকুরদাদা বলে ডাকতে হয় অন্যথা করা চলে না, তেমনি শিব ঠাকুরের নাম না করে ডাকা হয়—"বুঢ়াবাবা" বলে।

শিব পূজা বৎসরের চৈত্র সংক্রান্তি আরম্ভ হয়। এই পূজা পরব চার দিন ব্যাপি চলে। ফলহার, জাগরণ, ভগতাঘুরা তেলহল্‌দ্যা এই চার দিনের নেগ-নেগাচার ভিন্ন ভিন্ন কৃষক ও কৃষিকেন্দ্রিক "হড় মিতান" মানুষ এই উৎসবে সকলে মেতে ওঠেন। লোকে বলে- গাঁয়ের পরব। চৈত্র সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হলেও প্রতি গ্রামে আলাদা আলাদা দিন ধরেও এই উৎসব পালন করেন। প্রতি গ্রামে বুঢ়াবাবা শিবের মড়প (মন্ডপ) আছে। প্রচন্ড গরমের দিনে উপবাস, ভগতাফুড়া (বান ফোড়া), ছৌ নাচ, কাপ-ঝাঁপ, ভগতাঘুরা ইত্যাদি কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে চাষী নিজের শরীরকে বর্ষার দিনে চাষ করার জন্য কষ্ট সহিষ্ণু এমনকি সবরকম বাধা সহ্য করার মত তৈরী করার ক্ষমতা অর্জন করেন। উৎসবের মূল উদ্দেশ্য কৃষিদেবতা শিবকে সন্তুষ্ট করা। বিশ্বাস, কৃষি দেবতা সন্তুষ্ট হলে তার অনুগ্রহ লাভ করলে চাষ ভাল হবে। পরিবার পরিজন সুখে খেয়ে পরে হেসে খেলে বছর পার করতে পারবে। কোনরূপ অসুবিধা থাকবে না। ঢাকের তালে

হড়-মিতান কৃষি সখ্যতার গীত গেয়ে, গায়ে ধূলা মেখে, একে অপরের গলা জড়াজড়ি করে বলেন—

"তেল মাখা মাখি,
হল্যদ মাখা মাখি।
চৈত পরব ফুরাঞ গেল হে গঙ্গাজল
এই দেখাদেখি।"

(গ) রহিন :- কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষের কাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ দিন বড় গুরুত্বপূর্ণ দিন, অতীব পবিত্র দিন। ঐদিন রহিন পরব। জ্যৈষ্ঠের বার দিনে বারণি আর তেরো দিনে রহিনী। বারণির দিন "বার" বা প্রস্তুতির দিন। ঐ দিন রোহিন দিনের দরকারী জিনিসপত্র সব জোগাড় করে রাখা হয়।

রহিনের দিন ভোরবেলা মা-বউয়েরা বসতবাড়ীর বাইরের চারদিকে দেওয়ালে গোবর দিয়ে দাগ বা দন্ডি এঁকে দেয়। বিশ্বাস দন্ডির দাগ পেরিয়ে পরিবারের ক্ষতিকারক কোন কিছুই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। সারা বছর নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে পরিবার পরিজন সুখে থাকবে। কোনোরূপ অন্যথা হবে না।

রহিন দিনে সকাল থেকে মা-বোনোরা আনন্দিত মনে ঘর-দুয়ার, উঠান-আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে গোবর গোলা জল দিয়ে নিকিয়ে লেপে বাড়ীর পরিবেশ বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেয়। এমনিতেই আঙিনা উঠানে গোবর দিলেই একটা উৎসব উৎসব মনে হয়। বাড়ীতে সংগ্রহ করে রাখা রহিন ফল সকলে ভাগ করে খায়। বিশ্বাস রহিন ফল খেলে বিষাক্ত কীট, সাপে কাটলে বা দংশন করলে তাদের বিষ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ঐদিন "বীজ পুন্হ্যা" করার দিন। কৃষক স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে ভিজে কাপড়ে প্রথমে একটি গুঁড়ি গাবানো ডুভা (কাঁসার তৈরী বড় বাটি) নিয়ে তার ভিতরে কিছু বীজ ধান রেখে বাটিটি নূতন কাপড়ে ঢেকে তুলসী থানের আল্পনা দেওয়া স্থানে রাখেন। বাটির গায়ে তিনটি সিঁদুরের দাগ কাটেন। পূর্ব পুরুষ ও দেব-দেবীর স্মরণ নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে ঐ বাটিটি মাথায় তুলে নেন। হাতে ফাল অথবা লোহার টুকরা নিয়ে আঁক দুয়ার দিয়ে যেখানে বীজতলা তৈরী করা আছে তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে কারো সাথে কথা বলা চলে না। নীরবে একিন মনে চলতে থাকেন। বীজতলায় পৌঁছে আড়াই মুঠি ধান ফেলে মাটি চাপা দিয়ে যেভাবে গিয়েছিলেন সেইভাবেই বাড়ীতে ফিরে আসেন। ঐদিন থেকে বীজ তলায় চারাও ফেলা হয়। তেরোহ

জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৯ শে রহিন। ২০ জ্যৈষ্ঠ একবেলা চাষীর মাগন অনুসারে রহিন বতর। কথা আছে কপাল টলে যে রহিন টলে না। অর্থাৎ চারা ভাল হয়। নিরোগ ও পুরষ্ঠ চারা হয়। ঐ চারার ধানে কখনো রোগ পোকা আক্রমন করে না।

রহিনের পর সাত দিন ডা। ডা চলাকালীন কোন বীজ চারার জন্য ফেলা নিষেধ। ডাহের সাত দিন পর কেতকী বতর। ঐ সময় জমি সরস হয়। চাষী সমস্ত বীজ ফেলে শেষ করেন। কেতকী থাকে সাত দিন। রহিন দিনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাড়ীতে 'রহিন মাটি' আনা। প্রতিটি পরিবার থেকে একজন গৃহবধূ রহিন মাটি নিয়ে আসে। স্নান করে ভিজে কাপড়ে একটি টুঁকি অথবা ঝুড়িতে করে মাটি নিয়ে আসে। টুঁকি বা ঝুড়িতে একটি ছোট লোহার টুকরা দিয়ে দেয়। যাতে করে কোন অশুভ দৃষ্টি না লাগে। মাথায় তুলে মাটি আনবার সময় কোন কথা বলা চলবে না। এমনকি দাঁত বার করে হাঁসাও চলবে না।

ছেলের দল হাঁসাবার জন্য নানা রূপ সাজ করে, বিভিন্ন কায়দায় অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য করে। যদি হাঁসাতে কিম্বা কথা বলাতে পারে তাহলে মাথার মাটি ফেলে আবার স্নান করে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে। কুড়মালি কৃষি মানুষের কাছে মাটি অতি পবিত্র ও অমূল্য জিনিস। মা ও মাটি সমান গুরুত্ব পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের অধিক মাটিকে গণ্য করেন। জনমে-মরণে মাটি। মাটি ছাড়া গতি নাই। অবহেলে তাঁরা মাটির জন্য জীবন পাত করতেও সদাই প্রস্তুত থাকেন। মায়েরা মাঠ থেকে যে রহিন মাটি নিয়ে আসে তা অতীব পবিত্র। ঐ মাটি তুলসী মঞ্চে ঘরের প্রতিটি চৌকাঠে, প্রতিটি ঘরের কোণার চালে রহিন মাটি রেখে দেওয়া হয়। খামারে এবং যে যে স্থানে শস্য সংগ্রহ করা থাকে প্রতিটিতেই রহিন মাটি মাটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই মাটির শক্তি অনেক। বিষ নাশ করে, উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। নানান অসুখ-বিসুখের কাজে, শুভ কাজে রহিন মাটি ব্যবহার করা হয়। মাংস ও অন্যান্য পিঠে করা হয়। বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে খাওয়ানোর চল আছে।

*** অম্বুবাচী :** সাতই আষাঢ় অম্বুবাচী। কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির লোক বিশ্বাস করেন এইদিন বসমতা মা বা পৃথিবীর রজঃস্বলার দিন। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন এই দিন পৃথিবীর জন্ম দিন। দিনটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ দিন। অম্বুবাচীর দিন মাটিতে লাঙ্গল দেওয়া এমনকি মাটিতে আঁচড় কাটাও যাবে না। সমস্ত কৃষিকাজ বন্ধ। কৃষি যন্ত্রপাতি সকল কাঠ বা পাথরের উপর মাটি ছাড়া করে রাখতে হয়।

চাষী পরিবারের সকলে আম, দুধ মিশিয়ে চিড়ে ভক্ষণ করে। বিশ্বাস, আগামী

বর্ষায় পেটের অসুখ, সাপ,পোকা-মাকড়ের কামড় শরীরের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পেটের রোগ থেকে শরীর মুক্ত থাকবে। ক্ষেতে ধান রোপন করার মত ততদিনে বীজতলা তৈরী হয়ে যায়। এরপর থেকেই ধান রোপনের কাজ আরম্ভ করা বসতে পারে। চাষের আগে চাষের উপকারী দেব-দেবীদের সকলকে ঐদিন পাঁঠা, ভেড়া, মুরগী, পায়রা যার যেমন সামর্থ্য সেই অনুসারে পূজা দিতে হয়। দেব-দেবীর সন্তুষ্ট না করে ধান চাষের অনুমতি না নিয়ে কখনই চাষ আরম্ভ করা যাবে না।

*** পাঁচ আঁটি :** কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষের কাছে ‘পাঁচ আঁটি’ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিটি কৃষি পরিবার অম্বুবাচীর পর প্রথম যেদিন ধান্য রোপনের কাজ আরম্ভ করে সেই দিন পাঁচ আঁটি করা হয়ে থাকে। কৃষক গৃহিনী ঐদিন স্নান করে ভিজে কাপড়ে কাঁসার থালায় অথবা কূলাতে দূর্বাঘাস, ধান, সিঁদুর ইত্যাদি সাজিয়ে ক্ষেতের বীজতলা সাজায়। তারপর পূর্ব দিকে মুখ করে ঐ আঁটি গুলিতে প্রত্যেকটিকে তিনটি করে সিঁদুরের দাগ দিয়ে দেন। এই সমূহ কাজকে পাঁচ আঁটি বলা হয়। গৃহকর্ত্রীর পাঁচ আঁটি করা সম্পূর্ণ হলে পর অন্যান্য লোকজন ক্ষেতে ধান লাগার কাজ শুরু করতে পারে।

*** জাওয়া-করম :** জাওয়া-করম উৎসব বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম হওয়া আবিষ্কার ও কৃষিকাজের প্রথম সূচনাকে স্মরণ করার উৎসব। স্মরণাতীতকালে কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির কুমারী মেয়েরা এই উৎসব ও ব্রত পালন করে আসছে। অতীত প্রাচীন কালে মেয়েরা খেলার জন্য সংগৃহীত বীজ পরের দিন খেলার জন্য বালিতে পুঁতে রেখেছিল। কোন কারণে ঐ বীজ বালির তলায় পুঁতা অবস্থায় থেকেই যায়। পরিমান মত জল, আলো, উত্তাপ পেয়ে কয়েক দিন পরে ঐ বীজ আপনা আপনি অঙ্কুরিত হয়ে যায়। কৌতুলী মেয়েরা প্রকৃতির এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখে খেলার ছলে বড়দের অগোচরে অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখেছিল যখন তারা এই অতি অদ্ভূত রহস্যের সঠিক আবিষ্কারের নির্ভূল সকল পথ খুঁজে পেয়েছিল তখন মনের হাত ধরাধরি, গলায় জড়াজড়ি হয়ে নৃত্য করেছিল। গীত রচনা করে গেয়েছিল। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম একাদশীর দিনের সাত কিম্বা নয় দিন পূর্বে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বাঁশের তৈরী ছোট ঝুড়িতে ভিজে বালিতে নয় রকমের শষ্য দানা ছড়ায়। একে জাওয়া পাতা বলা হয়। কুড়মালি “জওয়া’ কথা থেকে এসেছে জাওয়া। জওয়া কথার অর্থ জন্ম বা পুনঃর্জন্ম।

জাওয়া পাতাকে এককথায় কৃষি গবেষণাগার বলা যেতে পারে। বীজ পরীক্ষা করে দেখা হয় কোন বীজ সঠিক আছে। যেগুলি থেকে অঙ্কুর বার হবে। কৃষিকাজে

ওইগুলিই ব্যবহারের যোগ্য হতে পারে।

পরবর্তীকালে জাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে "করম"। মহাহড় শিব যাকে বলা হয় "বুঢ়াবাবা"। তিনি সঠিক কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং কৃষিকাজের সূচনা করেন। পুরুষ শক্তি ও নারী শক্তির (প্রকৃতি শক্তি) মিলনের ফলে যে কোন জীবের সৃষ্টি বা জন্ম হয়। সূর্য পুরুষ শক্তি ও পৃথিবী প্রকৃতি বা নারী শক্তি। সূর্য ও পৃথিবীর মিলনের ফলে সমস্ত ফসল উৎপন্ন হয়। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার জন্য সূর্য ও পৃথিবীর মিলনের পূজা করম পূজা করা হয়। সূর্য ও পৃথিবীর মিলনের পূজা করম পূজা করা হয়। সূর্যও পৃথিবীর নামে দুইটি পৃথক করম ডাল গাড়া হয় এবং দুইটিকে হলুদ গাবা সুতো অথবা নেকড়া দিয়ে জোড়া লাগা হয়। কুমারী মেয়েরা উপবাস করে। গ্রামের লায়া পূজা করেন। মেয়েরা পূজা দেয়। জাগর বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালায় যারা জাওয়া পাতে। তাদেরকে বলা হয় "জাওয়ার মা"। কুমারী অবস্থায় মা। উদ্ভূত কথা। ওরা অবশ্য মায়ের মত জাওয়াকে পরিচর্যা করে থাকে। নিত্যদিন সন্ধ্যায় জাওয়া ডালিকে ঘিরে নাচ করে। প্রতিদিন জাওয়ার উপরে হলুদ গোলা জল ছিঁটা দেয়। তারা জেনে গেছে হলুদ জল দিলে কোন রোগ, রোগ পোকা আক্রমন করতে পারবে না। ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে যৌথ হাত ধরাধরি করে নাচে। সঙ্গে চলে জাওয়া গীত। অনেক গীত আছে। উদাহরণস্বরূপ কৃষি সংক্রান্ত দুই একটি গীতের উল্লেখ করা হল। যেমন:—

"উপর খেতে হাল দাদার
নামঅ খেতে কামিন রে।
কন খেতে লাগাবি দাদা
কাজলকাঠি ধান রে।।
দাদা গেছে হাল বাইতে
বহু গেছে রুতে লো।
আসুক দাদা বল্যে দিব
ছেল্যা কাঁদছে ভখে লো।

জাওয়া করমের সর্বশেষ অনুষ্ঠান পান্না করা। মোট তিন দিনের অনুষ্ঠান। সঁজত = প্রস্তুতি, জাগরণ = মূল পূজা ও নাচ গীত। পান্নার দিন ধান ক্ষেত থেকে ধান গাছি এনে বাড়ীতে সিঁদুর দান দিয়ে বাসি ভাতের ভোগ নিবেদন করা।

*** জিহুড় :-** আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন জিহুড়। কুড়মালি কৃষি-সংস্কৃতির মানের কাছে ঐ দিনটি বড় তাৎপর্য্যের দিন। ঐ সময় জমির বহাল ধান গর্ভবতী হয়। গর্ভাবস্থায়

'সাধভক্ষণ' করাতে হয়। বিশ্বাস, সাধভক্ষণ করালে ফসল পুষ্ট হবে। ধানে আগড়া হবে না। বাড়ীর কর্তী ঐ দিন ওল, আলতি (কচু), মান, শুশনি আলু, খাম আলু, কুমড়া, পুঁই, আঁখ, আদা, কলা, এক সঙ্গে সিদ্ধ করে একটি তরকারী তৈরী করেন। ঐ সঙ্গে আতপ চালের সঙ্গে দুধু,দই,ঘি, গুড় ও মধু মিশিয়ে দেন। কৃষক নিজে স্নান করে সদ্য কাচা কাপড় পরে স্ত্রীর তৈরী করা খাবার একটি বাটিতে সাজিয়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথায় তুলে ধান ক্ষেতে গিয়ে ভোগ নিবেদন করেন। ভোগ দেওয়ার পর প্রকৃতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়—

"লোকের ক্ষেতে আলমাল।
আমার ক্ষেতে শুধুই চাল।।"

কৃষক ভোগের প্রসাদও সঙ্গে মড়রা ঘাসের গুঁছি বেঁধে মাথায় করে বাড়ীতে ফিরে আসেন। দুয়ারে স্ত্রী জল ঘটি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। স্বামী দুয়ারে এসে দাঁড়ালে পর স্ত্রী জল ঢাল দিতে দিতে কোঠা ঘরে প্রবেশ করেন। স্বামী স্ত্রীর অনুসরণ করেন। আল্পনা এঁকে গুঁড়ি গাবানো পিঁড়ে বিছানো থাকে। গৃহস্বামী ঘাসের গুচ্ছকে পিঁড়ির উপর রেখে প্রণাম করেন। সব কাজই সমাধা হয়ে থাকে নীরবে।

জিহুড় দিনে ওল, মান, কচু, শুশনি আলু, খাম আলু, কলা, আদা, হলুদ ও সেই সঙ্গে সালনতি, কুইলা খাড়া, কলমি চালধোয়া, খাপরা, শুশনি, পুই, কুমড়া, লাউ, শশা, কুঁদরি, কাল্লা, রমা সব মিলিয়ে একুশ রকমের দ্রব্য এক সঙ্গে মিশিয়ে আলুনা তরকারী তৈরী করা হয়। পরিবারের প্রত্যেককে ঐ তরকারী খেতে দেওয়া হয়। বিস্বাদ লাগলে গুড় মিশিয়ে খাওয়া যায়। বিশ্বাস, ঐ তরকারী ভক্ষণ করলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। কোন রোগ জীবাণু আক্রমন করতে পারে না। তবে গুড় দিয়ে খেলে কাজ কম হয়।

জিহুড় দিনে রাত্রিবেলার খাবার খেয়ে গৃহস্বামী জিহুড় জাগাতে বার হন। মাঠে ধান ক্ষেতে গিয়ে নিজের সাধ্যমতো জোড়ে হাঁক পাড়েন জি-হু-ড়-জা-গো। গ্রামের এবং পাশের গ্রামে চাষীগণ অনুরূপ আচরণ করে থাকেন। এই রীতি রেওয়াজ লুপ্ত হয়ে গেছে।পরিবর্তে গ্রামে যাঁত বা মনসা মঙ্গল, দাঁড় নাচ, পাঁতা নাচ করেন।

*** বাঁদনা :-** বাঁদনা উৎসবও কুড়মালি কৃষিসংস্কৃতির মানুষের গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। সরাসরি চাষ-আবাদের সঙ্গে যুক্ত না হলেও পরোক্ষভাবে কৃষিরই উৎসব। কৃষি উৎসব। কৃষিকাজে সহায়ক গরু ও মহিষের বন্দনা বা পূজা কৃতজ্ঞা স্বীকারের অনুষ্ঠান। কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন হাল, মই, জোঁয়াল, গাঁইট, কোদাল ইত্যাদির পূজা।

পাঁচদিন ব্যাপি অনুষ্ঠান। ঘাওয়া, অমাবস্যা, গরয়া, বুঢ়িবাঁদনা ও কাঁটা কাড়হা। ঘাওয়া প্রস্তুতির দিন। অমাবস্যায় গরু মহিষকে স্নান করানো। রাত্রিতে গোয়ালে গোয়ালে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে (জাগর) গরু-মহিষের সিং-এ সরিষার তেল মাখিয়ে সারা রাত্রি ঢোল-ধমসা-মাদল্যের বাদ্য সহযোগে অহিরা (বন্দনা গীত) গেয়ে জাগানো হয়। গরয়ার দিন ঘিয়ের পিঠে তৈরি করে তা ভোগ হিসাবে নিবেদন করে গোয়াল ও গো রক্ষাকারিনী দেবী গরয়ার পূজা করা হয়। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়মের সহযোগে এই পূজা পালন করা হয়। স্নান করে ভিজে কাপড়ে শক্ত কাদা দিয়ে মাটির পিঁড়ি তৈরী করে সুঁধি শালুক ফুল পিঁড়িতে গুঁজে পূজা করা হয়। পিঁড়ির সামনে আতব চালের গুঁড়ো দিয়ে নয়টি ঘর যুক্ত (খঁড় পাতা) দাগ করে প্রতি ঘর সিঁদুর দাগের উপর তুলসী পাতা রেখে ভোগ নিবেদন করা হয়। এক একটি দাগ কাটা ঘর বুঢ়াবাবা, মহামাঞ, সূর্য (করম গুঁসাই), জাহির মাঞ, গাঁ গরাম, বড় পাহাড়, বাঘুৎ, কুদরা, ছাঁদন-দড়ি-বাঁদন দড়ির। পূজা শেষে দুধ ঢাল-জল ঢাল দেওয়া হয় তুলসী তলায় সাজানো হাল,মই, জোঁয়ালে সিঁদুরের দাগ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সিরি গাই, সিরি বলদের শিং-এ কপালে সিঁদুর দিয়েধান শীষের মোড় (মুকুট) পরানো হয়। পা ধুইয়ে দিয়ে প্রণাম করা হয়।

বুঢ়ি বাঁদনার দিন প্রতিটি গাই-গরুকে মাথায় শিং-এ তেল দিয়ে সিঁদুর ও মোড় পরানো হয়। নূতন কূলায় ধূপ, দীপ, ধান, দূর্বা, সরিষা সাজিয়ে চুমানো হয়। বিকালে আখড়ায় মালখুঁটায় বলদ ও মহিষকে বেঁধে খেলানো হয়। কাঁটাকাড়ার দিন বাগাল (রাখাল) এর বিশ্রামের দিন। বিকালবেলা নির্দিষ্ট স্থানে মহিষ খুঁটানো হয়।

*** খামার বাঁধা :-** একটি প্রশস্ত সমতল স্থানে যেখানে জল জমবে না সেই জমিটি কোদাল দিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে লাঙ্গল চালিয়ে মাটি করে তাতে জল ঢেলে কাদা করা হয়। তারপর মই দিয়ে ঐ কাদা সমতল করে নেওয়া হয়। মই চালানোর পরেও দেখা যায় কোন স্থান উঁচু-নীচু হয়ে আছে সেগুলি হাত দিয়ে সমতল করে নেওয়া হয়। গৃহবধূ স্নান করে একটি মাটির ভাঁড়ে ভেলা ডাল গুঁজে মাঝ বরাবর বসিয়ে দেন। ভাঁড়ে ভেলা ডাল বাদেও চিড়চিড়ি ও ঠুটকু বাড়হন্ (খয়ে যাওয়া) রেখে দেন। খামার না বাঁধলে ক্ষেতের ফসল কোথায় রাখা হবে? ঐ খানেই তো সাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ চলবে। তারপরে তো ফসল ঘরে তোলা হবে।

*** ডেনি আনা / ঠাকুরান উঠা :-** আমন ধান কাটা শেষ হওয়ার মুখে তিনটি ধান গাছিকে ক্ষেতে রেখে দেওয়া হয়। ধান তোলার শেষের দিন কিংবা তারপরের দিন

প্রতিটি কৃষক ডেনি ঠাকুরানীকে বাড়ী আনেন। ডেনী আনা বা তোলার দিন। ঐদিন মা-বোনেরা উঠান-আঙিনা, খামার গোবর লেপে সূচি-শুভ করে দেয়। তুলসী তলায় খামার থেকে আঁকদুয়ার পর্যন্ত এবং খামারে ধান গাদার সামনে আল্পনা দেন। কৃষক ঘি, গুড়, আতব চাল, সিঁদুর, তুলসী পাতা ইত্যাদি পূজা সামগ্রী, জল ঘটি ও একটি দা নিয়ে ক্ষেতে যান। সেখানে যে ধান গাছি গুলিকে ছেড়ে এসেছিলেন সেইগুলির একটি গাছির মাটি চারপাশ দা দিয়ে চিরে উপড়ে ফেলেন। ধানগাছির গোড়ার মাটিতে কুন্ডলি পাকান। তারপর আবার ক্ষেতে বসিয়ে পূর্ব মুখ করে পূজা করেন। উপড়ানো গাছি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গাছিগুলি দা দিয়ে কেটে একসঙ্গে বেঁধে মাথায় তুলে বাড়ীতে নিয়ে আনেন। পথে কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। দুয়ারে এসে পৌঁছালে গৃহিনী জল ঢাল দিতে দিতে খামার পর্যন্ত স্বামীকে নিয়ে যাবেন। কৃষক খামারে পৌঁছে ডেনি মাঞকে বিশেষভাবে আল্পনা দেওয়া ধানগাদার পাশে নামিয়ে রাখেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে প্রণাম করেন। ঐদিন বাড়ীতে পিঠে-পায়েস তৈরী করে স্বপরিবারে আনন্দ করে খেয়ে থাকেন।

ঠাকরান্ আনার পরের দিন খামার জিরানি। ঐদিন খামারে কোন কাজ করা চলবে না। এমনকি খামারে ঢোকাও বারণ। বলা যায় ঐদিন বাড়ীর ছুটির দিন। ঐ দিনও বাড়ীতে পিঠে-পায়েস তৈরী হয়। ফুল-পরানদের ডেকে খাওয়ানো হয়। খাওয়ানো হয় ঠিকই কিন্তু ঐদিন বাড়ীর কোন জিনিস কাউকে দেওয়া চলে না।

* **মকর ও টুসু উৎসব :** কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষ কৃষিবর্ষের শেষ দিনকে বলে মকর। ঐদিন সূর্য মকরক্রান্তির চূড়া বা টুয়ে অবস্থান করে। পরের দিন কর্কট ক্রান্তিতে হেলে পড়ে। ঐদিন টুসু বিসর্জনের দিন। কৃষি পরিবারের মেয়েরা বিভিন্ন বড় জলাশয়, নদী, খালে টুসুকে ভাসায়। যদিও মকর ও টুসু উৎসব সরাসরি কৃষি উৎসব নয়। অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষি উৎসব। ঘরে ফসল তোলারই উৎসব।

অগ্রহায়ন সংক্রান্তির দিন সাঁঝ বেলা মেয়েরা ডেনি মাঞের ধান বকনা বাছুরের গোবর নাড়ু ও গেঁদাফুল-বাঁদুফুল দিয়ে নূতন মাটির সরায় টুসু পাতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীরপ জ্বেলে গেঁদাফুল দেয়। চাল ভাজা, কুরথি ভাজা, চিড়ে ভাজার ভোগ নিবেদন করে। টুসুকে সামনে রেখে সুখ দুঃখ, আনন্দ-ভালবাসার টুসু গীত গাহে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন টুসু জাগরণের রাত্রি রাত ভোর চলা গান-গীত, ভোরবেলা এক দল অপর দলের টুসুর সঙ্গে মালাবদল করে সখ্যতা জানায়। তিলের নাড়ু, তিলের পুর দিয়ে গড়গড়্যা পিঠা খায়। পরবে আরও অনেক রকম পিঠে তৈরী করা হয়। সংক্রান্তির দিন

নূতন জামাকাপড় পরে চৌড়লের ভিতর পাতানো টুসুকে বসিয়ে দল বেঁধে বিসর্জন করতে নিয়ে যাওয়া হয়।

***লোক বিশ্বাস :-** কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষ বিশ্বাস করেন যেগুলি করলে বা মানলে শরীর সুস্থ থাকে। ফসল রোগ মুক্ত থাকে। ফসল অধিক মাত্রায় হয়। কৃষি কেন্দ্রিক জ্ঞান ভান্ডারের জীবনবোধ সুপ্রাচীন কালে আরম্ভ হয়ে বর্তমান কালেও বহতা আছে। লোকবিশ্বাসের ধারণার কথা কি নিম্নে তা উল্লেখ করা হল। যেমনঃ—

(১) আখ্যানের দিন গোবর কুড় বা গাদার উপরিভাগে কোপ মারলে গাদার সমূহ গোবর ভালভাবে পচন করবে। গোবর ঝুরঝুরে হবে। উৎকৃষ্ট জৈব সার তৈরী হবে। ঝুরঝুরে গোবর সার সহজেই চারাগাছ ও গাছে গ্রহণ করতে পারবে। ঐ গোবর ফসল ক্ষেতে ছড়ানোর পক্ষেও সহজ হবে।

(২) খামারে ভেলা ডাল ও ঠুটকু বাড়হ্যন দেওয়া : খামার বাঁধার সময় খামারের মাঝখানে একটি নূতন মাটির ভাঁড় বসিয়ে তার মধ্যে ভেলা ডাল ও ঠুটকু বাড়হ্যন (খয়ে যাওয়া ঝাঁটা) ভাঁড়ের মুখে রেখে দেওয়া হয়। ঝাঁটা ও ভেলা ডাল ভাঁড়ের উপরে বেশীরভাগ অংশ বাইরে থাকে। যা সহজেই নজরে পড়ে। চাষির বিশ্বাস তাতে খামারের ভিতর কোন অশুভ দৃষ্টি বা প্রভাব না পড়তে পারে। কোন ক্ষতিকারক জিনিস প্রবেশ করতে না পারে।

(৩) বীজ পুন্হ্যা ও হাল পুনহ্যার পরে দই-চিড়া-গুড় খাওয়া: দই খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল। দই শরীরের বহু উপকার করে। দই-গুড়-চিড়া শরীর পুষ্ট হয় এবং একসঙ্গে খেলে ঔষধীরও কাজ করে বলে বিশ্বাস।

বীজে রোহিন মাটি মেশানো:

বীজ তলায় বীজ ফেলা পূর্বে বীজ শোধন করে নিয়ে চারাই কোন রোগ পোকা লাগে না। ঐ চারা দৃঢ় ও পুষ্ট হবে। পুষ্ট চারা লাগালে সতেজ নীরোগ ফসল হবে। কৃষকের বিশ্বাস, রহিন মাটি বীজে মিশিয়ে দিলে বীজ শোধন হয়ে যায়। রহিন মাটির সেই ঔষধী ক্ষমতা আছে।

(৪) রহিনের দিন রহিন ফল খাওয়া, অম্বুবাচীর দিন আম খাওয়া :

কৃষকের বিশ্বাস রহিনের দিন রহিন ফল খেলে বিষধর সাপে কাটলে, বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে সেই বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। বিষ শরীরে কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আমাবতী বা অম্বুবাচীরদিন আম খেলে বর্ষাকালে যে অধিক মাত্রায় পেটের রোগ দেখা দেয়। আম খেলে সেই বৎসরের বর্ষা মরশুমে কোন পেটের অসুখ

বা পীড়া ভোগ করতে হবে না কাজ কামাইও হবে না।

ফসল ক্ষেতে ছাতা ডালি গাড়া :

ফসল ক্ষেতে ছাতা ডালি গাড়লে ঐ ডালে পেঁচা বসবে। পেঁচা ইঁদুর ভক্ষণ করে। ইঁদুর ফসল কেটে কত ক্ষতি করে চাষি ভুক্তভোগী। পেঁচা ইঁদুর খেয়ে সাবাড় করে দিলে ক্ষেতে ফসল রক্ষা পায়। আবার দেখা যায় বেশীর ভাগ সময় ছাতা ডালি হিসাবে পড়াশি গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়। ডাল থেকে পড়াশি পাতা ক্ষেতে পড়ে। ঐ পাতা কীটনাশক ঔষধী তৈরী হয়ে ক্ষেতের ফসলকে রোগ পোকার হাত থেকে রক্ষা করে। নূতন করে আর জমিতে কীটনাশক ছড়ার দরকার পড়ে না।

(৬) ধান গাদায় /পালইয়ে ভেলা ডাল গুঁজে দেওয়া :

ক্ষেত থেকে খড় সমেত ধান এনে খামারে সাজিয়ে রাখা হয়। যখন সমূহ ধান আনা শেষ হয় তখন চাষি ধান গাদার চার কোণে ও দুই পার্শ্বে ভেলা ডাল গুঁজে দেন। বিশ্বাস, লোকের নজর ঐ ভেলা ডালের উপর পড়বে। কোন অশুভ দৃষ্টি অর্থাৎ কুনজনর দিতে পারবে না। কোন দুষ্ট অপদেবতা শষ্য হরণ করতে পারবে না। ভেলা ভেষজ গুণ সম্পন্ন। ভেলা ডাল জীবাণু মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। পোকা-মাকড় ধানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।.

(৭) ধান গাদায় লোহা ফেলে রাখা :-

খামারের ধান সাড়াই মাড়াই করার সময় পাটাতনের নীচে আবার ধান এক জায়গায় জমা করার পর ধান গাদার উপরিভাগে একটি লোহার তৈরী জিনিস অথবা লোহার টুকরা ফেলে রেখে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, লোহা যেকোনো অশুভ শক্তি ও অশুভ দৃষ্টিকে নষ্ট করে দেয়। তাতে করে শষ্যের হানি হয় না।

(৮) গন্ডি কাটা :

ধান গাদার চারপাশে কুলোর মুখে প্রান্ত দিয়ে কুলো উবুড় করে গন্ডি রেখা কাটা হয়। ধান গাদার উপরে ঐ কুলোর প্রান্ত দিয়ে ত্রিশূলের মত দাগ দেওয়া হয়। বিশ্বাস, গন্ডির দাগের ভিতরে কোন অশুভ দেবতা প্রবেশ করতে পারে না। যেকোন কু-নজর গন্ডির ভিতর ঢুকতে পারে না। শষ্যের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করেত পারে না।

নিষেধাত্মক কৃষিলোক বিশ্বাস :

কৃষিকাজে এমন কিছু নিয়ম নীতি যেগুলি অতি অবশ্যই পালন করে চলতে

হয়। এমন কিছু নিষেধ আছে যা না মানলে সমূল বিপদ ঘটতে পারে। শষ্য ও ফসলের ক্ষতি হতে পারে। পরিবার পরিজনের লোকসান হতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আবহমান কাল ধরে বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিক ভাবে আজও কৃষিসংস্কৃতির মানুষ মনে প্রাণে ধরে রেখে দিয়েছে এমনি নিষেধ বিষয়ক কয়েকটি লোক বিশ্বাস উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হল।

(১) বীজ ফেলার আগে লোককে বীজ দেওয়া :

কৃষক নিজের জমির বীজ তলায় বীজ ফেলার আগে বীজের কোন অংশই অন্যকে দেয় না। আগে অন্যকে বীজ দেওয়া নিষেধ। নানান প্রাকৃতিক কারণে নিজের বীজ তলার বপন করা বীজ থেকে ঠিক মত আঁকুর বা চারা না গজাতেও পারে। আবার এমন দেখা যায় বীজ তলায় কম পরিমান চারা গজিয়েছে যা নিজের ক্ষেতে ফেলবার প্রয়োজন পড়ে। লোককে দিয়ে শেষ করে দিলে ঐ সময় আর কোথায় বীজ পাওয়া যাবে? অত ঝাকিক ঝামেলার কি দরকার? অতএব না দেখে বীজ দেওয়া নিষেধ। কৃষক বিশ্বাস করে আগাম বীজ দিয়ে দিলে সঙ্গে শষ্যও চলে যাবে।

(২) খামারে ধান উমানের সময় কথা বলা :

খামারে ধান ঝাড়াই-মাড়াইয়ের পর ধান ও আগড়া (ভূষি ধান) কূলোর বাতাস দিয়ে পৃথক করা হয়। পৃথক করবার পর যেগুলি সঠিক ধান সেইগুলি গাদায় রেখে বাকী টুকু ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ধান গাদার চার পাশে কূলোর মুখ দিয়ে গন্ডি দাগ কাটা হয়। তারপর ধূপ জ্বেলে প্রণাম করে পাড়নের (গাদার) ধান ঝুড়ি কিম্বা মাটির হাঁড়ি দ্বারা মাপ করা হয়। তাহলে বোঝা যায় এবছর কত ধান উৎপন্ন হয়েছে। ধান গাদায় গন্ডি কাটার পর থেকে কথা বলা বা শব্দ করা বারণ। বিশ্বাস, তাতে শষ্যের হানি হয়।

(৩) বাস্তু বাড়ীতে তিল চাষ :

বাস্তু বাড়ীতে কোন অবস্থায় তিল বোনা বা চাষ করা যাবে না। তাতে পরিবারের ঘোর অমঙ্গল। বাস্তু বাড়ীতে তিলের চাষ করলে বংশ পাশ বা নিঃর্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তিলে বংশ নাশ নিশ্চিত।লোক গালি পাড়ে—"তোর ঢিপায় তিল বুনব।" অর্থাৎ তোর বংশ নাশ করে ছাড়ব। যে কাজ করলে ঘোর অমঙ্গল বংশই শেষ হয়ে যাবে এমন বিপদের পথে কে সাহস করে পা বাড়াবে। এখনও এই লোক বিশ্বাস বা ধারণা মানুষের মনে দৃঢ় মূল হয়ে আছে। এমন নিষেধ পালন না করে পারা যায়।

(৪) জুতা পায়ে খামারে ঢোকা:

জুতা পায়ে দিয়ে খামার বাড়ীতে প্রবেশ করা ঘোরতর অন্যায় ও অবিবেচকের

কাজ বলে মনে করা হয়। জুতা পায়ে খামারে প্রবেশ করলে মা লক্ষ্মীকে হেয় ও অবজ্ঞা করা হয়। ওই খামার থেকে লক্ষ্মী চলে যায়। আসলে জুতোর তলায় অনেক সময় নোংরা লেগে থাকে। রোগ জীবাণু থাকে। ঐ রোগ জীবাণু খামারের ফসলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আগাম বছর চাযের বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব জুতা পায়ে খামারে প্রবেশ নিষেধ।

(৫) পা দিয়ে খামারের ধান নাড়া:

এমনিতেই ধান শয্যকে পা দিয়ে মাড়ানো চলে না। ধানকে লক্ষ্মী স্বরূপ ভাবা হয়। ধানকে পা দিয়ে মাড়ানো মানে লক্ষ্মীকে পা দিয়ে ঠেলা। তাতে লক্ষ্মী অপমান বোধ করে। আসল কথা, হাত দিয়েই কাজ করা উচিত। কর্মী বা পরিশ্রমী মানুষ তাহ করে থাকে। যে ব্যক্তি শ্রম করতে চাই না। পরিশ্রম করে কাজ করতে কষ্ট বোধ করে সেই লোকই হাতের কাজ পায়ে করার চেষ্টা করে। সকলেই জানে কর্মঠ মানুষ লক্ষী লাভ করে আর কুঁড়ে কষ্ট পেয়ে মরে। আবার অসাবধানতাবসতঃ পায়ের তলায় নোংরা লেগে থাকতেও পারে। ঐ নোংরা ক্ষতি করতে পারে। অতএব পা দিয়ে ধান গোটানো বা মাড়ানো যায় না।

(৬) খামার জিরানির দিন ঘরের জিনিস দেওয়া :

ডেনি মাঞ বা ঠাকরান আনার পরের দিন খামার জিরালি। ঐদিন বিশ্রামের দিন বিশেষ করে খামারের ভিতর কোন কাজ করা যাবে না। বাড়ীতে ঐদিন ভাল-মন্দ খাবার অর্থাৎ পিঠে-পায়েস তৈরী হয়। ঐদিন লোককে বাড়ীর চাল, ধান, টাকা-পয়সা দেওয়া বারণ। কারণ ঐদিন লোককে দিলে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায়। অর্থাৎ দেওয়া-নেওয়া করলেই ঝামেলা ঘটতে পারে। তার চাইতে সারাবছর পরিশ্রম করার পর চাষের সমূহ ফসল সুরক্ষিত করে খামারে রাখা আছে। আজ বিশ্রামের দিনে কো ঝামেলায় না জড়ানোই মঙ্গল। তার চাইতে মনের সুখে খাও-দাও আর পায়ে তেল লাগিয়ে আয়েস-আরামে কাটাও। ব্যাস।

*** ডা-হে বীজ ফেলা :** জ্যৈষ্ঠ মাসের কুড়ি তারিখ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত ডা। কৃষকদের বিশ্বাস ঐ সময় বীজ তলায় বীজবপন করা নিষেধ। বীজ ফেললে সমূহ ক্ষতি। ঐ সময়ককালের বীজতলার চারাই ভাল ফসল হয় না। এমনকি অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। ঐ বীজ তলার চারা রোপন করলে অড়কা,মড়কা, চড়কা,রাঙা, রথা, ঠঁটি, বর্খি, আগমরা ইত্যাদি ইত্যাদি ধান ক্ষেতে রোগ হয়ে থাকে। ধান তো কম পরিমান হয়েই রোগ লাগা খড়ও গরু মোষে ঠিক মত খায় না। সেই চারায় আবার উইপোকার উপদ্রব

বেশী মাত্রায় দেখা যায়। ক্ষেতে জল কমে গেলে ঐ চারার ধানও উইপোকায় খেয়ে দেয়। অতএব ডাহের সময় বীজ ফেলা চাষি পরিহার করে চলেন। মাত্র এক বেলা অর্থাৎ কুড়িই জ্যৈষ্ঠ মাগন হিসাবে পেয়ে থাকেন।

*** লোক প্রবাদ বা ডাক পুরুষের কথা :** কৃষক কৃষি কাজ করতে করতে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতার জ্ঞান বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা কোন বিষয়ে একটি সত্যে এসে পৌঁছায়। একটা সত্যিকারের ধারণা মনে গভীরে গেঁথে যায়। সেই ধারণার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অল্প কথায় প্রকাশ করে থাকে। অল্প কথায় এই উপলব্ধির কথা প্রকাশ করাকেই বলা হয়ে থাকে ডাক পুরুষের কথা বা প্রবাদ বাক্য। কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবাদ বাক্যের সংখ্যা অনেক। এই ডাক পুরুষের কথাগুলি বহু মানুষের সৃষ্টি। এক একটি বাক্য এক এক জন সৃষ্টি করলেও সেগুলি তার একার থাকে না। সমাজের জিনিস হয়ে যায়। এগুলি সামাজিক সম্পত্তি স্বরূপ। কৃষককুল ডাক পুরুষের কথাকে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং আন্তরিকভাবে পালন বা মেনে চলার চেষ্টা করেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কৃষি বিষয়ক ডাকপুরুষের কথা বা প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ করলাম যেমনঃ—

(১) "চাষা চিনহাই আইড়ে,
তাঁতি চিনহাই পাইড়ে।।

(২) পাহাড় কচার চাষ,
না করিহঅ আশ।

(৩) চালের ডিংলা চালকে উসাস্‌।

(৪) ঢাপার ঢুপুর কার,
খেড়হি-গুঁদলি সার।
আর হয়,
আর মুড় কুড়লেও লয়।

(৫) কি ভালছিস্‌ ভেল্‌ ভেল্‌,
যার সরিষা তার তেল।।

(৬) আখ আদা পুই,
তিন চৈতে রুই।

(৭) আগে রঁদ পরে খঁদ।

(৮) অঙা গুনে পঙা,

গাছ গুনে ঝিঙা।

(৯) বাঁধ লক্ষ্যে চাষ,

কুটুম লক্ষ্যে বাস।

(১০) ষোল চাষে মূলা।

তার আধধেক তুলা।

তার আধধেক ধান।

বিনা চাষে পান।।

(১১) যে দিন রস,

সে দিন চষ্।

(১২) ধান পড়িলে গবর,

আখ পড়িলে দবড়।

(১৩) আষাঢ়ে রুয়ে নাখকে,

শরাবনে রুয়ে ধানকে।

ভাদরে রুয়ে বীচকে,

আশ্বিনে রুয়ে কিস্‌কে।

(১৪) যদি বর্ষে মকরে,

ধান হবেক টিকরে।

(১৫) হাল লড়বড় বঁটা সরু,

বাইতে গেলি আঁড়্যা গরু।

(১৬) ঘন কুথি, বিরল তিল

ডেগে ডেগে কাপাস্ বুন।

*** জান কহ্‌নি বা ধাঁধা :** কৌতুক বা হেঁয়ালির ছলে পেঁচিয়ে কোন বিষয়ে কোন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, সেই কথা বা প্রশ্নের কঠিন পেঁচ খুলে আসল রহস্য কি তা বলতে হবে। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর দেওয়া নেওয়াকে বলা যায় জান কহ্‌নি বা ধাঁধা। জান কহ্‌নি যেমন অনেক কিছু ভাবায়, অনেক কিছু শেখায়। কৌতুকের ছলে চিন্তা শক্তি, বিচার শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। অনেক অনেক অজানা জিনিসের জানান দেয়। বাড়ীর আশেপাশের অতিসাদারণ বস্তু যা আমাদের হিসাবের মধ্যে দিয়ে সেগুলির উপরও খেয়াল পড়ে। প্রশ্নকারীর সঙ্গে উত্তর দাতার এক নিবিড় আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক আপনাআপনি গড়ে ওঠে। খেলার ছলে হাসতে খেলতে জানা জ্ঞান মনের

গভীরে অজান্তে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। যা সহজে ভোলা যায় না। চাষী পরিবারের ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমাঞ, দুধু বাপ, দুধু মাঞয়েরা তাঁদের নাতি-নাতনীদের জান কহ্নির ভিতর হাসি-মসকররার ছলে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সন্ধ্যার সময় নাতি-নাতনীদের ভোলানোর ভিতরে নিজেও মজে থাকেন। বাঁচার তাগিদ ও রসদ খুঁজে পান। ছোট নাতনী দুই হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে পিঠে চড়ে কহনি বলবার আবদার যখন করে সে যে কি অপার সুখের অনুভূতি তা ভুক্তভোগিরাই বোঝেন। অনেক বিষয় নিয়ে ধাঁধা বা জানকহনি আছে। এখানে কৃষি বিষয়ক কয়েকটি জান কহনি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখকরা হল। যেমনঃ—

(১) লিক্ লিক্ ডাঁড়ি, চিক্ চিক্ পাত্,
খাঁইতে মধু রস, উলগে কাপাস।
—আঁখও মাড়াই কল

(২) বাহেইরে পঁটা,
ভিতরে ঘাস।
—বাইদ/কুঁচড়ি

(৩) ডাইর তরে লাল মিঞ।
—মরিচ।

(৪) গরু খঁটলে খঁটল রহল,
পাঘা গেল চরে।

(৫) বননে বাহিরালি খোঁখি,
খোঁখিহ কহেই ঘর সুধাই সেঁখি।
—মরিচ।

(৬) মুনা চুকা ধুঁধে লুকা।
—বেগুন।

(৭) ঘুসুর ঘুসুর ঘুসকা,
তিন মুড় তার দশ পা।
—বলদ ও হালবাহী চাষী।

(৮) দিছে ত আনিস না,
না দিছে ত আনবি।
—চাষীর মই।

(৯) উ থাকে জলে,

তুঁই থাকিস তলে।
আমি থাকি ডালে।
তিন জনার দেখা হয়,
ঠিক মরণের কালে।
—মাছ, হলুদ ও লংকা।

(১০) নাইখে ত খাছিস্,
থাকলে কুথা পাথিস্।
—মাছি ও চাষা ঘরের বুঢ়া বাঁইড়া গুরু।

* **লৌকিক ছড়া :** লৌকিক ছড়ার সুর, ছন্দ ও কথা এতটাই মজবুত যা অতি সহজেই মনের গভীরে ঢুকে যায়। এর সুর ও ছন্দের এমনই যাদু আছে আছে যা মনকে আবেশে বিভোর করে তোলে। ছড়াগুলির কথা যদিও অতি সহজ ও সাধারণ কিন্তু অনেক বিষয় ভাবায় এগুলি এক একটি কোন ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্ট হলেও তা কিন্তু একক ব্যক্তি কখনো নিজের বলে দাবী করেন নাই। সবই জনসাধারণের জিনিস। বহুজনের সৃষ্টি। সামাজিক সম্পত্তি। চাষী পরিবারের মা তাঁর সন্তান-সন্ততির ঘুম পাড়ার জন্য অথবা ঠাকুরমা তাঁর নাতি-নাতনীদেরকে ঘুম পাড়ার গান বা মন্ত্রসরূপ ব্যবহার করে থাকেন। সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে ছড়াগুলি যুক্ত না হলেও পরোক্ষে চাষের উপকারে লাগে এমনি কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করছি। যেমন ঃ-

(১) আয় রে আয় ভালুক,
লাফ ঝাঁপ দিয়েঁ।
আম্‌দে বাবুর বিহা দিব,
দামড়া বাঁধা দিয়েঁ।।
ভালুকে নুন কুথা পায়,
ভালুকে তেল কুথা পায়,
আঁওলা-বাঁউলা খাঁয়ে ভালুক
বনকে পালাঞ যায়।।

(২) এ কাউআ তর বাপ আস্যেছে,
আসুক কেন্‌নে চেঁদরা বাপ,
জুনহাইর পাইকেছে।।

(৩) আখ বাড়িয়ে কে রে,

সাবু বস্যেছে রে।
সাবুর গলায় কন্ঠ মালা,
বউকে সাজ্যেছে রে।
এ বউ তদের কি তরকারী,
টক্‌টড়োআর ঝোল।।
(৪) পলাশ পাতাড়ির বন,
টাকা করে রম্‌ ঝাম্‌।
টাকা হইল মাটি,
মূল খেড়িকে কাটি।।
(৫) ইতু টুকু জলে, মাছ ভিড়্‌ ভিড়্‌ করে
রাজার বেটা, পাথর কাটা
মাছ ধরতে লারে।
ঘুর্‌্যে আস্যে বউকে ধরে।
এ বউ তদের কি তরকারী,
আমড়া পাকার ঝোল।।
(৬) গই গেলঅ বনে বনে,
বাছুর গেল বিজু বনে,
আয় বাছুর আয়-
ঘুর‍্যে আয় রে-।

***লোকগীত/গান :-**

কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষের গীত বা গানই জীবন। লোকগীতগুলি জীবনের গান। হাঁটতে চলতে, ক্ষেতে খামারে কাজ করতে করতে, পূজা-পার্বন-উৎসবে সকল স্থানেই গীত। গীতগুলি তাঁদের জীবনবোধ,জীবনের রণবোধ ও অন্যান্য সব বিষয়েই ধরা পড়েছে। কুড়মালি লোকগীত এক বিরাট সাহিত্য ভান্ডার। অনেক বিষয়েই গীত আছে। এখানে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত গীতগুলিই উল্লেখ করা গেল। যেমন:-
(ক) জাওয়া গীত :-

(১) পইন বাইদ দক্ষিণ বহাল,
বুন্‌লাম সরিষা লো-
বুন্‌লাম সরিষা।

ফুলে ত সিগির বিগির,
ফলে বেহুলা।।
(২) দাদাই হামর বুট বন্যেছে,
আমি যাবঅ রাখালো।
হেঁট কুল্হির ছানা গিলায়,
নিতই করে চুরি লো।।
(৩) তাল তলে লাল মাটি,
হল্যদ বড়অ বসেলো,
চাঁপামনি হল্যদ বাঁটে,
মনে মনে হাঁসে লো।
(৪) আখ বাড়িয়ে আখ বাড়িয়ে,
কি ছল্ মল্ করে লো।
ছটঅ দাদার বড়অ দাদার,
টাঁগি ঝল্মল্ করে লো।
(৫) ধান ফুল ধান ফুল,
ফুটে আধা রাইত লো—
ফুটে আধা রাইত।
ফুলা লড়েকা চড়ে কা,
শাশোয়াকা ননদা,
ই-অ ফুলে দেশঅ কেরিয়া।।
কুথি ফুল কুথি ফুল,
ফুটে আধা রাইত লো,—
ফুটে আধা রাইত।
ফুলা লড়েকা চড়েকা,
শাশোয়াকা ননদা,—
ই-অ ফুলে দেশঅ কেরিয়া।।
খ। করম গীত:
(১) কাল্‌লা লতে কুঁদরি লতে,—
বাজ লাগলি।
ছিঃ-ছিঃ নাচে না জানে লো—

দাঁড়হাঞ রহলি।।

(২) খিলঅ ন খেতে দেওরা

বকলি না চরে,—

সেহ দেখি;—

দেওরা চললঅ বিদেশে।

তঁহি জে জাবে দেওরা,

.মালঞ্চ দেশে;:

হামরিকে—

দেওরা সঙে লে লে যাবে।।

* **দাঁইড়শালিয়া/ভাদরিয়া ঝুমইর :** ভাদ্র মাসে যে ঝুমুর বা ঝুম্যর গাওয়া হয় তাকে বলা হয় ভাদরিয়া ঝুমুর বা ঝুম্যর। সাধারণতঃ করম আখড়ায় দাঁড় হঁয়ে এই গীত গাওয়া হয় বলে বলা যায় দাঁড়শালিয়া ঝুমুর। যেমন—

(১) কাল্‌লা কুঁদরী ভাজা,

এই ত তরকারীর মজা।

শাগ ভাজা, দিদি রসুনে

ফড়ন গো, শাগ ভাজা।

(২) জুনহার ফুটে ফাট্‌ফুট্‌,

মার বিটি কুঁড়হা কুট।

ভাদর মাসে—

খর্‌খস্যা জামাই আ'লঅ লিতে লো।।

(৩) ঝিঙা যে রপলি

থুপি রে ঝিঁগয়া,

ঝিঙা লতে ঢুলু বাঝলাঞ সজনি।

এক ঠেঙা মারলি দুই ঠেঙা মারলি,

তিন ঠেঙাঞ ঢুলু টিড়গলি সজনি।।

(৪) খেতে বুনলি ধান,

ধান দেখি টানমান।

রোদা দেখি উড়ল পরান,

পিআ কে জান—

বাঁচে কি না বাঁচে পরান।।

* ঝুম্যর :

কলি যুগে বর্ষা কম   জলে বাঁধে রাখ দমে দম

ঐ জল যেমন না যায় মুষিক খাল।

রং- চাষা ধর কদাল, টানিয়া ফেলাও হে কাশি টাল।।

ধান লাগালে নিকান দিবে   ঘাস থাকিলে ধান না হবে,

চাষে পড়েছে সীতাশাল।।

মহাজনের আসল বীচ   বীচ খাপে লিবেক ও বল ফিচ,

দুটা আঁইড়া জুড়িয়ে জুঁয়াল।।

অখুর আঁইড়া দেয় না ধরা   ছুটে ছুটে পাগল পারা,

আঁইড়া ধরার পাইনা গড়া

অখার ঘটিলঅ জঞ্জাল।।

* হাল বাহা, ধান লাগা গীত :

(১) আমার বঁধু হাল বাহে,
কেঁদ কানালীর ধারে।
কালঅ মুহে ঘাম পড়ে,
আমার দেখে হিয়া ফাটে।
ননদ লো, আমি যাব,
নিজেই বাস্যাম দিতে।।

* টুসু গীত :

টসুর চালে লাউ ধর্যে আছে।
টুসু নুন দিয়েঁ বাস্যাম খাছে।।

* বিহা গীত :

(১) নদী ধারে ধারে—
মরিচ জালি জালি,
ময়না পাইখে খায়।
আমাদের ধনি—
সনার ডালি নিয়ে,

মরিচ তুলতে যায়।।
(২) বেহাইকে মারেছ্যে কাড়াতে,
বেহাই পড়্যে আছে,—
কফি বাড়ির লালাতে।।

*** কহনি বা লোক কথা :-**

(১)

কনঅ এক গাঁয়ে এক বুড়ি থাকে। উয়ার তিন বেটা আর এক বিটি ছিল। লাতি-লাত্না বেটা-বিটি-পুতহু নিয়ে জমজমাট সংসার। ঘরে দুধাইল দুধাইল গাই, বাঁধাড় বলদ তিন হাল। বাঁধে মাছ। বাড়িয়ে কত রকমের তরিতরকারীর চাষ। মরাই বাঁধা ধান অঢেল টাকা কড়ি। বলতে গেলে, কনঅটারই অভাব নাই। তবে সোব দিন এমন ছিল নাই।

বুড়হির যখন বিহা হয়, তখন উয়ারা এক রকম গরীব ঘরেই ছিল। খাট্যে-লুট্যে কনঅ মতে দিন চলথঅ। ঘরে এমন কামিন মুনিস-বাগাল রাখা ত এতই ধুর। ঘরের লকেই লকের ঘর কামিন-মুনিস খাটতে যাথঅ।

বুড়হির যখন যুয়ান উমের সবে মাত্র বড়অ বেটা দুটা হঁয়েছিল লকের মুহে কানা ঘুযা শুনা যায়, তখন বাপের ঘরে যায়েঁ, বাপের ঘরের লে একটা ধন বড়া সাপ পেটকলে লুকাঞ শশুর ঘর নিয়ে আস্যেছিল। সেই তখনলেই কেরমেসে কেরমেসে উয়াদের ঘরের এত বাড়হন্ত হঁয়েছে।

শুনতে পাওয়া যায়, রোজ উয়াদের ঘরে মরায়েরলে চারঅ ধার এক খাঁচলা ধান উপছে পড়ে। যে ঘরটায় মরাই থাকে, ওই ঘরটায় বুড়হি একলা ঘুমায়। নিজেই ঘরটা ছাইট-পাইট দেই। লরা-লাপটা করে। পরতপক্ষে বহু বিটি কাকউ ঘরটায় সামহাতে দেয় নাহ। কুথাও গেলে কুলুক বিঁড়া দিয়েঁ তবে বুড়হি যায়।

একবার হঁয়েছে কি বুড়হির মাঝলা বেটার বহু পাড়া-পড়শির বহু বিটিদের সঙে খাবার জল আনতে গাই-ডহর জড়ের ঘাট গেইলছে। পাশের ঘরের এক খুড় শাহড়ির সঙে বাঁধ ব'সতে গেছে। উখিনে দুলকে হিয়া খুলাস্যা গল্ফঅ করে্যছে।

—জানলে গো খুড়ি। বাপের ঘরে কত সাধে-লোভের হরেক কিসিম্ ভাল মন্দ খাথি, ফেল্থি কেউ কবু কনঅ রা কাড়হে না। ই-খিনে জাজ আওলি-ননদ-শাশুড়ির ঘরের হাত তওলা খাওয়া। ঘরে অতঅ কিছু রইতে জীহে কাঁটা উঠে গেল গো শাশুড়ি। আন্তা পুর্যে কনঅ খাবঅ তারঅ আর উপায় নাই।"

—"অ, তর্ বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি থা'কলে সোব হয়। তর মন নাই, মনে ক'রলে

যখন যা মন তুঁই খাতে পারিস্।"

—"কি ক'রলে হবেক, টুকচান শিখাঁই দে ন গো শাহড়ি।"

—দেখ বাছা, মনে কিছু করিস্ না। বললিস্ তাই বলা। আই, কানে কানেঁ বলছি; এক ঝুড়ি ধান মানে মানে আর আমার ঘর আ'নে দিবি। যখন যেটা মনে ধরে বলবি, করে্যে- ধরে্যে খাওয়াব। তদের ঘরে ত অফুরান ধান এক আঁজলা দিলে কে আর বুঝতে পা'রবেক?"

বুড়হির বেটার বহুর কথাটা মনে ধরল্য। সোব সময় বতর খু'জতে লা'গল।

লিরন দিন। তার মধ্যে এক দিন রা'তে বিকট গরম। ঘুমাঞ থাকা দায়। উ-দিনও বুড়হি ঘরেই ঘুমাঞছে। ঘরের কপাট খুল্যেই রাখ্যে দিয়েঁছে। এই মৌকা। বুড়হি আধা রা'ত তড়িক খুক্-খাক্ ক'রতেই রহে। পহিল খুখ্ড়া ডাকের আগেটাই ঘঁড়র পিটে শাহড়ি ঘুমাছে। ঘঁড়্-ঘঁড়্ করে নাখের আওয়াজ হছে। ধুরেরলেই বুড়হির নাক ডাকা শুনতে পাওয়া যাছে। এই কেতকি বতর। মাঝলি বহু সড়্যাক্ করে্যে ঘর সামহাঞ এক ঝুড়ি ধান নিয়ে রট-পটাঞ পড়শি ঘরে দিয়েঁ আ'লঅ। আস্যে ঘুরে্যে ঘুমাল্য। কিন্তুক মনে একটা ঘুট্ঘুটি রহেঞ গেল। ধান লিতে যায়েঁ কনঅ চিন্হা থাক্যে গেলঅ নকি?

সেদিন বুড়হি ভোরে পুন্না পানির বাঁধ গেল। ভোরে ঘরের দুয়ারে কনঅ কুলুক লাগাঞ দিয়েঁ যায় নাই। সেই সময় ফাঁক তালে চিন্হা মিটাবার জন্যে বহু ঝাঁড়া নিয়ে ঘরকে ঢুকল্য। দেখল্য ও বাবারে। মরাই এর চারঅ ধার ছল্লি হঁয়ে ধান পড়্যে রঁহেছে। শাহড়ি দে'খতে পালে, ভাল-মন্দ এখন খাওয়াবেক যে পেট ভরে্যে যাবেক। খুড় শাশুড়ির ঘর আর খাতে যাতে হবেক নাই। চাঁড় মাড় পাড়ন গড়া ঝে'টাতে ঝে'টাতে কি একটা ঝাটায় লটপটাঞ বাহিরাল্য। এ মাগো! জিয়ন্ত সাপ। বহু ঝাটার মুড়হায় মারে্যে সাপটাকে মরাল্য। মানে মানে ফেলাতে গেল। ননদ দে'খতে পাঁয়ে ব'লল; -"কি বঠে বহু! সাপের পারা দেখাছে মনে হছে।"

বুড়হির বিটিয়ে দেখল্য। দেখ্যেই চিন্হে ফেলল্য। ঘরের ভিতরে উটাকে উ দে'খেছে। বুড়হি বিটিকে চিন্হাঞঅ দিয়েঁছিল। টুকু বাদেই বুড়হি বাঁধেরলে ঘুরল্য।

—"কি বঠে বিটি! কি বঠে বহু?

—"হাই ভাল্ মাঞ! ধন বড়া সাপটাকে বহুই মারে্যে নিয়ে ফে'লতে আস্যেছে।"

শুনেই বুড়হিকপাল চাপড়াঞ কাঁদতে বস্যে গেলঅ।

—*"ই তুঁই আমার কি করে্যে দিলি লো, আঁটকুড়ির বিটি..."*

মনের খেদে বুড়হি ঐ যে ব'সল্য। আর উঠল্যই নাই। টুকু বাদেই ভুয়েঁই ঘ'লটে গেলঅ। ধক্ ধকিটা থিরাঞ গেল। শুনা যায়, আস্তে আস্তে উয়াদের ঘরের অবস্থা আগের

পারাই হঁয়ে গেল।

(২)

এক গাঁয়ে এক বুড়্হা ছিল। ওই ছিল গাঁয়ের মাহাত। গাঁয়ের মাহাতকে লকে যেমন মান্য করত। উয়াকেও তেমনিই মা'নত। বুড়হা যেমন তেজিয়ান তেমনেই রাশভারি লক ছিল। গাঁয়ের যে কনঅ কাজে-ভজে, বিপদে-আপদে লক আস্যে মতামত লিথ। না যাতে পা'রলে মান্যমান ঘর পঁহুচায় দিয়েঁ যা'থ।

মাহাত ঘর ব'লে কথা। উয়াদের আগেরলেই বাঁধ-বাগান ছিল। তখনঅ ঘরের জম-জমাট অবস্থা। বেটা-পুতা, লাতি-লা'তনা নিয়ে ভরাট সংসার। একবার উয়াদের হঁয়েছে কি, মকর পরবের বাঁউড়ির রা'তে। ঘরে হরেক কিসিম্ পিঠা-লাঠা হছে। যার যেটা পছন্দ হাঁ'সে-খে'লে.খাছে। লাতি-লা'তনারা দু-একটা টুসু গীত গাইছে। পাশেই ছামড়া বাঁধা হঁয়েছে। উখিনে গটা রা'ত ধমসা-মাদ্যল নিয়ে টুসু জাগরণ করা হবেক।মাহাত ঘর লক-ন আসা-যাওয়া ক'রছে। ইটা-উটা নিয়ে যাছে জাগরণের কাজে। একজন ত বল্যে গেল। মাহাত দিদি এক ঝুড়ি পিঠা লা'গবেক। রা'তে আমরা সবকাই খাব। আর বছর ভুলাঞে ছিলে। আম্‌দে কমতি প'ড়েছিল। মাহাত বুড়্হা কুল্‌হির ছামড়া তল দিগেরলে হাতের ঠেঙা দিয়েঁ ঘর ঢুকল্য। হাঁকাই সবাইকে শুনাইঁ শুনাঁই বলল্য- “সবারেই খাঅন-দাঅন হ'ল গো। এরে, লাতি তল হাথে-ত লপায়ে চপ-চপ্যা সাঁচি মাখ্যে ঘুমাবি। না তেল লিলে ভূতে রক্ত চুস্যে খাবেক। বুঝলি?” কাছেই বুড়হার এক লাতি-আর এক লাত্‌না দাঁড়হাই ছিল। উয়ারা ঠাকুর দাদার কথা শুনল্য। শুনেই বড় লাতি বলল;- —“উটা তুমাদের আমলে ছিল। এখন দিন ব'দলেছে। আমরা তেল লিব নাই। দেখি ন ভালা ভূতে কেমন রক্ত চুসে।”

রাশ ভারি বুড়হা লাতির কথা শু'নে গুম মারে গেল। গটা গাঁয়ের লক কেউ কবু উয়ার কথার অমান্য করে নাই। ভাবনার কথা, ঘরেরই নিজের লাতিয়ে মুহের উপর জবাব দিল! ডিবরির পেছুই তলেই অন্ধকার? মনগুমানে উ তখন করল্য কি? কাকউ আর কনঅ কথা না বলেই ঘর ভিতরে কাঁথা ঢাকা নিয়ে সাটাং ঘুমাই দিল।

পর দিন মকর ঘরের যে যাহার পরবে মাত্যে রহল্য। ই-দিগে বুড়হা এক ফন্দি আঁটল্য। কাকেউ কনঅ রকম বুঝতেই দিলঅ নাই। অন্য দিন যে করে তেমনিই সিনান খাওয়া-দাওয়া কর‍্যে কুলহির বারান্দায় লকজনের সঙে দিবি খোস-মেজাজে গল্‌ফ ক'রতে লা'গল।

তারঅ পরের দিন আখ্যান। হালপুন্‌হ্যা হঁয়ে গেছে সবারের খাঅন-দাঅন হঁয়ে গেছে। তাবাদে ঠিক দু-পহরের সময় তিন-চার লক মাহাত বুড়ার ঘরে আস্যে বসল্য। তার পত্যে এক লকে বলল;— ‘ইহা হে মাহাত কাকা! বহুত দিনলে লিবার ত মন

ছিল বাবা! কিন্তুক ব'লতে সাহসে কুলায় নাই। যখন শুনলি, উটা বিকবে, তখন শু'নেই দৌড়ে আলি।"

—অন্য এক লকে ব'লল;—"একলা ত কেউ লিতে লারব দাদা। আমরা সঁগ্যা হঁয়েই লিব।"

—"দেখ জেঠা! আমরা তুমার ছেল্যার পারা, নিজের লক। দাম ত বহুতেই হবেক জেঠা! আমরা কি অত দিতে পা'রব? টুকু কম-ঝম্ লাও।"

— "আরঅ একটা কথা ফ'চ্ছ করে আগাম খুল্যে বলায় ভালঅ। টাকাটা কিস্তি কর্যে লিতে হবেক মাহাত বাবু। আমাদের মুহা-জহার ত দরকার।"

—"বলছিস্ যখন অত ক'রে, তরহা যেমন পারবি কেরমেসে কেরমেসে দিবি। তদের বাপ-ঠাকুরদাদার আমলের দেখছি। তারপত্যে আমার টাকার খেলাপ করবি নাই সেটা আমি জানি।"

—"কত লিবে বল। বায়নার টাকাটা তাহলে ধরঅ।"

—"এ গো! শুনঅ। পিঠা-লাঠা আছে? যদি নাই থাকে ত গরম কর্যে এক গিলাস এক গিলাস দুধেই দিয়েঁ যাও।"

—"এখন আমরা কিছুই খাব নাই। এই ত খাঁয়ে খায়েঁ হাত পুঁছে পুঁছে আলি।"

— "জানলিস্ ব জাতরা ভাতিজা। বাখ্যল ছাড়্যে লৌতন ঘর কর্যে উঠে আলি তা বাদেরলে বড়অ বাঁধের দিগে আর বহনেই নাই। বাঁধ নাময় আমার কনঅ জমিঅ নাই। মাছ ভালই হয়। তবে কি তরহা ত সোব জানিস বাবারা। সামান্য জল পাটান নিয়ে ভায়াদি লিয়াই। পাঁচত-ছ বছর মাছেই ছাড়েই নাই। উয়ারা কেউ আমাকে কিছুই বলে নাই। আমিঅ মেটাবার চেষ্টা করি নাই। ভাভলি, দু'তরপেই থকুক। এক বাঁধ কুড়াঞছি বলেয় আরতেমন গরজ নাই।"

—"সে আমরা জানি হে জেঠা। তুমি একদিন বললেই মিটে যাবেক।"

—"এক কাজ কর। যতটুকু পারবি, জগাড় কর। এই মাঘ মেঘেই পাকা লেখা লেখ্যে দিব বুঝলি।"

—"তাহলে আমরা উঠছি, মাহাত বাবু।"

একে একে মাহাত বুড়হাকে দন্ডবৎ ক'রে সবাই চল্যে গেল। ঘর গুসটি কান অড়াই কথাবাত্তা শুনতেছিল। সোব লক উঠে যাতেই সবাই আস্যে বুড়হাকে ঘের্যে ধরল। আর ব'লতে লাগল; —"আমাদের কিসের অভাব যে বাঁধটা বিকতে হবেক? একটা মান-সম্মানেরকথা বঠে। নাই বা কিছু পালি। কুটুম-বাটুমকে দেখাঞ ব'লতে পারি কুলহি মুড়ার এই এত বড় বাঁধের আমরা আধধেক ভাগিদার। কন্ বাপ চৌদ্দ পুরুযে কর্যে দিয়্যেঁ গেছে .....। তুমার মাথা খারাপ হঁয়েছে। ...."

—"মাথা আমার ঠিকই আছে। বিকব বল্যে কথা দিয়েঁছি, বিকবই লাভেই যখন হছে নাই। ফল তাই রাখ্যে কি হবেক?"
—"আরঅ ব'লছ মাথা খারাপ হয় নাই। মাথার গন্ডগোল না থাকলে এমন কাজ কেউ কখন করে?" আমরা সবাই মেল্যে বলছি বিকতে পাবে নাই।"
—"ফালতু জিনিসটা রাখতেও সবাই এক মত?"
—"হঁ-হঁ, আমরা সবাই এক মত।"
—" বাঁধটা আমাদের পূর্ব পুরুষের করা ইটায় সবাই এক মত?"
—" হঁ, হঁ, এক মত।"
—"ঘর গুসটি এক দিগে হঁয়েঁ সবাই ব'লছ এক মত, এই ত? তোমরা আমাকে ব'লছ আমার মাথার গন্ডগোল আছে আর আমি দেখছি তুমাদের মাথা খারাপ হঁয়েছে।"
—"কি কর্যে বুঝলে? বুঝাই দাও।"
—"এইবার ঠান্ডা মাথায়, কান লাগাঞ আমার কথা শুনঅ। বাঁধটা একটা জমি সম্পত্তি। ইটা বাপ চৌদ্দ পুরুষের করা আর বাঁউড়ির রাতে তল হাথে তল পায়ে তেল লিয়া এই নিয়মটাও চৌদ্দ পুরুষের করা। বঠে ত? আমি ঠিক বলছি ত?"
—"হঁ বলঅ, আমরা শুনছি।"
—"বাঁধটা সম্পত্তি বঠে, ইটা ছাড়তে কষ্ট হছে। আর নিয়মটা কি সম্পত্তি সেটা চ'খে দে'খতে পাছ নাই। ভাল কর্যে বুঝে দেখবে। আমাদের পূর্ব পুরুযরা আমাদের জন্যে যে নেগ-নীতি-নেগাচার করে দিয়েঁ গেছে। উয়ার ভিতরে কি গুঢ় রহস্য আছে আমরা কি ভাল ভাবে উটক্-পাটক্ করে দেখেছি? বিচার বিবেচনা, যুক্তি করেছি। আমার যুক্তিতে যদি মনে হয় আমার ক্ষতি হবেক তাহলে সেটাকে বাদ দাও। আর যদি দেখি লাভ না হউক কনঅ লসকান নাই সেটা বাদ দিয়া ঠিক হবেক নাই। বলঅ আমি ঠিক কথা না মাথা পাগলার মত বকছি?"
—" হঁ-হঁ তুমি ঠিকেই ব'লছ। আমরা অত ভাভি নাই।"
—"আ'জ সাত পুরুষের নেগ-নীতি মানছ নাই। কাল দিন আমাকে মানবে নাই। পরদিন কেউ কারো বাপকে মানবেক নাই। স্ত্রী স্বামীকে মানবেক নাই। যেমন খুশি চলবেক। কেউ কাকউ মানবেক নাই। সমাজ সংসার সোব এমন করলে ছতিছিন্ন হঁয়ে যাবেক। সমাজ বল্যে কিছুই থাকবেক নাই। বাও-বাউন্ডুল্যা।, হালে-ডালে হঁয়ে মানুষ ঢন্কে ঢন্কে ম'রবেক। এই ব'লে দিলি....
—"আমাদের দোষ হঁয়েছে দাদু। না বুঝে.... ব'লতে ব'লতে বড় লাতি দাদুকে পায়ে হাত দিয়েঁ গড় করে। দেখা-দেখি অন্যেরা গড় করে। মাহাত বুড়হা জোরে হো-হো ক'রে হাঁসে হাঁসে বলে—"হঁ, আমি বাঁধ বিকব?যেমন আমার আর বড় বাঁধটা বিকা

ছাড়া কনঅ কাজেই নাই। আমি বিড়ে দেখলি, তদের দম কত ধুর্ তড়িক।”

লাতি-লাতনারা মাহাত বুড়হাকে ঘেরো্যে দাঁড় নাচ লাগাঞ দিলঅ। বহু-বিটিরা মুখে কাপড় গুঁজে হাঁসি ঢা'কতে ঢাকাতে যে যার কাজে চল্যে গেল।

*** অবশেষে :**

অবশেষে বলা যায়; সুদীর্ঘকাল ধরে কুড়মি, কুইরি, কুমার, ভূমিজ, রাজোয়াড় প্রভৃতি কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষজনের সম্পূর্ণ জীবন-জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। এই কাজকে নিজেরা যেমন গর্বের কাজ বলে সম্মানিত বোধ করতেন। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরাও সম্মান জানাতেন। তাঁরা শ্রম করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির মানুষের ধারণা ছিল—

“আগে মরে ঝুড়ি-ঝাঁটি,
তাপর মরে জল্হা-তাঁতি।
তবু চাষা মরে কিনা মরে।।”

অর্থাৎ কৃষিকাজে নির্ভরতা অধিক মাত্রায় ছিল। আকাল-সকালে কৃষক সহজে মরে না। আরও ধারণা ছিল—

“উত্তম ক্ষেতি,
মধ্যম বান,
ধিক্ চাকরী
ভিখ নিদান।।”

অর্থাৎ কৃষিকাজ উত্তম। ব্যবসার কাজ মধ্যম কাজ। চাকরী করা কাজ নিকৃষ্ট কাজ। ভিক্ষা বা অসম্মানের কাজ। আধুনিক প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের পেশার প্রতি টান কম হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। চাকরী ও অন্যান্য কাজের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। সহজ সুখ-সুবিধা পাওয়ার মোহে ছুটছে। চাকরীতে সম্মান, বেশী মাত্রায় অর্থ পাচ্ছে। চাষের মত ঝুঁকি নেই, নিশ্চয়তা বেশী। চাষ ছেড়ে তাই অনেকেই চাকরী করতে যাচ্ছে। ফলে জীবন-জীবিকার পরিবর্তন ঘটছে। কৃষিকাজের উপর নির্ভরতা কমছে। নির্ভরতা না থাকলে সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা থাকবে কি করে? জীবিকার পরিবর্তন হলে জীবনচর্চারিও পরিবর্তন আসতেই পারে। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায়; কৃষিকাজ ছাড়া গতি নেই। যতদিন পৃথিবী থাকবে কৃষিকাজ থাকবে। যেই যা যত কিছুই করুন পেটে দানা না পড়লে সবই অচল। অতএব কৃষিকাজ থাকবে। কৃষি থাকবে। কৃষক থাকলে কৃষক সংস্কৃতি থাকবে।

বর্তমানে সমাজে যে রকম সমস্যা, জটিলতা, বিশৃঙ্খলার প্রবণতা বাড়ছে। মানুষ ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের দিকে অধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়ছে। বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতাবোধ, সহনশীলতা

দিন দিন কমে যাচ্ছে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। জোরের সঙ্গে বলতে পারি যদি কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির দর্শন ভাল ভাবে জানেন, বোঝেন এবং মানেন তা হলে মানুষের কোনরূপ সমস্যা থাকবে না। সুখে শান্তিতে, সহজ-সরল হয়ে, পরিবার পরিজন নিয়ে, হেসে-খেলে, কাল কাটাতে পারবেন। সবাইকে আপনজন ভেবে, আপন করে নিয়ে ভায়াচারি ভাবে গলা জড়াজড়ি করে, হাত ধরা-ধরি করে আনন্দে গাইতে পারবেন—

"ট্যাঁড়ে সাজে গাই পাল,
(আর) খেতে সাজে ধান রে।
মাঞের কলে ছেল্যা সাজে,
যেমন লৌতন চাঁদ রে।।
অহ-মরি হায় রে হায়,—
মাঞয়ের কলে ছেল্যা সাজে
যেমন লৌতন চাঁদ রে।।"



*** গ্রন্থ পঞ্জি :-**

১। কুড়মালি ভাঁউঅর- অননতঅ কেসরিআর
২। কুড়মালি ভাষা সন্ধান- শ্রী ভগবান দাস মাহাত
৩। খাখুস- আনন্দ খুঁটদার
৪। মানভূমের কৃষি সংস্কৃতি - ড. নিমাই কৃষ্ণ মাহাত
৫। ঝুমুর কথা - বাংলা নাটক ডট কম
৬। কুড়মি কুড়মালি - ডাঃ মনোরঞ্জন মাহাত

*** যাঁরা তথ্য, তত্ব ও গীত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন :-**

১। কর্মবীর মাহাত- জামবাদ মিলন আখড়া, কেন্দা, পুরুলিয়া।
২। চারিআন মাহাত- ফুসড়াবাদ, পাড়া, পুরুলিয়া।
৩। কিরীটি মাহাত- রামকৃষ্ণপুর, পাড়া, পুরুলিয়া।
৪। সাধন মাহাত- সেরখাডি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।
৫। শক্তিপদ মাহাত- চিটিডি, আড়ষা, পুরুলিয়া।
৬। লালমোহন পরামানিক- জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া।
৭। গৌতম মাহাত- জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া।



KUDMALI FOLK SONGS :
IN THE LIGHT OF INDIAN CLASSICAL MUSIC

Dr. Binapani Mahato

GENERAL INTRODUCTION:

Two streams of Indian music - classical and folk are flowing in India. Classical music is the music of a class while folk music is the music of the folk people. Numerous traditions of Folk music are found in India. Folk music, folk song and folk dance are comparatively recent expressions. They are extension of the term 'folklore' which was coined in 1846 by the English antiquarian William John Thoms. Folklore is the Lore of the people, which includes every dimension of the folk life.

The aim of this paper is to explore the relationship between the *Kudmâli* Folk songs and Hindustani Classical music. Reviewing *Kudmâli* Folk Songs in the light of Indian Classical music is an arduous task. This involves comparison between the two different streams and in doing so; chances are there to affect the dignity of both the forms of music. However, a modest attempt will be taken here to unfold *Kudmâli* folk songs as desired.

Area of Hindustani Classical Music and Kudmâli Folk Songs:

Two types of classical music such as Hindustani and Karnatak music are vogue in India. Hindustani classical music is prevalent in various states of north, east, west and central India. It is in vogue among the elite and

urban class *Kudmi* people of Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

Kudmâli folk songs are prevalent in the Greater Jharkhand Region which is comprised of Purulia, Medinipur and Bankura districts of Bengal, Jharkhand state and Mayurbhanj, Kendujhar and Sundergarh districts of Odisha. *Kudmâli* folk songs prevailing in this vast region of Eastern India are the most valuable cultural markers of the *Kudmi* people of ancient Dravidian stock.

Origin of Hindustani Classical Music and Kudmâli folk Songs:

The history of Classical music dates back to Vedic period. According to Dr. Suniti Kumar Chottopdhyay, 'Rig-Veda, the first among the Vedas was written between1000 to 900 B.C.' Aryans sang chants comprising a number of different tones during their religious ceremonies. From Vedic literature it was known that the Vedic chants, or *Sâmanas* were set to melodies. The chants of '*Sâma Veda*' were known collectively as *Sâmagâna*, which is regarded as the root of Hindustani classical music.

On the other hand, origin of *Kudmâli* folk songs with all probability dates back to the Neolithic period when people entered into agriculture stage and later flourished in the Indus Valley. Many *Kudmâli* songs are still prevailing in this region that stood testimony to the earlier settlements of the ancestors of the *Kudmis* of the Greater Jharkhand Region in Indus Valley, the civilization which is well known for agriculture. Dr. Prafulla Chandra Ghosh quoted John Marshall in his "*Prâchin Bhâratiya Sabhyatâr Itihâs*" who opined that 'Mohenjo-Daro civilization was flourished from 3250-2700 B.C.' That means, people of Indus Valley were much advanced and well settled there with agriculture, culture and trade before Aryans came to India.

Places like Mohenjo-Daro, Harappa, Kurram valley were once the abode of the ancestors of *Kudmi* people of who lived; did cultivation and trade in that region. This is being revealed through their folk songs that are still vogue in the Greater Jharkhand region. It won't be out of place here to quote some songs which reveal the connotation. The following *Jâwâ* song gives a hint about the early settlement of *Kudmi* community

near *Kurram* hill and in the basin areas of *Kurram* River. The east bound Kurram River is flowing between the boarder of north Afghanistan and Pakistan and is a tributary of River Indus. The song is in the ancient 'question and answer' form.

Jâwâ -Song:

Question : Konere Karam Gosâin ânala newuti,

Who has invited God-Karam for worship?

'Kurrum' nedik dhârin koner kerala kheti?

Who did cultivation on the basin areas of River Kurrum?

Answer: Tohari benâual khetin **'Kurrumek'** pâni,

You had prepared the land and did cultivation using the water of ***Kurrum*** *River,*

Chhauâ putâ lehin Gasâin, kerale kheti.

With your family you did the cultivation.

The following three songs suggest about the settlements in and around Harappa. The first song points the celebration of *Karam* worship in Harappa city. The song depicts about a woman who invites her friends to go to Harappa city to celebrate *Karam* festival. They followed the uneven, rocky and zigzag hilly-tract with ups and downs to reach Harappa city. On the way her toe-ring had broken into pieces.

1. 'Haradi' Nagare Karam bheli

   Karam celebration is going on in ***Harappa*** *city,*

   Châlâ Sakhi, dekhane jâb.

   Friends! Let us go there to celebrate the festival.

2. Uncha chadhohite, nicha nâbhohite

   We scaled the hill and descended on the other side.

Bichhiâ to helâ chhaka-chhun.

Alas! My toe-ring had broken into pieces on the way.

A clear mention of Harappa city and River Indus (Sindhu) may be observed from the following *Kudmâli* song. The fear for crossing the mighty river has also been captured in it.

Stanza 1. Wife- Kaise âwole Piyâ, "Sindh" pâre gau?

How have you crossed River Indus, My Love?

Ohe dekhi mor gât dur-durâi gau.

My body started shivering thinking of that.

Stanza 2. Husband- Main tor râkholâhi, Nâuwâ Tonki Bhârauwâ,

I brought everything your Mother-in-law kept for you in the new Bamboo basket,

Tor binu kândai "Harappân" Bâkhariâ.

Our Harappa-house wears a deserted look and weeps in your absence.

Settlements in the land of five rivers, their cultivation of vegetables and use of bullock-cart (*Sagad*) as a vehicle for carrying things has been mentioned in the following old *Jâwâ* song. Land of five rivers refers to none other than Indus valley. Five rivers of Indus Valley comprise River Indus and its tributaries i.e. *Jhelam, Chenâb, Ravi, Beâs* and *Shatluj*.

Stanza 1. Barise uthal jâi Panch ladik* muhân gaw,

The basin area of Five- rivers was swollen with rain water,

Dekhi mor hiyâin dor dhuke.

I was frightened and my heart was sinking at this dreadful situation.

2. Kaise piâ degabe "**Panch-ladik**" * muhâin gaw,

O my Dear! How will you cross the basin area?

Keise piâ pahanchaba Sâsuke dehari.

O Dear! How will we reach mother-in-law's house?

CHARACTERISTICS OF HINDUSTANI CLASSICAL MUSIC AND KUDMALI FOLK SONGS:

Basic Nature of the Two Music Streams:

The basic nature of classical music and *Kudmâli* songs are different from each other. Classical music is individual oriented in which only one artist performs at one time. This gives ample scope for exhibiting individual artistry. *Kudmâli* songs are mass oriented and as such, there is no room for individual artistry in it. Rather these songs are unitedly sung by the people.

Basic Aim of the Two Music Streams:

The aim of classical music is to attain self-realization and emancipation (*Moksh*). It requires years of deep devotion, ardent dedication (*Sâdhanâ),* inculcating practice and discipline eventually leading to self-realization. It is said that by virtue of his *Sâdhanâ,* Tânsen, the legendary siger of Hindustani classical music of the bygone years was capable to generate heat around through singing *Râga Deepak*. In the highest conception, art, religion and music are synonymous. Music is an instrument for the realization of God in which a song acts as the medium of worship. Life of *Meera Bâi* is an example of it.

Kudmâli folk songs on the other hand are functional in nature. These songs aim at fulfilling desired goals. This can be seen from the *Jâwâ, Karam* and *Bândnâ* songs which are linked with germination, good harvest and to raise cattle wealth respectively. Primitive people believe that by sincerely performing ritual activities they can influence nature to obtain their desired goals. Regarding this, John Harrison in his 'Ancient Art and Ritual- P.47' writes, "When a savage wants sun or wind or rain, he does not go to the church and prostrate himself before a false god; he summons his own tribe and dances a sun dance or a wind dance or a rain dance .... That by the law of sympathy such dramatic representation or imitation would help in some cases in bringing about state of things imitated....just as it is believed that ceremony of dramatic rain making is sure to be followed by the actual rain." In this regard Lewis Spencer writes about

Ritual Drama' of primitive people in his book 'The Outlines of Mythology' (Premier Books-1961, P.47) in the following manner. "...These plays or nysteries were repeated at the appropriate seasons when they were hought necessary for the quickening of those processes of nature which eplenished the stock of game and caused the seed to grow by the acts of imitative or symbolic magic rehearsed in them the gods of nature were believed to be roused to action beneficial to man."

Basic Feature of the Two Music Streams :

The basic feature of classical music is its "*Râga*-system" (*Râg-Pradhân*) in which unfolding of the *Râga*-personality reigns supreme. The most significant and complicated feature of classical music is to explain and understand the *Râga*, the soul of classical music. There is a saying in *Sânskrit*- "*Ranjayati iti Râgah*"- which means that, a *Râga* is that which colors the mind. Though the term *Râga* as a melodic scheme was in existence in *Bharat*'s time (200 B.C. / 200 A.D.), it was Sage *Matanga* (6th century A.D.), who for the first time laid down a clear and specified definition of '*Râga*' in his text 'Brihaddeshi' and dealt with *Râga* as a technical term in the following *Sânskrit shloka*:

"Yo-sou Dhwanivisheshastu swaravarna-vibhushitah I
Ranjako Janachittanâng Sa Râgah Kathita Buddheih II"
(Brihaddeshi, 281, P.81.)

Every note in musical system is not only a tone, but also carries within it a certain expression or emotion. The total expression of the notes of a *Râga* with their mutul relationships creates a powerful identity of the concerened Raga. *Râga* is bounded by strict laws of grammar. The artist is required to elaborate and unfold the *Râga* - personality on the lines of its prescribed laws. Altogether, classical music is Art music.

In contrast, the basic feature of *Kudmâli* songs is emotive or '*Bhâv-Pradhân'* in nature. Mass participation and emotional content of the songs having socio-psychological background give pleasure and a complete sense of satisfaction to the people who remained united through it. However, *Kudmâli* songs are not completely devoid of *Râgas*. There are some songs having *Râgas,* which are colloquially known as "*Reg*". Various *Regs* or melodies such as *Jhingâ-Phuliâ, Petiâ-Medhâ, Khemtâ, Gadhuâ, Rinjhâ-*

Mathâ, Udâ-Khândiâ are found in *Pântâ-Sâliâ Karam* songs that are danced away during *Karam* festival in the month of *Bhâdra* (September*)*. These *Regs* also have clear and distinct melody patterns assigned to each of them. But, these *Kudmâli* melodies are simple and are not as developed and complicated as classical *Râga*-melodies. Who knows the ancient *'Reg'* might have been the source of inspiration for the development of the *Râgas* of classical music. It is a matter of further research.

<u>Time Theory of Classical Râgas and Kudmâli Folk Songs:</u>

Classical music is bounded by the singing time which revolves around twenty four hours of the day and night. A specific emotion is ascribed to each *Râga*. Singing time is laid down as per the *Râga*-character or emotion befitting to the mood of a particular time of the day or night. Accordingly *Râgas* are sung as per the time cycle prescribed for them. Each *Râga* in order to be truly efficacious has to be sung in its scheduled time. There are morning -*Râgas*, afternoon- *Râgas*, evening- *Râgas,* midnight- *Râgas* and so on. The twenty four hour time cycle is divided into some slabs. For example *Bhairab* and *Bhairavi* with their varieties are sung in the early morning. *Hindol, Lalit, Vibhâs* etc. are sung next to it. *Todi* along with its varieties, *Deshi, Mâlgunji and Jounpuri Râgas* are sung in the second slab of the forenoon. Next to it come *Sârang* and its varieties that are sung during the mid day. *Bhimpalâsi, Purvi, Multâni, Puriâ- Dhanâshri* etc. are sung in the afternoon. *Râga Shri* is sung during sun set- the conjuction period of day and night. Singing time for *Yaman*, varieties *of Kalyân like Shyâm Kalyân, Puriâ Kalyân, Jemini Kalyân and other Râgas like Bhupâli, Kedâr, Kâmod, Chhâyânat* is the first slab of the night. *Durgâ, Shankarâ, Sindurâ, Bihâg, Khamâj, Tilak Kâmod, Jaijayanti, Râgeshri* etc. are sung between nine to mid night. *Darbâri* and *Miân Malhâr* are midnight melodies. *Sohini, Paraj and Kâlingadâ Râgas* are sung in the last slab of the night.

Artists are strictly expected to maintain the time cycle of the *Râgas* while performing. However, there is relaxation of singing *Râgas* such as *Miân Malhâr* during rainy season and *Basant* and *Bâhâr* during spring season respectively when they can be sung beyond their scheduled time. For this they are known as seasonal melodies (*Mousumi Râgas)*. In normal days, *Miân Malhâr* is sung during midnight, but with its varieties like *Jayant malhâr, Megh Malhâr, Sur Malhâr, Râmdâsi Malhâr* can be sung any time

during rainy season. Similarly, there is no time bar to sing *Basant* and *Bâhâr Râgas* with their varieties during spring season.

The musical compositions of seasonal *Râgas* generally depict the nature of the concerened season. Here are some examples:

Spring Season: (Composition in *Bâhâr*):
(Pt. Vinayak Rao Patwardhan)

Sthâyi: Nabala Ranga Nabala Phula, Nabala Shobhâ Jamunâ Kula,
Nabala Saghana Beli Druma Prafullita Chahun Oura.

Antarâ: Lalita Nayi Gulma-Latâ, Châtaki Châtaki Khilata Kali.
Bikashe Taru Pât Naye Naye Bourâ.

RainySeason:(Composition in *Miân Malhâr*)
(by-Prof. Narayan Vinayak Patardhan)

Sthâyi: Ghana Gagana Chhâyori,
Ghananana Garaje dâmini damake,
Mehâ Barase Pawana Chalata Ata Jor

Antarâ: Sâwana Ki Ritu Ayi, Bundana Ki Jhara Lâyi,
Dâdurwâ Bole Marawâ Karata Ata Shor.

It is found that, *Kudmâli* folk songs also maintain singing time. Especially *Karam* songs are performed as per their prescribed time. Different *Regs* of *Pântâ-sâliâ Jhumar* songs are sung as per their scheduled time during the dusk to dawn singing performance in the *Karam* night. They are divided into three categories such as Evening melodies (*Sânjh Beriâ* songs), Midnight melodies (*Âdh Râitâ* songs) and Early morning melodies (*Bhinsariâ* songs). Evening melodies like *Jhingâ Phuliâ, Chhalkawâ, Petiâ Medhâ, Khemtâ, Âd-Khemtâ,* characteristic of fast tempo are performed in the first part of the night; Midnight melodies like *Gâdhuâ* and *Mâduâ*- characteristic of slow tempo are sung in the second part of the night and small songs of early morning viz. *Thâd-Rinjhâ, Udâ-khândiâ, Jhinkâ* -characteristic of moderate tempo are sung in the last part of the night-long performance.

Generally *Kudmâli* folk songs are seasonal songs. Most of them are related to various seasons or stages of agriculture. For instance *Jâwâ* songs are sung for better germination of seeds, *Karam* songs for good harvest during rainy season, *Bândnâ* songs for cattle worship in autumn

and *Makar* and *Tusu* songs for the celebration of harvest in winter, spreading over the span of one year. Unlike classical *Râgas,* which are confined within twenty four hours of time cycle; *Kudmâli* folk songs take one year's time to complete the time-cycle for singing these songs. So, chance of singing one type songs comes after one year. From the following *Karam* song we can make out the one-year-cycle of singing the songs.

"Aij Tore Karam Râjâ Ghâre Duâire,
Kâil Tore Karam Râjâ Kâns Nadi Pâre.
Jâhu Jâhu Karam Râjâ **Eho Chhawa Mâs,**
Âwata Bhadara Mâs Ânaba Ghurâin."

Note:(As per Kudmi culture one year is comprised of six months (*Chhaw Mâs*) and not twelve. They are *Madhu Mâs, Kharâ Mâs, Barsâ Mas, Niran Mâs, Amal Mâs* and *Jâd Mâs*. Each of these six months is equivalent to two month's time of Hindu calendar. So, mention of "*Chhaw Mâs*" i.e. six months recorded in this song represents the time cycle of one year.)

Once a particular festival is over, related songs are seized to be sung leaving room for the songs of next festival. There is a belief that, untimely singing of songs causes illness.

Apart from this, there are *Kudmâli* songs of rainy and spring seasons also in which description of the respective nature and its impact on the human beings is found. Here is a *Karam* song depicting the nature of the rainy season.

Rainy season: (Karam Song):

Ânâwala Keriâ Megha, Barasalâin Pâni,
Rahi rahi Chahi Dâke, Dâke Bengâ Râni,
Bhâi, Barisâ Âgamo Jâni, Dâke Bengâ Râni.
Bhâi, Barisâ Âgamo Jâni.

Sârhul festival is held in the spring season during which Sâl flowers (*Shoea robusta*) bloom and are offered to the deities during worship. This is depicted in the following *Sârhul* song:

Spring Season: (Sârhul Song) :

Question: Kiâ phule Lâyâ Sârhul Pujâ?
Answer: Sâroi phule Lâyâ Sârhul Pujâ."

Learning Method of Classical Râgas and Kudmâli Folk Songs:

Classical music is learnt through the Teacher-Taught tradition known as '*Guru-Shishya-Paramparâ*'. The term '*Guru*' is significant because a '*Guru*' is more than a teacher. Similarly, a '*Shishya*' is more a disciple

than a student or pupil. Learning from the *Guru* starts through *'Gandâ-Bandhan'* or *'Nâdâ-Bandhan'* ceremony. In this ceremony the person who wants to learn music ties an auspicious thread around the ankle of the *Guru* and seeks his blessings. *Guru* accepts him as his disciple after judging his true mind set for the art. After *Gandâ-Bandhan* only, a *Guru* takes charge of teaching the nuances of *Râga*-music faithfully to his disciples (*Shishyas).*

The disciples begin with the voice training or acquiring the most basic techniques of the instrument as the case may be. In vocal music, the desciple learns to master over the notes first, then learn correct breathing process, voice and pitch control. Then they learn *Sargams and Paltâs* (*Alankâras*). Gradually they are taught compositions (*Bandishes)* of *Râgas*, which include songs of different forms sung to a meaningful text set in slow and fast tempo, rules of singing *Râgas,* gradual development of *Râga*-characters and so on. It takes years of assiduous learning; living, travelling with the *Guru* and rigorous practice (*Sâdhanâ*) for the disciples to master over the art. But time has changed. Now-a-days, classical music has been inducted into University academic curriculum. It is being taught in the colleges and universities as a subject as well as in the private institutions where students learn music from the professors of music.

Contrast to it, there is no training institution for the *Kudmâli* folk songs. Instead, like all other folk songs, *Kudmâli* songs are learnt by the process of assimilation. During various occasions of *Karam, Bândnâ, Tusu* festivals and life-cycle oriented ceremonies like marriage, children join their elders and follow them singing. Performing again and again in trial and error method gradually they assimilate, learn and master over the singing styles of various songs by the time they attain adulthood. In the same process they learn to play musical instruments too. Learning through assimilation is still in vogue in the region. Now-a-days attempts are being taken to introduce *Kudmâli* folk songs in the teaching curriculum of school, college and university level.

<u>Relation of Both the streams with Dance :</u>

Classical music either vocal or instrumental is independent of dance. Especially *Râgas* rendered in *Drupad , Dhâmâr and Khayâl* forms are bereft of any dance. However, *Kathak* dance is performed in *Thumri*

and other forms of light classical music.

In contrast, *Kudmâli* folk-songs like all primitive songs of the world are always associated with dance. They are inseparable. Both the dance and songs are known by the same name. For instance, the songs which are sung in the night of *Karam* festival with dance are known as *Karam* songs and the dance as *Karam* dance. Similarly there are *Jâwâ* song and *Jâwâ* dance, *Sârhul* song and *Sârhul* dance, *Jhumar* song and *Jhumar* dance and so on.

MUSICAL COMPOSITIONS OF THE CLASSICAL RÂGÂS AND KUDMALI FOLK SONGS:

The musical compositions of *Râgas* of Classical music are known as *'Bandish'* while various songs represent the musical compositions of *Kudmâli* folk songs. Lyric, Tune and Rhythm, the three components of the musical compositions are present in both the streams.

LYRICAL CONTENT:

Lyrical content of both the streams comprises language, subject matter and emotional sentiment (*Rasa*). These three aspects will be discussed under this head.

Language:

Musical compositions of *Râgas* are found in *Sânskrit, Hindi, Râjasthâni,* Punjâbi language *and Braja-Bhâshâ* (a dialect which is spoken in the region of Mathurâ and Vrindâban). Here are some examples:

a) Sanskrit Language:
(*Râga-Dhyân of Todi*)
"Tushâra Kundajwolâ Deha Yashti, Kashmira Karpura Bilipta Deha,
Binodayanti Harina Banânte, Veenâ-Dharâ Râjati **Todi** Ketham."

b) Hindi Language:
(Khayâl in Râg- Jog)
(N.V.Patwardhan)
Sthâyi: Dhun Shuni, Murali ki,
Madhura Rasa Bhini, Sudh nâ rahe Tanamana ki.
Antarâ: Rijh Rahe Sura Nara Muni, Brija Nâri Saba
Rasa-wasa bhayori Âli.

c) Braja- Bhâshâ:
(Khayâl in Râg- Purvi)
Sthâyi: Kon Gata Bhaili Mori, Âan Milo Aba Piyâ Moko.
Antarâ: Una Binâ kala Nâ parata Ghari Pala Chhina,
Keisake Raina Bitây Moko.

d) Râjasthâni:
(Lyric- Meerâ Bâi)
(Set in Hansa Kinkini)
Sthâyi: Râm Nâm Mere Mana Basiyo, Rasio Râm Rijhâun, E Mây!
Antarâ: Manda Bhagana Abhagana Kirata Keise Gâun, E Mây!
(Quoted from Râg- Vigyân, Part- V, Page. 160.)

e) Punjâbi:
(Khayâl in Râg Purvi)
(Guru Nanak Dev)
Sthâyi: Sâdho Govinda Ke Guna Gâwo. Manus Janama Amalok Pâyo
Birthâ Kâhe Gabâyo?
Antarâ: Patita-Punita Dina Bândhava Hari Sharana Tâhi Tum Âwo.

Kudmâli is the the mother tongue of the *Kudmi* community. Apart from the *Kudmi*s other tribal people such as *Sântâl, Mundâ, Bhumij, Orâon, Ho, Birhor, Sabar, Khariâ* etc. living here since time immemorial also speak *Kudmâli* though each tribe has its own language like *Sântâli, Mundâri, Bhumijâli, Kurukh* respectively. Thus *Kudmâli* serves as the Lingua-franca in this region. Examples of some *Kudmâli* songs are noted down below.

a) Bândnâ song:
* Ahire- Kaise Chinhabe Baradâ Chaita – Baisâkh Re?
Kaise Chinhabe Âsâdh Mâs, Bâbuho?
Kaise Chinhabe Baradâ, Âshina – Kartika Gaw?
Pahanchalâin Âmabasyâk Râit Re.
Ahire- Dhulâi Chinhabe Baradâ Chaita – Baisâkh Re,
Tâkâin Chinhabe Âsâdh Mâs, Bâbuho
Sisire Chinhabe Baradâ, Âshina – Kârtika Gaw,
Pahanchalâin Âmâbasyâk Râit Re.

b) Pântâ Jhumar:
1.Padala Bhâdar Mâs, Lâgala Naiharek Aas Gaw,
Nishidine Kehu nâ Dekhây, Moro Prâna Jây,

Bhâdara Gelare Sirây.

2. Bhâyâ Mor Âwalâ, Pithâ Sandes Ânalâ Gaw,
   Sâi Padisâin Sabhe bhelâ Sar,
   Nanadini Mor! Ebe Hâme Jâuwaban Naihar.
3. Âne Ge Singâr Pedi! Jhâdike Pindhaban Sâdi Gaw,
   Sinthe Sindur Nayane Kâjar,
   Nanadini Mor! Ebe Hâme Jâuwaban Naihar.

Subject matter:

Generally classical music compositions (*Râga Bandishes)* are comprised of subject matters like devotional, philosophical, erotic sentiment of union and separation and description of nature. A glimpse of the themes of these compositions may be seen below.

a) Devotional Theme:
(Bandish, set in Râga Bhupâl Todi)
(N.V.Patwardhan)

Sthayi: Tum Ho Budha Dâtâ, Girijâ Suta Eka Danta,
Tero Sumarana Kare, Sakala Dukkha Dur Hota.

Antara: Gaja Badana Ganarâj, Dukha nidân, Sukha Dâtâ,
Jo Tohe Dhyâwata, Mana-Ichhâ Phala Pâwata.

"This will be clear from the following examples"

b) i. Erotic Sentiment of seperation:
(Biraha Shringâra)
(Bandish, set in Râga Yaman)

Sthâyi: Yeri Âli Piyâbin, Kala Nâ Parata Mohe
Ghari Pala Chhina Dina.

Antarâ: Jabate Piyâ Paradesh Gamana Kino,
Ratiyâ Katata More Târe Gina gina.

ii. Erotic Sentiment of union-
'Milan Shringâr'
(Bandish set in Râga Tilak Kâmod)

Sthâyi: Ghara Âye Balam Morâ, Saba Mila Gâo Bajâo

Antarâ: Naye Phul ke Gajare Gunde Lâo,
Sab Mila Gâo Bajâo.

(Râg-Vigyân, Part-II, Page.63.
by Padma-Vibhushan Vinayak Rao Patwardhan)

c) Theme related to Nature:
Bandish- set in Râga Miân Malhâr

By Dr. N.V. Patwardhan

Sthâyi: Ghana Gagan Chhâyori,
Ghananana Garaje Dâmini Damake,
Mehâ Barase Pawana Chalata Ata Jor.

Antarâ: Sâwana ki Ghatâ Ayi, Bundana ki Jhara Lâyi,
Dâdurwâ Bole Morowâ Karata Ata Sor.

The 'all-embracing' nature of *Kudmâli* Folk songs touch upon very diverse themes and subjects. They incorporate all aspects of the life of *Kudmi* people and the physical nature that they inhabit. Subjects pertaining to their socio-politico-economic and cultural traditions, human emotions like devotion, love, affection, sympathy and hatred, pain and pleasure, belief and faith are vibrant in such songs. People's experiences of the beauty, abundance and catastrophes of nature also find vivid expressions in *Kudmâli* songs. The following songs will reveal this connotation. This will be clear from the following examples.

a) Devotional Theme:

(Pântâ Sâliâ Jhumar)

Âkhadâ Bandanâ Kari, Gâuneka Garâma Hari,
Âkhadâ Bandanâ Beja Nâri, Magane Jhumair Lâge Bhâri.
Karama Dâir Kâti, Âkhadâ Thâpanâ Kari,
Gopin Sabhe Kareire Upâsi, Âij Re Karamaker Râti.
Jâli Dihâ Gaw! Reshamek Bâti, Âij Re Karamaker Râti.

b) Philosophical Theme:

Bândnâ Song -

Ahire- Sabhe Parab Bhâlâ Ghuri Pheri Âwaye Re Bâbuho,
Nehin Ghurei Marala Mânus Re.

Karam Song :

Mânus Janama Jhingâ Phuler Kali Re,
Sânjhe Phute Sakâle Jây Jhari.
Tabu Phute Nâche Hânse, Pitthim Ke Bhâlo Bâse,
Jâbâr Belây Kânde Nâ Re, Bharasâ Sudhu Hari.

A majority of songs are based on family life and relationships among the members of the family. One example is given below is a Pântâ Shâliâ Jhumar based on the family life in Question & Answer format:

c) Family Life:

Question: Kane kudâwolâ Ahârâ- pakhoir, Madhur Mâlati Ge!

Kane kudâwolâ Chuân - Ghât?

Answer: Saiyâin kudâwolâ Ahârâ- pakhoir, Madhur Mâlati Ge!

Deorai kudâwolâ Chuân – Ghât.

d) Theme on Nature:

Natural Calamity-Famine (Kharâ):

Âsâdhe Taw Pâni Nain, Sarâbaneu Pâni Nain,
Bhâdareo Taw helâ Pânik Tân,
Aisâ Ke Jân, Rodâ Dekhi Udala Parân

Flood- (Bân):

Âwalâ Khâlek Bân, Leilelâ Khetek Dhân
Âide Basi Jhurata Nayân, Kaise Bânche Prân
Sânjhe Khâle Bihâne hekei Tân.

Kudmis are basically agriculturists by profession. It is natural therefore that many songs related to agriculture found place in the repertoire of *Kudmâli* songs of which the following song is an example.

e) Agriculture Related Theme:

(Jâwâ Song)

1. Upar khete hâr Dâdâ, Nâmo khete kâmin re,
   Kon khete rapaban Dâdâ 'Kâjar—Kâthi' Dhân re?
2. Upar-Kulhik bada khete, Kâmin khâtâ khâtâ Law;
   Mâhto ghârek mejhli bohu besiâm lei jây Law.
   Mude Mudhik thekâ, Kânkhe Gâgari Law;
   Kâmin râ taw khajat Bâli Gud

Emotions And Sentiments (Rasa)in Both the Streams:

Emotions like erotic sentiment; hatred, devotion and laughter etc. are alike among the people irrespective of being indigenous or elite; rich or poor. That is why, different emotional sentiments (*Rasas)* are found in *Râga*-compositions as well as in *Kudmâli* folk songs.

In classical music *Dhrupad* and *Dhâmâr* forms are characterized by devotional sentiment (*Bhakti Rasa*) found in praise of Gods and Goddesses like *Brahmâ, Shiva, Vishnu, Krishnâ, Durgâ, Saraswati,* Ganesh and *Hanumân* and the like. On the other hand, erotic sentiment (*Shringâra-Rasa*) arousing out of happiness of union (*Milan*) and melancholy in separation (*Biraha*) is dominated in *Thumri, Dâdrâ, Tappâ and Hori* forms. Both devotional and erotic sentiments are found in the compositions of

Khayâl. However there is no room for emotions like Hatred and Fear in music.

Examples from Classical music:

a) i. Devotion: (Drupad):
(Bandish, Set in Purvi)
Sthai: Mor-Mukuta Pita-Basana Sohata Mohata Navala Chhaila-Nandalal,
Yamuna ke Tata Tata Nata Jyon Nachata Gawata Tan Rasal.
Antara: Tana Mana Dhana Nyochhabar Karahun, Warun Motina Thala,
TANSEN Prabhu Tumhare Darasa ko Sundar Rup Gopal.
ii. (Khayâl)
(Bandish, Set in Jounpuri)
Sthai: Pâr Karo Naiyâ Mori,
Tuma Bin Koun Khebanhâr.
Antara: Ân Pari Majh-dhâr,
Bipata Mori Dur Karo Pâlanhâr.

b) i. Erotic Sentiment of Separation:
(Shringâra Rasa - Biraha)
(Bandish, set in Râga Jhinjhoti)
Sthâyi: Saiyan mein Jâgi Sagari Ratiyâ
Tumhare Kâran Jogan Banungi.
Antarâ: Jiâ Morâ Bekala Hota,
Itano Dukhwa Keise Sahungi?
ii. Erotic Sentiment of Union:
'Milan Shringâr'
(Bandish set in Râga Yaman)
Sthâyi: Mandilarâ Morâ Bâjana Lâgilo,
Âj More Ghara Ânanda Badhâi,
Jiâ Umanga Man Hulasâyilo.
Antarâ: Shyâma Sundar ki Ranga Bhari Murat, Bhâilo,
Saba Sakhiyan Mila Mangala Gâyilo.

The spectrum of nine human sentiments or 'Naba-Rasas' may be observed in *Kudmâli* folk songs. The songs display deep emotions alluding to Love (Sringâr), Devotion (Bhakti), Hatred (Ghrinâ), Fear (Bhaya), Filial Love (Bâtsalya), Heroism (Roudra), Sorrow (Karuna), Laughter (Hâsya) and Calm or Peace (Shânta). One can refer to the 'Bândanâ' (prayer) songs of various festivals and worships; 'Bidâi' songs and mother's love for her

daughter expressed in marriage songs as the examples of Emotions of Devotion (Bhakti-Rasa), Sorrow (Karunâ), and Filial Love (Bâtsalya) respectively. Emoţion of Love (Shringâr Rasa) is found in the love songs of Pântâ-Sâliâ and Darbâri Jhumar songs.

a) Devotional Sentiment (Bhakti Rasa):

Karam Song:

Âij Tore Karam Râjâ Ghâre Duâire Re,
Kâil Tore Karam Râjâ Kâns Nadi Pâre.
Dehu Dehu Karam Râjâ Dehu Âshis Re ,
Bhâi moro Bâdhata Lâkh Baris Re.

b) i. Erotic Sentiment of Separation
(Shringâra Rasa - Biraha)
(Pântâ Sâliâ Jhumar)

1. Âsâdh Sarâban Mâse, Piyâ Rahal Parabâse, Hâire!
   Keisane Rahaba Piyâ Bine, Bhâdara Barisâk Dine?
2. Jâdi Âwai Ekâdase, Râbkhiba Shyâm ke Rati-rase Hâire,
   Jâge Sadâ Sayane Sapane, Bhâdara Barisâk Dine.

c) Sorrow: (Karun Rasa)

Marriage Song (Bihâ Geet):

Sâdi dele Ghadi Dele, Nagad Tâkâ Dile
Hâte Sonâ Galây Sọnâ Moke Pindhâi Dele,
Sâjâi Deike Gaw Bâp, Kâhân Pâthâin Dele
Tor Jâlâ Guchâi Make Parek Hâte Dele.

d) Filial Love (Bâtsalya Rasa):

Âinkh Badiyin, Âinkh Badiyin - Kâkar Chhelyâ Kândei
Âisa Chhowâ Karâin Leb - Badi Dayâ lâgei.

<u>MUSICAL CONTENT:</u>

<u>Classical Raga Melody and Tune of Kudmali Songs:</u>

In this section various forms, parts, singing order, musical notes and the range of melodic movement of the classical *Râgas* and *Kudmâli* songs will be taken into consideration.

<u>Forms of Hindustani Classical Music and Kudmâli Folk Song:</u>

<u>Forms of Hindustani Classical Music:</u>

Classical music has a large repertoire of forms. Old forms of classical music like *Grâm-Râg, Jâti* and *Prabandha* became obsolete. Forms like

Dhrupad, Dhâmâr, Khayâl, Thumri, Tappâ, Sâdrâ and *Târânâ* are in vogue till date. Singing styles of these forms are different from each other. *Dhrupad* and *Dhâmâr* forms of music are dignified devotional forms of masculine nature and are known for the strict adherence to their formal aspects. There is no scope for the personal improvisation in these forms. The Rhythmic jugglery (*Layakâri*) makes these two forms quite mathematical in their discourse. Due to the rigidness *Dhrupad* has lost its popularity gradually giving rise popularity to *Khayâl*, a moderate form compared to its predecessors *Dhrupad* and *Dhâmâr*. *Sadârang* and *Adârang,* the court musicians of Muhammad Shah of Delhi made *Khayâl* popular whose *Khayâl* in *Braja-bhâshâ* - the dialect of *Braja* area impressed the emperor and gradually *Khayâl* became popular. *Khayâl* over shadowed *Dhrupad* and reached the zenith in the hierarchy forms of the classical music. Though *Râga* is the basis of melody for both *Dhrupad* and *Khayâl*, the later form is more flexible, emotive and lyrical in character. Unlike *Dhrupad* there is room for personal and artistic improvisation in *Khayâl.* Though purity of *Râga* character is strictly maintained in *Khayâl* too, artists can improvise in its elaboration (*vistâr*) as per their personal imagination.

Dhrupad, Dhâmâr and *Khayâl* forms are *Râga* oriented in which one cannot take any liberty to change the basic laws of *Râgas*. Although improvisation is there in the *Khayâl* form, dherence to rigidity of *Râga*-laws became responsible for the gradual decline of its popularity, giving rise to a comparatively mild form of *Thumri.* Wâjid Ali Shâh, the art lover, dancer-composer Nawâb of Lucknow had popularized '*Thumri*', a form well known for romanticism. In contrast to *Dhrupad, Dhâmâr* and *Khayâl*; *Thumri* and *Dâdrâ* comprise romantic lyrics. Compositions of these forms are generally set in the light *Râgas* like *Khamâj, Kâfi, Pilu, Pâhâdi, Tilang, Gârâ, Jhinjhoti* and *Bhairavi,* best suited to the emotive expressions (*Shringâra Rasa*). In these forms artists can take liberty to introduce more than one complementary *Râgas* to highlight various shades of erotic sentiments of the composition.

There is another form of classical music known as *Tarânâ* the compositions of which are found in the meaning less mnemonic and rhythmic syllables such as- tâ, nâ, ni, re, dim, tum, dâ, de, drim, gdân etc. are beautifully crafted in this form of music. *Tarânâs* are sung in various *Râga*-melodies but always performed after *Khayâ*l of medium or fast tempo. It is said that *Tarâna* was created by Amir Khusro (1253 -1335

A.D.) who had introduced the form with the amalgamation of meaningless syllables i.e. tâ, nâ re, di, dre etc. and Persian words like *Yâli, yalâli* and 'sher' also. Thus, it is found that *Tarânâ* form of classical music came into existence during Muslim period. The artists display their phonetic clarity and technical skill by achieving mastery over *Tarânâ*. Examples of compositions (*Bandishes*) of some of the forms of Classical music are given below:

i. Dhrupad.

(Rag Jounpuri)

Sthâyi: Chandramâ Bhâla Birâjata Bandhana Lasata Anga Shubha Shubhaga Râjata Eka Danta

Antarâ: Bighna Harana Ashta Sidhhi, Naba Nidhi-Dâyaka Gana- nâyaka Debahi-Daka Kantha.

Sanchâri: Lambodar Girijâ Suta, Abhaya Karatâ Shunda Danda Mushika Bâhana Kumati Hantâ

Âbhog: Chintâmoni Eka Ghanjana Chidânanda Chhedarupa Beda Guna Gâwata, Pâwe Tana pâra Jâko Âdi Anta.

ii. Khayâl .

(Râg-Jog)

Sthâyi: Dhuna Suni Murali Ki, Madhura Rasa Bhini Shudha Nâ-Rahe Tana Mana Ki, Âli.

Antarâ: Rijha Rahe Sura Nara Muni, Brija-Nâri Saba Rasa Wasa Bhayori, Âli.

iii. Thumri.

Sthâyi: More Mandira Abalon Nahin Âye. Kâ Eysi Bhul Bhayi Mose Âli

Antarâ: Prema Piyâ Bin Ânkhiya Taras Rahi, Kin Soutana Biramâye?

(Katthak Nritya- Lakshmi Narayan Garg, P.77)

iv. Tarânâ.

(Mâlgunji)

Sthâyi: Tana derenâ Dim Dim Tana Derenâ Tadani Dim Tadi Tana DerenâTadani Dim.

Antarâ: Udatana Derenâ Tanana Tana Derenâ, D N D P M P G M G R S G M Nag Dhet Dhirikita Tâk Dhâ Dhinâ Ghidanâg Dhirikita Tâk Katti Kidanâg Tâkdhân Kid-Dhâti Dhâ Kdân Kida Dhâti Dhâ.

(Composed By: Vishnu Digambar Palushkar, quoted from Râg Vigyân Part-IV, Page.100)

Forms of Kudmâli Folk Songs:

Different forms are also there in *Kudmâli* folk songs like *Jâwâ, Karam, Bândnâ, Tusu* and Life-cycle ceremonies i.e. marriage songs. All are different from one another and are sung during *Karam, Bândnâ, Tusu* festivals and marriage ceremony respectively. '*Tânhâretâ*' is another genre of *Kudmâli* folk songs. Like *Tarânâ* of classical music *Tânhâretâ* is sung with the help of meaningless syllables i.e. *tâ, hân, re, nâ* and so on. This is sung as a prelude, interlude and also after the song. As *Tarânâ* is sung in the *Râga* of the *Khayal* composition, *Tânhânretâ* is also sung in the tune of the song after or before which it is sung.

Apart from Jharkhand this type of compositions of meaningless sylables are prevalent in Uttar Pradesh, Chhattisgarh other parts of rural India since time immemorial. Amir Khusro, the originator of *Tarânâ* of classical music was born and brought up in Patiali in Etah district of Uttar Pradesh in northern India who served as the royal poet of King Gayasuddin Balban and Alaluddin Khilji of Delhi. It might have happened that he was inspired by this type singing which was in vogue since ancient time in rural India. Amir Khusro, being a Persian, might have added Persian words and 'Sher' into it to give a new look of the form in the realm of classical music. It is interesting to note the similarity and link between the nomenclatures of *Tâhânretâ* and *Tarânâ*, which is a pointer to this view. A glimpse of some forms of *Kudmâli* folk songs may be seeen below:

i. Life-cycle Song:

(marriage song)

Question: Kana Kanâk Pokhoir Tin Mâin, Phute Sâlukek Phul,
Kana Phule Lagana Dharây?

Answer: Purub Kanâk Pakhoir Tin Beti, Phutere Sâlukek Phul,
Sâluk Phule Lagana Dharây.

Question: Kana Phule Lagan Mâin Gaw! Kana Phule Bihâ Gaw?
Kana Phule Hewata Bidâi?

Answer: Sâluk Phule Lagan Beti, Âkand Pule Bihâ Gaw,
Pârâs Phule Hewata Bidâi.

ii. Karam Song:

Question: Kone Detau Sânkhâ Sâdi, Kone Detau Tâd Re,
Kone Detau Nâhângâi Mor Phudunâ Lâgâi Re?

Answer: Sâse Detau Sânkhâ Sâdi, Sasure Detau Tâd Re,

Deorâi Detau Nâhângâi Mor Phudunâ Lâgâi Re.

iii. Ahirâ song:

Question-

Ahire! Konehi Ge Gâi Toke Sirijalau Bâbu hou, Konehi Ânaleu Nâmhâi?
Konehi Ge Gâi Toke Ghâre Ghâre Bântalau,
Martya Bhume Delau Chhapalâin?

Answer-

Ahire! Issare Ge Gâi Toke Sirijala Babu hou, Mahâdebe Ânalau Nâmhâin.
Mahâdebe Ge Gâi Toke Ghâre Ghâre Bântalau,
Martya Bhume Delau Chhapalâin.

iv. Tânhâretâ:

(**Pântâ Sâliâ Jhumar**)

Tânhâ Re Tâ Nânâ Tânâ, Tânhâ Re Tâ Nâre Nâ,
Tânhâ Re tâ Nâ Re Târe nâ, Tânâ nâ, Tânhâ Re Ta Nâre Târe Nâ.

Parts of Music Compositions of Both the Streams:

Parts of classical music compositions:

In classical music, systematic development of a *Râga* is done through various parts of its music –composition (*Bandish*). Number of parts depends upon the forms of music. For example *Dhrupad* is comprised of four parts, namely *Sthâyi, Antarâ, Sanchâri* and *Âbhog*. Elaboration of *Râga* in Dhrupad starts from *Sthâyi* and proceeds to *Âbhog* through *Antarâ* and *Sanchâri*. Rest other forms like *Khayâl, Thumri* etc. have only two parts i.e. *Sthâyi* and *Antarâ*. Example of parts of the composition (*Bandishes*) of classical music may be seen from the discussion of the Forms of the Classical music mentioned above.

Parts of *Kudmâli* folk songs:

Kudmâli folk songs have two parts known as *Dhuâ* and *Kali. Dhuâ* and *Kali* may be compared with the *Sthâyi* and *Antarâ* of the classical music compositions respectively. The songs conclude after the singing of both the parts. Example of *Kali* and *Dhuâ* parts of the *Kudmâli* Folk song composition of Pântâ Sâliâ Jhumar variety (Question-Answer type) is given below:

Pântâ Sâliâ Jhumar: -

1. Question- Kali: Kâhân Mâlin Bâje Jodâ re Dhamasâ
Dhuâ: Sunâ Mâlini Ge! Kâhân Mâlin Bâje Karatâl.

Answer- Kali: Âkhadâ hin Bâje Jodâ re Dhamasâ

Dhuâ: Sunâ Mâlini Ge! Râjâ Ghare Bâje Karatâl.

2. Question- Kali: Keisan Keisan Bâje Jodâ re Dhamasâ

Dhuâ: Sunâ Mâlini Ge! Keisan Keisan Bâje Karatâl.

Answer- Kali: Hikid Gidin Bâje Jodâ re Dhamasâ

Dhuâ: Sunâ Mâlini Ge! Chhumur Chhumur Bâje Karatâl.

Singing Order of the Musical Parts of Both the Streams:

Descending Order of Singing:

In classical music singing order of the parts of the compositions begins from *Sthâyi* and proceeds to *Antarâ* irrespective of their forms. Thus, *Râga* development gradually proceeds from the *Sthayi* in lower pitch to the higher pitch in *Antarâ* giving birth to an ascending order of singing which is noted down below:

Dhrupad:
(Darbâri)
Sthâyi: Shadja, Rishabha, Gândhara, Madhyama, Panchama, Dhaibata, Nishâda, Yeh Sapta Sur Sudhanike bulây Gây Dhrubapada Mana Sunây, Gâye Guni Jana.
Antarâ: Ârohi Avarohi Jâke Ulata Palat Hota, Nishâda, Dhaibata, Panchama, Madhyama, Gândhara, Rishabha.

Tonal range:
Classical Music:

Generally the range of the melodic movement of *Râgas* of classical Music is longer than that of the Folk songs. Usually the melodic movement in *Râgas* comprises one and half octave. In some *Râgas* the range is found even up to two octaves.

Kudmâli Songs:

Tonal range of *Kudmâli* songs is generally found within one octave except for some *Pântâ-sâliâ* Jhumar songs, the melodic movements of which can go upto one and half octave. The tonal range of the above mentioned Ahirâ Song for example is found within one octave. The melodic movement of this song is found from the Tonic note of the Middle Octave (Sadja of Madhya Saptak, 'S') to its seventh note of Flat N or Komal Nishâd.

Musical Instruments of Both The Streams:

India boasts of a large variety of music instruments. Some of them are technically developed through the passage of time giving scope for the solo playing. These instruments are divided into four types on the basis of their construction and production of the sound. They are Membrano-phone (*Bitata*), Chordo-phone (*Tata*), Idio-phone (*Ghana*) and Aero-phone / wind instruments (*Sushira)*. This four-fold typology was advocated first by the Sage Bharat in his famous *Sânskrit* text "*Nâtya Shâstra*". The very nomenclature Membrano-phones suggest to those instruments in which sound is produced by beating the membrane or skin attached with the instruments; Chordophones have chords/ wires or '*Tata*' in which sound is produced by plucking or bowing the chords/ wires of the instrument. Idiophones are made of solid objects like brass, copper, bell-metal, iron, rock, wood etc in which sound is produced by hitting or by friction. Aero-phones are made of wood or metal in which sound is produced by blowing air into the holes of the body of the instrument.

Musical Instruments of Classical Music:

In classical music, Membrano-phones include *Pakhâwaj, Mridanga, Tablâ, Naquârâ, Nâl* etc.; Chordophones include *Sitâr, Sur-Bahâr, Sarod, Santoor, Violin, Sârangi, Esrâj*; Aero-phones or wind instruments include Flute, *Shehnâi*, etc. and Idiophones include *Kartâl, Jhânj, Jal-Tarang, Kâstha-Tarang*. *Râga* melodies are played on chordophones and aero-phones or wind instruments as mentioned above and *Jal-tarang* and *Kâstha-tarang* of idiophones with their indivisual playing techniques. Rest others are used for playing rhythm. The deep resonant sound quality of *Pakhâwaj* and *Mridanga* are of perfect match to be played for the rhythm of the powerful form of *Dhrupad, Dhâmâr* and *Hori* while *Tablâ* is best suited to be played with *Khayâl.* In course of time these instruments are highly developed technically for solo playing also.

Musical Instruments of Kudmâli Folk Songs:

Musical instruments of *Kudmâli* Folk Songs are no less in number. It has precious possession of a large variety of membranophones like *Mâdal, Dhâk, Dhol, Dhâmsâ/ Nâgrâ, Chedpeti, Kadkhâ, Kârhâ, Tâsâ, Judi-Nâgrâ, Dhap, Damru, Khamak* ; Chordophones such as *Kendri, Tuilâ, Ektârâ*; wind instruments like *Âd-Bânsi, Pempti, Murali, Mahuri, Singâ, Madan-Bhedi, Turi* and instruments like *Jhânj, Kartâl, Gini, Theskâ or Thechkâ, Kâthi, Ghunghur* of idiophones category enriched the repertoire of *Kudmâli* musical instruments. Tunes of *Jâwâ, Karam, Bândnâ, Tusu, Jhumar* songs

are played on the chordophones like *Tuilâ,* and wind instruments like *Âd-Bânsi, Murali, Jodâ –Murali and Mahuri*. *Ektârâ* is played with *Dhuâ, Gherâ, Chânchar* songs. Rest others are played for rhythm mainly to accompany the songs. *Kudmi* people are adept in playing musical instruments since ancient days. From the excavations it was discovered that people of Indus Valley civilization were skilled in playing wind instrument like flute, primitive drums and stringed instruments.

Membranophones are the soul of musical instruments. Rhythm-structure of *Kudmâli* songs is erected with the help of three main percussion instruments: *Mâdal, Dhol* and *Dhâk*. Other percussion instruments extend support to these main instruments by accentuating the mnemonic syllables and by brightening the tone of the rhythm played by the main instruments. The sounds emitted from the earthen bodied *Mâdal* are blessed with amazing quality of resonance.

The resonance emerging from the sounds of *Tung, Dâng, Tâng, Ting, Dhâting* syllables of *Mâdal* has capability of continuing up to certain length of time. These enchanting sounds of *Mâdal* create hypnotic effect to arrest one's attention the moment one hears them. Not a single folk percussion instrument in other parts of India is at par with *Mâdal* of the Greater Jharkhand region of eastern India so far as its resonance is concerned.

Rhythm and Time Measure of Classical Music and Kudmâli Folk Songs:

Rhythm is the foundation of music. Why only music, in fact the whole universe is moving with perfect rhythm, without which the whole system will be ruined in chaos.

Rhythm and Tâlas of Classical Music:

In classical music, various *Tâlas* are created to suit its various forms. All the *Tâlas* have codified mnemonic syllables known as '*Thekâ*'. *Tâlas* of various meters or *chhandas* are there. They are comprised of *Dwi-mâtric* (double meter rhythm in which each meter have two beats), *Trai-mâtric* (triple meter), *Chatur-mâtrik* (quadruple meter) and *Mishra-mâtrik* (Mixed rhythm comprised of more than one rhythmic meter*)* rhythm. *Choutâl* and *Ektâl* belong to the rhythm of *Dwi-mâtric* meter having two beats in each division of their *Thekâs*. *Dâdrâ and Kaharwâ* belong to the triple (*Trai-Mâtric)* and quadruple meters (*Chatur-Mâtric)* respectively. They have three and four beats respectively in each division of their *Thekâs*. *Dhâmâr, Jhâp Tâl, Deepchandi* and *Rupak Tâlas* are of mixed metered rhythm (*Mishra*

-*Mâtric Chhanda), Thekâs* of which are comprised of rhythms of more than one meter. Different Tâlas are played for the different Forms of music. For example Choutâl is played with Dhrupad; Dhâmâr Tâla is played with Dhâmâr and Bilambit Ektâl and Tritâl are played with Khayâl.

Rhythm and Tâlas of Kudmali Folk Songs::

Tâlas of *Kudmâli* songs do not have codified syllables *(Thekâs)*. This leads *Tâlas* to be lengthy. Maximum *Tâlas* are found in Triple meter (*Trai-Matrik chhanda)*. There are quadruple and mixed metered *Tâlas* also. Different types of *Tâlas* are played with different songs. Even in some cases different *Tâlas* are played for *Dhuâ* and *Kali* of the same song.

Rhythm starts with *Kât* or *Kâtân* (Cut) which is a phrase of mnemonic syllables or *boles* played once. It is played before the beginning of the first stanza. The *Tâl* also ends with a *Kât*. Not only that, it is also played between the stanzas. After the *Kât, Tâl* is played and ends with the same or a different *Kât*. Different *Tâlas* are played in *Kali* and *Dhuâ*. Thus, *Kât* is the indicator of the beginning and the change of *Tâl* from *Kali* to *Dhuâ* as well as of the end of the *Tâl.* Here are some examples:

1.Tâl No One (Karam Song).

KÂT: (Introductory Kât of 36 beats, in Triple Meter)

Dhâ ting -, Dâ gi dâ, Ting - dâ , Dâ gi dâ,
Tâ khi tâ, Ting - - ,

Dâ gi dâ, Ting - - , Tâ khi tâ, Dâ gi dâ,
Ting - - , - - - ,

TÂL : (48 beats, in Triple Meter)

Ting - - , Di dâng - , - khi ti,
Khlin dâng -,

Dâ gi dâ , Di dâng - , - khi ti,
Khiln dâng -,

Di dâng - , Tin - - , Dân dâng -,
Tin - - ,
Tin - dang, - Tin - , Di dang -,

- - - , x

The above Kat will be played after this main Tal.

Tal No. 2 (Introductory **Kat** of 48 beats in Triple meter)

Dhan - ta, Dhan - ta, Dhan - ta, - - - ,
Dha tin - , Dha - dha, Tin gi di, Dha - dha,
Tin gi di, Dha - dha, Dha tin - , Dha - dha,
Tin - - , - Dha - , Dha tin - , Dha - dha,
Tin
X

Tâl of 24 beats (to be played once and three-fourth of it in 2nd time as per the need).

I) Dhâ dhâ tin, - khe te, - khe tin,
- khe te,

I khe dhâ, Tin dâng -, Tâ khi ti,
Tun dâng -,

II) Dhâ dha tin, - khe te, - khe tin,
- khe te.

Concluding Kât of 24 Beats.

I khe Dhâ, Tin dâng -, Dhâ - dhâ,
- Dhâ -,

Dha dhâ tin, - dhâ -, Tin - - ,
Tâ - khe,

Tin

X

Conclussion:

We have gone through various aspects of comparison between Hindustani classical music and *Kudmâli* folk songs. Even though these two genres are wide apart from each other, yet there are some meeting points between these two streams. We all know that as per the law of evolution,

things always evolve from simple to complex forms in course of time. Though classical music was evolved into its present developed and sophisticated form and attained a higher artistic plane was initially in the simple oral form of *Shruti*.

Though *Kudmâli* songs discussed so far are still remained in the category of folk songs, are not inferior in any case to be look down upon. They are equally developed in their own line. The large repertoire of song-forms, legacy of varieties of quaint musical instruments, various rhythmic patterns and lengthy *Tâls* certainly draw one's attention to the "folk-wisdom" of the *Kudmi* people of Greater Jharkhand Region.

REFERENCES:

1. Aspects of Indian Music: Edited by Dr. Sumati Mutatkar, Sangeet Natak Academy, Hope India Publications, Reprint-2006, New Delhi.
2. Pt. Rabi Shankar: My Life My Music, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1988.
3. Swami Prajnanananda, Historical Development of Indian Music, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta.
4. Pt. Vinayak Rao Patwardhan: Rag Vigyan, Part-II, 7th Edition, Published by S. R. Sardesai, Samarth Bharat Chhapakhana, Pune.
5. A Treatise on Ancient Hindu Music, Arun Bhattacharya, Published by K.P.Bagchi & Co., Calcutta.
6. Dr. Sharat Chandra Shridhar Paranjpe: Bharatiya Sangeet Ka Itihas, Choukhamba Sanskrit Series Office,Varanasi, 1969.
7. Lakshmi Narayan Garg- Katthak Nritya, Sangeet Karyalay, Hathras, U.P.
8. Dr.Prafulla Dutta Ghosh: Prachin Bharatiya Sabhyatar Itihas.
9. Dr.Binay Mahato: Lokayata Jharkhand, New Manas Printing, 8- Patuya Tola lane, Calcutta100009.
10. Dr.BankimChandra Mahato: Jharkhander Lok Sahitya, Pratim Prakashan, Raghunathpur, Medinipur.
11. Shri Kiriti Mahato: Sindhu Sabhyatar Bhasha O Kudmali, Published by Mulki Kudmali Bhakhi Baisi,Purulia.
12. Sadhan Mahato, Editor, Marang Buru, Second Volume, 2014.

13. Shri Radha Gobinda Mahato: Jharkhander Lok Sanskriti , Publisher- Sudhir Ranjan Basu Mallik,38, Shyam Bazar Street, Kolikata- 4.
14. Dr.Binapani Mahato. Unpublished Ph.D.Thesis, I.K.S.University, Khairgarh, Chhattis Garh.

Personal Interview with:

1. Prof. Narayan Vinayak Patwardhan (Guru of the present author).
2. Shri Prabhakar Mohanta, Biranchi Mohanta, Late Ratikanta Mohanta, Late Durga Charan Mohanta, Village Chitrada, Dist: Mayurbhanj, Odisha.
3. Shri Upendra Nath Mahato, Nagen Punuriar, Shaktipada Bansriar, Purulia District, West Bengal.



সাঁওতালি ও কুড়মালি সংস্কার সংস্কৃতি

ছত্রমোহন মাহাত

কুড়মি ও সাঁওতালদের জন্ম বৃত্তান্ত :-

সাঁওতাল পন্ডিত মঙ্গল চন্দ্র সরেন তাঁর "সাঁউতালি জমসিম বিনতি লিটা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন- "সেদাই মিত হড়ে বার এরালেন। আদ বুড়কি হপন বার হড়, ছুটকি হপন দ মঁড়ে হড়। বুড়কি হপনগে কুড়মি আর মুনডা, আর ছুটকি হপনগে হড়, মাহালে, কড়া, দেশোয়ালি, বিরহড়। উনকো ঝতমিৎ ঠেনগেকো তাঁহেকানা, মিত ঠেনগেকো বঁগা আ"।

অর্থ:- আদিমকালে এক ব্যক্তির দুইটি স্ত্রী ছিল। বড় স্ত্রীর দুই ছেলে এবং ছোট স্ত্রীর পাঁচ ছেলে। বড় স্ত্রীর ছেলেরা হল-কুড়মি ও মুন্ডা এবং ছোট স্ত্রী ছেলেরা হল-সাঁওতাল, মাহালি, কড়া, দেশোয়ালি মাঝি এবং বিরহড়। পূর্বে অর্থাৎ সেইসময় এরা একসঙ্গে জোটবদ্ধভাবে বসবাস করত এবং একই সাথে ধর্ম পালন করত।

সাঁওতাল পন্ডিত মঙ্গল চন্দ্র সরেন মহাশয়ের সাঁউতালি জমসিম বিনতি লিটা গ্রন্থ পাঠ করে কুড়মি এবং সাঁওতালদের জন্ম বা উৎপত্তি এবং সম্পর্ক ও তাদের একযোগে মিলেমিশে বসবাস সহ ধর্ম পালন সম্পর্কে যথেষ্ট জানা যায়। পন্ডিত সরেন মহাশয় প্রদত্ত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা (সঠিক) করতে পারলে উভয়জাতির বিস্তারিত বিবরণ জানা যাবে।

কুড়মি এবং সাঁওতালদের কথা বলতে গিয়ে ব্রিটিশ গবেষক H.H. Risley তাঁর Tribe and cast of Bengali (1891) গ্রন্থে লিখেছেন যে, Manbhum and north of Orissa it is difficult to distinguish a Kurmi from a Bhumis or Santal and the latter tribe who are more particular about food than is commonly supposed will eat boiled rice prepaired ley kurmis and according to one tradition regard them as half brethem of their own, spung from the same father who begate Kurmis on the elder and Santal

on the younger of two sister.

ব্রিটিশ গবেষক H. H. Risley মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠে সাঁওতাল এবং কুড়মিদের বসবাসের স্থান, আহারাদি সংস্কার সংস্কৃতি,ও পিতৃমাতৃ পরিচয় এবং পিতামাতার দিক থেকে তাদের সম্পর্কের কথা জানা যায়। এতদ্দেশিয় সাঁওতাল পন্ডিত ও সাগর পারে ব্রিটিশ পন্ডিত কুড়মি এবং সাঁওতালদের আদি পিতৃমাতৃ পরিচয়ে একমত যে, তাদের পিতা একজন ও মাতা দুইজনের দুই জন। এই দুই মা আবার দুই বোন। পন্ডিত বা গবেষকগণের মত ছাড়াও এদেশের আদিম জনগোষ্ঠীর মত জানা যায় তাদের প্রবাদ প্রবচনে। এবিষয়ে প্রবাদ আছে—

"সাঁওতাল কুড়মি মসিঅত ভাই"

অর্থ :- সাঁওতাল এবং কুড়মি মাসতুত (মাসির ছেলে) ভাই। যা ব্রিটিশ গবেষক H. H. Risley মহাশয়ের মতের সঙ্গে একমত প্রকাশ করে। এই প্রবাদের স্রষ্টা বা ধারক বাহকগণ হয়তো পন্ডিতগণ বা গবেষক নয় কিন্তু বাস্তব বা প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা এরাই। ফলে যেমন দেখেছে অর্থাৎ যা দেখেছে তাই বলেছে। আর সেই কথাটিই প্রবাদ রূপে অদ্যাবধি কথিত হয়ে চলেছে বংশানুক্রমে বংশপরম্পরায়। প্রবাদ যে পন্ডিত বা গবেষকদের মতের উর্ধ্বে সে বিষয়ে একটি ভিন প্রাদেশিক প্রবাদ আছে। তা হলো—

"বরং গাভীর দুধ তিত হয়, তবু প্রবাদ কভূ মিথ্যা নয়" (মালয়ালম প্রবাদ)

প্রবাদ এবং পন্ডিতগণ ও গবেষকদের মতেরও উর্দ্ধে বা উক্ত মতগুলির সত্যতার বলিষ্ঠ প্রমান হিসাবে উভয় জাতির একটি আনুষ্ঠানিক আচরণ অবশ্য লক্ষ্যনীয়। তা হলো—

কুড়মিদের বর এর বিবাহ উপলক্ষ্যে "চুমান" এর জন্য চতুমুর্খী প্রদীপ ও তার দীপাধার একত্রে "সিরিবারি ডালা" টি সাঁওতালের হাত দিয়েই বরের সাথে কনে ঘরে নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। এই রীতি কুড়মি ও সাঁওতালদের নিবীড় সম্পর্কের কথাই প্রমান করে। সেইসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস এবং গ্রাম পত্তনের আগে কুড়মিদের "গরামথান" ও সাঁওতালদের "জাহেরথান" প্রতিষ্ঠা, নানান আচার-আচরণ, সংস্কার সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ভয় বিশ্বাস, সঙ্গীতের গতি প্রকৃতি, নৃত্য ও নৃত্যমুদ্রা, গাত্রবর্ণ, গোত্র, পেশা, সরলতা, মানবিক গুণাবলী, দয়া, ক্ষমা, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, সামাজিক অনুশাসন, সাম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করলে কুড়মি এবং সাঁওতাল একি ঘরের ছেলে (লোক) বলেই প্রমাণিত হয়। অতএব ভিন্ন দিক থেকে "মসিঅত ভাই" মাসতুতো ভাই হলেও উভয়ের অর্থাৎ সাঁওতাল এবং কুড়মির পিতাএকজনই। সেকারণ এরা একই ঘরের ছেলে। সম্পর্ক ভাই ভাই। আপন ভাই,

পিতৃ পরিচয়ে; এবং মাতৃ পরিচয়ে মাসতুতো ভাই।

সাঁওতাল কুড়মির জন্ম মুহূর্ত্তের সংস্কৃতি :

কুড়মি এবং সাঁওতালদের ঘরে শিশু জন্মগ্রহন করলে সেই নবজাতক বা জাতিকার বিছানার মাথার দিকে (শিয়রে) কুড়মিদের ঘরে হলে একটি দা (কাস্তে) এবং সাঁওতালদের ঘরে হলে একটি পাটন কাঁড় (তীর) রেখে দিতে হয়। এই রীতি (সংস্কৃতি) এখনো প্রচলিত আছে। এর কারণ হিসাবে বয়স্কদের মুখে শ্রুতি পরম্পরায় যা শোনা যায় তা হলো, কুড়মিরা মনে করে যে, তাদের ঘরে একজন নূতন (নবজাতক বা জাতিকা) লোক এসেছে বাড়ির পুরাতন লোকেদের সাথে কৃষিকাজ করার জন্য। কাস্তে দিয়ে কৃষিজাত ফসল কাটা হয়। সেজন্যই নূতন শিশুর শিয়রে দা গুঁজে রেখে দিতে হয়। পরিণত বয়সে সে ঐ দা ব্যবহার করবে। তার নিজের এবং দেশের মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে। খাদ্য জোগান দেওয়ার জন্য। কৃষিজীবি কুড়মি জাতি। কৃষি সরঞ্জামের মধ্যে একটি সরঞ্জাম 'দা'। তাদের নবজাতক জাতিকার শিয়রে গুঁজে দিয়ে কৃষিজীবি হওয়ার সঙ্গেই যেন দীক্ষা দিয়ে দেয় জন্মকালেই। বিষয়টি কৃষিজীবি জাতির চরম লক্ষণ এবং চরম কৃষি সংস্কৃতির পরিচয়। এদিকে সাঁওতাল পরিবারের নবজাতক বা জাতিকার শিয়রে 'পাটন কাঁড়' (দ্বিফলা তীর) গুঁজে দিয়ে তারা তাকে শিকারের সাথী করে নেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা দেয় মন্ত্র বিহীন প্রত্যক্ষ আচরণের মাধ্যমে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ইংরাজ আমলে, এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও যখন গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত জঙ্গলমহলের মফস্বল থানা এলাকায় হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়নি তখন ঐ পাটন কাঁড় দিয়েই সাঁওতাল নবজাতক জাতিকার নাড়িচ্ছেদ (লাইড় কাটা) করা হত। কুড়মি শিশুর নাড়িচ্ছেদ করা হত ঝিনুকের খোল দিয়ে।

আদিম ভারতীয়দের শিকার দিবস :- এই দুই জাতি সাঁওতাল এবং কুড়মি মানব সভ্যতার ইতিহাসে সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে ধারা তার প্রকৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষ উদাহরণ শিকারজীবি থেকে কৃষিজীবি সময়কালকো যেন এখনো ধরে রেখেছে। এই দুই জাতির জীবন জীবিকা সঠিকভাবে লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করলে মানব সভ্যতার শিকারজীবি যুগ ও কৃষিজীবি যুগ ইতিহাস গ্রন্থে অধ্যয়ন অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টোজ্বলভাবে উপলব্ধি করা যায়। এবং উত্তরণ ও ক্রমবিবর্তন অনুভব করা যায়। শিকারজীবি সময়কালকে স্মরণীয় করে রাখতে এই আদিম জাতিগোষ্ঠীগুলি যথা-কুড়মি, মুন্ডা, মাহালি, সাঁওতাল, কড়া, দেশোয়ালি ও বিরহড় এবং ভূমিজ প্রভৃতি যারাকে একত্রে খেরহড় বা খেরওয়াড় জাতি বলে তারা তাদের বাসভূমি ছোটনাগপুর, মানভূম, উত্তর ওড়িসা এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ জুড়ে এক বিশাল এলাকায় অলিখিত ভাবে শিকার দিবস হিসাবে বছরের

দুইটি দিন পালন করে থাকে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক শিকার দিবস পালিত হয় "মেল" অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব দিবস। যা "মেল শিকার" নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় বা জাতীয় শিকার দিবস হিসাবে পালিত হয় বৈশাখি পূর্ণিমার দিন। যা পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হয়। শিকারের মাধ্যমে সাম্যের শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও কঠোর ভাবে নূতন যোগদানকারী যুবা শিকারি পুরুষদের মনের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে শিকার লব্ধ পশুপাখি ও বিভিন্ন বস্তু বিভাগ বন্টনের মাধ্যমে। শিকারে অংশগ্রহনকারী কুকুরকেউ এরা মানুষের সঙ্গে সমান অংশীদার বিবেচনা করে সমান ভাগ দিয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদ আলাদা করে পাঠ নিতে হয় না আদিম ভারতীয়দের। সাম্যে এরাই পৃথিবীর নজির।

আদিম ভারতীয়দের কৃষি সপ্তাহ পালন :- শিকারজীবি যুগের পর মানব সভ্যতা কৃষিজীবি যুগে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু তা এক কথায় বলার মত একদিনে সম্ভব হয় নাই। শিকার ও কৃষি এবং কৃষি ও শিকার এরূপ মিশ্রভাবে জীবন জীবিকার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বছরের পর বছর পেরিয়ে এক সময় মানুষ নির্ভরশীল কৃষিবিদ্যা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। তখন দীর্ঘ অরণ্য যুগের পর শিকার যুগ পেরিয়ে কৃষি সভ্যতার যুগে মানুষ পদার্পন করে। যে কৃষিবিদ্যা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের উদর পূরণের একমাত্র প্রধান বিদ্যা তথা মূল সম্বল। সে সময় ভারতভূমি কে সম্ভাব্যস্থলে কৃষিভূমিতে পরিণত করেছিল ভারতের মূলবাসী খেরোয়াড় জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দ্বারা। তাই তাদের বংশধরেরা এখন ভারতের আদিবাসী নামে পরিচিত। এই খেরোয়াড় মানবগোষ্ঠী কৃষি বিদ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার পর কৃষি সপ্তাহ পালন করতে শুরু করে। যা এখনো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পবিত্রভাবে ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী অর্থাৎ পার্শ্বৈকাদশীর পূর্ব সপ্তাহটি কৃষি সপ্তাহ হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। তারা এই সপ্তাহের শেষ দিনটির নাম দিয়েছে "করম পরব" বা "করম"। করম কর্মের কাব্যরূপ। বর্তমানে দেখা যায় করম উৎসব পালনে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষেরা মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। অবশ্য খেরোয়াড় গোষ্ঠীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও উৎসবে অংশগ্রহণ করে। করম পরবের দিন তারা তাদের সমাজের "করম বারতি" (ব্রততী) নাবালক-নাবালিকাদের কৃষিবিদ্যায় এবং কর্মফল ত্যাগের (ত্যাগী জীবন যাপনের) আচরণীয় দীক্ষায় দীক্ষিত করে তোলে কর্মের মাধ্যমে। যার ফল স্বরূপ ভারতীয় আদিম জাতির মানুষেরা ভবিষ্যৎ জীবনে সরল, উদার, ধীর, নির্লোভি,অল্পে সন্তুষ্ট, কদর্য্য কেলেঙ্কারি মুক্ত প্রভৃতি প্রকৃত মানবিক গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। কৃষি সপ্তাহ পালনে নাবালক-নাবালিকাদের স্বহস্তে বিভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা,

শুদ্ধ ও পবিত্রতার সাথে হাতে কলমে করানো হয়। সেই সঙ্গে অঙ্কুরের বহুমুখী যত্ন ও পরিচর্যা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভিজ্য ভেষজ ও ধীর লয়ের সুর যা বিলম মাত্রার গান অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিজ্ঞান সম্মতভাবে রীতি নিয়মের মাধ্যমে যা স্বানন্দে অবশ্য করণীয় হিসাবে বয়স্কদের অভিজ্ঞতা ভাবি নাগরিক কনিষ্ঠ কনিষ্ঠাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ৫ থেকে নয়দিন সময় লাগে। শেষ হয় ভাদ্র শুক্লা একাদশী তিথিতে। ঐ দিনটিই 'করম পরব' নামে পরিচিত। সন্ধ্যাবেলায় যথা নিয়মে করম পূজার শেষভাগে ব্রতী নাবালক নাবালিকরা তাদের স্বহস্তে আহরিত পত্র পুষ্প ফল জল করম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে পূজিত করম ডালে সমর্পন করে, মাত্র একটিই মন্ত্র বলে-"আমার করম ভাইয়ের ধরম"। অর্থাৎ সারাদিন উপবাসে থেকে হে করম ঠাকুর তোমার প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে তোমারই প্রিয় বস্তু সমূহ তোমাকে অর্পন করলাম। এই কর্মের জন্য আমার যদি তোমার কাছ থেকে কোন ফলপ্রাপ্তি যোগ হয়ে থাকে তবে তা আমার ভাইকে দাও। আমার এই কর্মের ফলে যেন আমার ভাইয়ের ধর্ম সঞ্চয় বা ধর্ম লাভ হয়। যে মানব গোষ্ঠীর নাবালক-নাবালিকারা প্রত্যক্ষ আচরণের (Practical) মাধ্যমে তাদের কর্মফল ত্যাগ করে এবং যে মানব সমাজে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কর্মফল ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণের এহেন ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানের অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যবস্থা আছে, সেই মানব গোষ্ঠীর প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকগণকে অন্য কোন মানবগোষ্ঠী বা সমাজের কাছে ত্যাগ শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা থাকতেই পারে না। বরং পৃথিবীকে ত্যাগ শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা ভারতীয় আদিম জনজাতি গোষ্ঠীরই আছে। সম্ভবত পৃথিবীতে অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ত্যাগের এত সুন্দর নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরাই ত্যাগের চুড়ান্ত নজির। কৃষিতে পয়রা চাষের উদ্ভাবক খেরওয়াড় গোষ্ঠী। খড়গপুর I.I.T. তে কর্মরত এই বিষয়ের ডক্টরেট সুভাষ মহাপাত্র একথা স্বীকার করেছেন।

সাঁওতাল ও কুড়মি জাতির মহিলা তীরন্দাজ :-

আদিম ভারতীয় খেরোয়াড় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত সাঁওতাল এবং কুড়মি সম্প্রদায়ের মহিলা তীরন্দাজ দেখা যায়। লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় সাঁওতাল রমণীগণ তীর ধনুক হাতে নিয়ে দলে যোগদান করে থাকে। কুড়মি মহিলাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান "জিতা পরব"। কুড়মিদের এই জিতা জীমূতবাহন পূজা নয়। এদের জিতা পূজার উপকরণ ও অনুষঙ্গ হিসাবে কৃষিজাত দ্রব্যাদির সাথে কাওলাস ধানের পুড়া, ঝুড়ি, কুলা, উখইল, প্রভৃতির সাথে তীর ধনুক ব্যবহৃত হয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় ব্রতীকে তার সামনে, পিছনে, ডাইনে ও বামে তীর নিক্ষেপ করতে হয় সঠিক ভাবে লক্ষ্য বস্তুতে। ফলে অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ করার ইঙ্গিত রয়েছে এই মহিলা ধনুর্বিদ্যায়। বোঝা

যায় শব্দভেদী তীর নিক্ষেপের ইঙ্গিতও নিহিত রয়েছে। কুড়মিদের জিতা ব্রত এবং নিহিত কলা কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য। পুরুষের কোন ভূমিকা থাকে না। সাঁওতালদের জিতা পরব নাই। তবে তারা জন্ম কালেই তাদের শিশুকে (ছেলে অথবা মেয়ে যাইহোক) তার শয্যার শিয়রে পাটন কাঁড় (দ্বিফলা তীর) গুঁজে রেখে দেয়। ভবিষ্যতে সে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হতে পারবে এই আশায় এই কামনায়। কুড়মি তীরন্দাজ রমনী অপেক্ষা সাঁওতাল তীরন্দাজ রমণী অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। জীবনচক্রের সংস্কার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা, শিকার ইত্যাদিতে আত্মনির্ভরশীল মহিলা যোদ্ধা সৃষ্টির ব্যবস্থা আদিমকাল থেকে এই উভয় জাতির মধ্যেই দেখা যায়। যা পূর্বে ছিল, বর্তমানেও আছে। মহাভারতে অর্জুনের লক্ষ্যভেদকে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্জুন লক্ষ্যবস্তুর ছায়া স্বচক্ষে দেখে তীর নিক্ষেপ করেছিল। আর আদিম জাতির মহিলারা চোখ বাঁধা অবস্থায় পিছন দিকে লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপ করে। ইহা অধিক প্রশংসনীয়।

সাঁওতালি ও কুড়মালি গ্রাম পত্তন :-

দেখা যায় সাঁওতাল এবং কুড়মি এই দুই জাতিই প্রকৃতি পূজক। সেই সঙ্গে আরও দেখা যায় যে, সমস্ত ভারতীয় আদিম জাতিগুলিই প্রকৃতি পূজক। শোনা যায়, এরা গ্রাম পত্তনের পূর্বেই প্রকৃতি দেবতার পূজার স্থান হিসেবে কুড়মিরা "গরামথান" এবং সাঁওতালেরা "জাহেরথান" প্রতিষ্ঠা করে সেখানে প্রকৃতি দেবতার পূজা দিয়ে প্রথম বসবাস শুরু করেছে। গরামথান এবং জাহেরথান অর্থাৎ গ্রাম্য দেবদেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রুতি পরম্পরায় জানা যায়, এদের গ্রাম প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষগণে বিশ্বাস যে, পূজ্য দেবদেবীগণ পূজকদের গ্রামকে সর্ব বিষয়ে রক্ষা করবে তাদের অমোঘ শক্তি দিয়ে। গরামথানের পূজারিকে 'লায়া' বলে। পূজা করার জন্য লায়া নিষ্কর জমি ভোগ দখল করত। বর্ত্তমানে সরকারকে খাজনা দিতে হয়। লায়াকে 'লায়ালি' জমি দান করে গেছে তৎকালীন গ্রাম প্রধান বা গ্রামের মোড়ল (মন্ডল) মহাশয়। এরা বলি পূজায় বিশ্বাসী। বলির জন্য ছাগল, ভেড়া, মুরগি, ও পায়রা বাচ্চা গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে পূজার স্থানে পৌঁছানোর জন্য পূর্বে নিষ্কর জমি দিয়ে লোকের বন্দোবস্ত করা ছিল। ঠিক লায়ার মতই। বর্তমানে গ্রামবাসীগণ নিজ বাড়ি থেকে নিজ নিজ দায়িত্বে পূজার দিন পূজার পূর্বেই গরামথানে হাজির করে থাকে। বলির নিয়ম অনুযায়ী পশু বা পাখি নিরোগ এবং অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গ নয় এমন সুস্থ সবল তথা পুষ্ট হতে হবে। সেইসঙ্গে পশু বা পাখিটিকে বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত বিশুদ্ধ জল, ফুল দ্বারা তার মাথায় ও গায়ে ছিটিয়ে শুচিশুদ্ধ করে সামনে নৈবেদ্যের অংশ ও ফুল বেলপাতা এবং দূর্বাঘাস রেখে

ছেড়ে দেয়। যদি পশু বা পাখিটি স্বেচ্ছায় নৈবেদ্য বা পূজার ফুল বেলপাতা কিম্বা দুর্বাঘাসগুলির যেকোন একটিও খায় তবেই সেই পশু বা পাখিটিকে বলি দেওয়া হয়। না খেলে সেই পশু বা পাখিটিকে বলি দেওয়া হয় না। ছেড়ে দেয়। জোর করে ধরে কোন পশু বা পাখিকে বলি দেওয়া হয় না। আবার পূজার ফুল বেলপাতা দুর্বা না খেলে তো নয়ই।

পৃথিবীতে প্রথম বৃক্ষ ছেদন নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করেছে আদিম ভারতীয়রাই। অলিখিত ভাবে সেই আইন মেনে চলেছে তাদের বংশধরগণ। সেই আইনে বলা আছে যে, গরামথান এবং জাহেরথানের গাছ কোন রকমেই কোন দিনই কেউ কাটতে পারেনা। এ কথা তারা খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই বলে গেছে।

গ্রাম পত্তনের পরে পরেই গ্রামগুলির নামকরণ করেছে তারাই। তাদের ঠিকানার পরিচয় দিতে। সমস্ত আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর একত্রে খেরোয়াড় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচলিত সম্ভবত তৎকালীন তাদের রাষ্ট্রভাষা কুড়মালি ভাষাতেই অধিকাংশ গ্রামের নাম রেখেছে। স্থানে স্থানে দুই একটি গ্রামের নাম সাঁওতালি, মুন্ডারি ভাষাতেও আছে। এদের বসবাসের মূল ভূখন্ডের গ্রাম নামগুলি বিচার্য্য যথা— আঁখখুঁটা, তামাখ্যুন, তামাজুইড়া, লুহামাইড়া, কড়াকানালি, পাথরচাকড়ি, পাথরডাঙ্গা, বালিডাঙ্গা, ধবাডাঙ্গা, ধবনি, কেন্দবনি,বেলপাহাড়ী, খাড়রুপাল, বাঁশপাহাড়ী, তোড়াং, তুলিন, সিললি, দাপাং, গগদা, ভুতাম, লুধুড়কা, হলইদকানালি, রাহইড়গড়া, চিরুগড়া, গুঢ়াছাঁদা, জাললাংডি, সাঁওতালডি, জারগঅ, গুগুই, লড়রা, চাড়রঅ, চিতরুঘুটু, ঘাঘরা, হাঁসাডুংরি, ঘাটশিলা, কালিমাটি, রাঁগামাটি, বড়সাল, ঝাড়গাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার মূল গ্রাম থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে যে গ্রাম সৃষ্টি হল তার নাম রাখল লউতনডি। গ্রাম নামের মধ্যে যেমন ভাষা, শব্দ ও সন্ধি আছে তেমনি ভাব ও অর্থও আছে। নামের দ্বারা গ্রামটির অবস্থান, ভৌগলিক পরিবেশ ও কি ধরণের মানুষের বসবাস তা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়।

কুড়মালি ও সাঁওতালি খেলা :- কুড়মালি ও সাঁওতালি খেলাগুলির নাম- হুডুম, ডাঁইড়া, কঁই্ড়া, বউ বসাবসি, থুকাম, গেঁওড়, কড়ি, চু ধরাধরি, অষ্ঠা, গুটি চালা, গুটি লুফা, হুঁটাহুঁটি, কুহলুকা, ধুঁন্দাবাঁধা, গাদি, গবইরঘুঁসি, মারবেল, কাতি, বাঘচাইল, ছাঁঞ্‌পাঁঞ্‌ত, তীর বিঁধা, রমফাদোড়, ইকিড়মিকিড়, কান ঝুনঝুন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুড়মালি খেলায় দলগত খেলার সময় উপস্থিত ছেলেরা দুই দলে দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার সময় একজন বেশি হয়ে গেলে সেই বিজোড় সংখ্যক ছেলেটিকেও খেলায় অংশগ্রহণ করানো হয়। তখন কুড়মালি খেলার নিয়মে তার নাম হয় "লুটু" বা

"লুঠু"। এই লুটু খেলোয়াড় উভয় দলের হয়ে প্রয়োজন মত খেলতে পারবে। মূল উদ্দেশ্য খেলার মাঠে উপস্থিত হলে কেউ খেলা থেকে বঞ্চিত হবে না। দলগত ছাড়া কয়েকটি খেলা একক খেলোয়াড় দ্বারাও সম্পন্ন হয়। উভয় ভেত্রেই কোন বিশেষ বিচারক নিযুক্ত থাকে না। খেলার উভয় খেলোয়াড় বা উভয় দলের খেলোয়াড়গণ নিজেরাই জয় পরাজয়ের হিসাব মৌখিক ভাবেই রাখে। কেবল কুড়মিদের গীত ঝুমই্র, বাজনা, সামাজিক আইন কানুন, বিধি বিধান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়গুলি আদিম কাল থেকে অদ্যাবধি মৌখিক ভাবে শ্রুতির মাধ্যমেই ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কুড়মালি ও সাঁওতালি খেলায় একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করার মত রয়েছে। তা হলো- এদের খেলায় বিজয়ী ব্যক্তি বা দলকে পুরস্কার দেওয়ার কোন বিধি ব্যবস্থা নেই। উল্টা পরাজিত ব্যক্তি বা দলের জন্য শাস্তি দেওয়ার বিধি বিধান আছে। যা আদিম জাতি ছাড়া অন্য জাতির বিপরীত ব্যবস্থা। উক্ত খেলার কয়েকটি কেবল মেয়েরা খেলে। কয়েকটি কেবল ছেলেরা বেশিরভাগ খেলা ছেলে মেয়ে মিলেমিশে খেলে থাকে।

কুড়মি এবং সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কৃতি :-

কুড়মি এবং সাঁওতালদের কোটিপতি না থাকলেও ভিখারিও নাই। এরা দৈহিক শ্রমে বিশ্বাসী। শরীর শ্রম দ্বারা উৎপাদিত ফসল এবং সংগৃহীত বনজ ফলমূল অথবা শ্রমের বিনিময় মজুরি যা পায় তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এখনো বেঁচে আছে। আসলে এই জাতিগুলির মানুষজন অল্পে সন্তুষ্ট। বর্তমান ভোগবাদী যুগেও এরা ভোগবাদে বিশ্বাসী নয়। তাই এখনো সরল, উদার, বীর, নির্লোভি প্রভৃতি মানবিক গুণের অধিকারী সাঁওতাল এবং কুড়মি জাতির মানুষগণ। ফলে এরা চোর, গুন্ডা, পকেটমার যেমন নয়, তেমনি ব্যাঙ্ক ডাকাতি বা বড় মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারির সাথেও যুক্ত নয়। সুদখোর মহাজনি ব্যবসাও এরা করে না। চাষবাস পশুপাখি পালন ব্যতিত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রবণতাও নেই। ফলে একেবারে পরিষ্কার যে, আদিম কা ল থেকে অধ্যাবধি এই উভয় সমাজের মানুষের বিশাল ধন সম্পত্তির মালিক হওয়ার আকাঙ্খা নেই। এছাড়া এই উভয় জাতির I.A.S. বা I.P.S. নেই। ব্যারিষ্টার নেই। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার দুই একজন থাকলেও বিলাত ফেরত ব্যতিক্রম থাকলেও উল্লেখ করা মত নেই। উচ্চ শিক্ষিত না থাকলেও সমাজ বিরোধী কুকর্ম করার মত মুর্খও নেই বা পাওয়া যাবে না। তুলনামূলকভাবে এই উভয় জাতির বিরোধ এবং মামলা মোকদ্দমাও অনেক কম। এরা শান্তিপ্রিয়।

সাঁওতাল এবং কুড়মি জাতির পতিতা রমনী নাই। এদের বসবাসের বিশাল

ভূখন্ড ঝাড়খন্ড, ওড়িসা ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সারা রাঢ় ঝাড়খন্ডে কোথাও একটইঙ বেশ্যালয় বা পতিতালয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেকারণ এদের মধ্যে H.I.V ঘটিত AIDS মারণ রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনাও নাই। সম্ভবত বর্তমানের বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই এদের পূর্বপুরুষগণ H.I.V ঘটিত AIDS সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। যার ফল স্বরূপ তারা তাদের সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক জীবন যাপনের সর্বস্তরে এমন সমস্ত বিধি বিধান অলিখিত ভাবেই বেঁধে দিয়ে গেছে যে, সমাজের সদস্য সদস্যাগণ জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক বিধি বিধানে বাঁচা বাড়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই আপনাআপনি যৌন সংযমি হয়ে যাবে। উচ্ছৃঙ্খল বলে কেউ থাকবে না। ফলে সমাজে বেশ্যা বৃত্তি যেমন থাকবে না তেমনি পতিতা রমণীরও প্রয়োজন অনুভব হবে না। তাতে সারা সমাজ শুচিশুদ্ধ পবিত্র থাকবে। তাদের দর্শনে আজও সাঁওতাল ও কুড়মি সমাজ সহ সমস্ত আদিম জাতি সমাজ সত্য সত্যই শুচি শুদ্ধ পবিত্র সমাজ। এবিষয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্যা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী এক সময় লিখেছিলেন। যে লেখাটি বিগত ১৫/৫/১৯৯২ তারিখ সংখ্যায় বর্তমান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা-চার, জানালা খুলে বিভাগে তিনি লিখেছিলেন—

মঙ্গলারাই শুধু অপরাধী?

পতিতা রমণী, পতিতা বৃত্তি, পতিতাদের দিয়ে ব্যবসা করানো পৃথিবীর সকল সমাজে বিস্মৃত যুগ থেকে আছে। অর্থাৎ চিরকালই তথাকথিত সভ্য সমাজ আসলে এক অসভ্য এবং পুরুষ শাসিত ছিল যে পতিতা ব্যতীত সমাজের চলত না। ..... এটা লক্ষ্যনীয় যে পৃথিবীর মানব সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত এবং অসভ্য বর্বর বলে গণিত যে আদিম অধিবাসী আদিবাসী সমাজ, সে সমাজ পতিতার প্রয়োজন অনুভব করেনি। আজ পৃথিবীর কোথাও যদি সে সমাজের কিছু মেয়ে এ বৃত্তিগ্রহণে বাধ্য হয়ে থাকে তা হয়েছে সমাজের মূল শ্রোতের দ্বারা শিকার হবার ফলে।

কুড়মি ও সাঁওতালদের নৃত্য, গীত ও বাদ্য :-সাঁওতাল এবং কুড়মি জাতির মানুষের ধমনি, শিরা, উপশিরায় রক্তে, মনে প্রাণে সদা সর্বদা সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রে, পথে ঘাটে, মেলা পরব, পারিবারিক অনুষ্ঠানে, গোচরণ কালে সর্বত্র গান (গীত, ঝুমইর, সেরেঞ) না গাইলে যেন হাঁটা চলা বা কোনরূপ কর্ম সম্পাদন করতে পারেনা। গীত এদের প্রাণশক্তি, গীত এদের দৈহিক বল, গীত এদের জীবনের জীবন। এতদুভয় জাতির ঋতুভেদে গানের সুর, তাল, মাত্রা, বাদ্য ও নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সাঁওতালদের মাঘ মাসে মাঘ-সিম-জম, ফাগুনে- বাহা, চৈত্রে-মাঃ মড়ে, বৈশাখে-সেঁন্দরা, জৈষ্ঠে-এরঃ, আষাঢ় ও শ্রাবণে-এরঃ দ্বারাই সম্পন্ন হয়, ভাদ্রে- হেড়েৎ

আশ্বিনে-দাঁশায়, কার্ত্তিকে-সহরায়, অগ্রহায়ন শরুতে-ইরঃ, শেষ- রুন্ডা, পৌষে-সাকরাৎ সেরেঞ। এই গানগুলির প্রতিমাসের সুর, তাল ও বাদ্য এবং নৃত্যও আলাদা আলাদা। কয়েকটি গানে কেবল মহিলারা ও কয়েকটিতে কেবল ছেলেরা বেং কয়েকটিতে ছেলেরা মেয়েলি পোষাক পরে নৃত্য করে।

কুড়মিদের গানকে বলে গীত। এদেরও ঋতু বদলের সাথে সাথে গীতের সুর, তাল, বাদ্য ও নৃত্য বদলে যায়। মাঘ ফাগুনে বিবাহ অনুষ্ঠানে বিহাগীত, চৈত্রে -রেঁঞ্জা ও ঝুমইর, বৈশাখ -জৈষ্ঠ-আষাঢ় ওশ্রাবণে পৃথক পৃথক ঝুমইর, ভাদ্রে-জাওয়া গীত, আশ্বিনে-ঝুমইর, কার্ত্তিকে-বাঁদনা গীত, অগ্রহায়ন ও পৌষে- টুসুগীত। কুড়মিদের এই গানগুলির সুর, তাল ও মাত্রা লক্ষ্য করার মত, ধীর গতির হয়ে থাকে। যা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে প্রফুল্লিত করে এবং পুষ্ট জোগায়। বিষয়টি বর্তমানে সারা বিশ্বে বহুভাবে পরিলক্ষিত ও প্রমাণিত। সেইসঙ্গে এদের নৃত্য মুদ্রাও অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিজ্ঞান সম্মত। নৃত্যে মহিলারা অংশগ্রহণ করে কিন্তু কোনরূপ যৌন উদ্রেকারী মুদ্রা ব্যবহার করেনা। পুরুষেরা যন্ত্রানুষঙ্গ ঢোল, ধমসা, মাদইল, বাঁশী, করতাল, ও ঝমর ইত্যাদি দ্বারা সঙ্গতে সহযোগিতা করে। কারও পোষাক বা অঙ্গভঙ্গি যৌন উদ্রেকের ইঙ্গিত বহন করে না। ফলে নির্দোষ আনন্দ সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে ও দেহে অনু তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তা থেকে সঞ্জিবনী রস ক্ষরিত হয়। তাতে গীত, বাদ্যও নৃত্যে অংশগ্রহণকারীর দেহ মনে প্রফুল্ল থাকে। শুধু তাই নয় শ্রোতা দর্শক ও নিকটবর্তী উদ্ভিদ জগতও পুষ্টি লাভ করে। গান শুনলে মন ভাল থাকে। এটা জানতে কোন বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন হয় না। তাই বুঝি মিউজিক থ্যারাপির সৃষ্টি বয়েছে এবং বর্দ্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ সম্পত্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আগামী দিনে রোগীগণকে সাউন্ড সিস্টেমে গান শোনানো হবে। তার সুফলে কথাও তারা বলেছে।

এই আদিম জাতিগুলির নারী পুরুয নির্বিশেষে এমন কি নাবালক-নাবালিকারাও প্রত্যেকেই গীত (গান) রচয়িতা কবি, সুরকার, গায়ক-গায়িকা ও নৃত্যপটু। পথ চলতে চলতে অথবা কৃষিক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে করতে প্রশ্ন মূলক গীত শুনলে তৎক্ষনাৎ জবাবি গীত রচনা করে সুর দিয়ে গানের জবাব গানের মাধ্যমে দিয়ে দেয়।

আসলে খেরওয়াড় বা আদিম জাতির মানুষগুলি, নৃত্যগীত প্রিয় সদা।

"সেনগে সুসুন কাজিগে দুরাং"

অর্থ:- বলনে গীত চলনে নাচ। শুধু সাঁওতাল কুড়মি নয় এতদঞ্চলের সমূহ জনজাতি গোষ্ঠীর কাছে এই লোককথাটি অতি মাত্রায় সুপরিচিত। অনুরূপ অর্থে একটি বহুল

প্রচলিত ঝুমইর—

মানভূমের খাঁটি　　　　　লাল রুখা মাটি
ভুখা মানুষের নাই পরিপাটি
বিলাস ব্যসন তরে।
তারা চলে ছন্দে তালে　　　　　ছত্রমোহন বলে
কথা কহে গীতে গানে।।

সাঁওতাল কুড়মির পরকে আপন করার সংস্কৃতি :-

সাঁওতাল কুড়মি সহ সমূহ আদিম জনজাতিগুলি তাদের বৃদ্ধ মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় না। শত অনটনের মধ্যেও নিজ সন্তান সন্ততির সাথে বৃদ্ধ মা বাবার ভরণ পোষণ করে থাকে। জন্মদাতা পিতা মাতাকে পরম গুরু হিসাবে শ্রদ্ধাভক্তির সাথেই যেদিন যা জুটে তাই দিয়ে আনন্দের সাথে মা বাবার সেবা করে থাকে। সেজন্য এদের সমাজে বৃদ্ধাশ্রম সৃষ্টি হয় নাই। এদের মনে এবং সংস্কৃতিতে তা অকল্পনীয়। এদিকে যারা নিজেরাই নিজেরাকে সভ্য মানুষ বলে থাকে, তাদের সমাজে বৃদ্ধাশ্রম সৃষ্টি হয়েছে তাদের বৃদ্ধ বাবা মায়ের সেবা যত্ন না করার মানসিকতা থেকে। পশুপাখি যেমন বৃদ্ধ মা বাবার কোনরকম খোঁজ খবর রাখে না সেইরূপ তথা কথিত সভ্য সমাজা সেই পশু নীতি পালন করে থাকে। যা মানব সভ্যতায় প্রকৃত মানবিকতার অভাব বোধ হয় এবং তা নিঃসন্দেহে তীব্র অপমান জনক ও ভয়ঙ্কর লজ্জাকর। উল্টা, ভারতীয় আদিম জাতিগুলি পরকে আপন করতে "ফুল পাতায়"। যা আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে বন্ধুত্ব স্থাপনের সূচনা পর্ব। ফুল পাতানোর অন্তর্নিহিত অর্থ, ফুলের মত কোমল, সুন্দর এবং মধুময়ভাবে আজকের স্থাপিত সখ্যাতায় বন্ধুত্বের ব্যবহারিক মাধুর্য্যপূর্ণ জীবন যাপন করার আন্তরিক অঙ্গিকার। বন্ধুত্বটি একেবারে একাত্মা হয়ে যায়। বন্ধুর পিতা মাতা মারা গেলে অপর বন্ধুটিও কঠোরভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অশৌচ পালন করে থাকে। একমাত্র স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া পরিবারের প্রতিটি সম্পর্ক বন্ধুর সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। অতএব তারা যে তাদের জন্মদাতা বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধাভরে ভরণ পোষণ করবে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কুড়মালি ও সাঁওতালি শিল্প প্রযুক্তি :- কুড়মালি ও সাঁওতালি সংস্কৃতি সম্পর্কে লিখতে গেলে অবশ্যই মুন্ডা, মাহলি, দেশোয়ালি, বিরহড়, কড়া ইত্যাদি আদিম জাতিগুলির কথা এসে যায়। কারণ, এরা তখন একসাথে বসবাস করত। তাছাড়া তৎকালীন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে একা একা কারও পক্ষেই প্রাণে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে এরা একগোষ্ঠীভুক্ত ছিল এবং একত্রে এদের নাম ছিল খেরহড় যা পরবর্তীকালে খেরওয়াড়

হয়। বর্ত্তমানে অনেকেই খেরোয়াল বলে থাকেন। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে পূর্বে খড়গপুরের কাছাকাছি এবং উত্তরে পশ্চিম বর্ধমান থেকে দক্ষিণে উড়িষার ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখন্ডে এরা শেষ বসতি স্থাপন করেছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রথমে অরণ্য নির্ভর থাকলেও পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এই বন্ধুর ভূখন্ডটিকে কৃষিজমিতে পরিণত করেছে। এই সময় তাদের চিন্তায়, মননে, বুদ্ধিতে নির্মান করেছে ঠেকা ও ঝড়া। পরে পশুশক্তি প্রয়োগে চালিত শুষ্ক মাটি অপসারণ যন্ত্র কুরল ও জলযুক্ত কাদামাটি অপসারণ করতে রাসি। এবং জোয়াল, তারপর ভূমি কর্ষন করতে তারা লাঙ্গল সৃষ্টি করে। এদের ভাষায় লাঙ্গলের কোনও কোন এলাকায় 'ল' এর উচ্চার 'র' দিয়ে সম্পন্ন হয় তাই সেখানে 'হাল' 'হার' নামে পরিচিত। যেহেতু লাঙ্গলের যন্ত্রাংশ সমূহ এদের মধ্যে বহুল প্রচলিত কুড়মালি ভাষায় বলা হয় সেকারণ "লাঙ্গল" এর উদ্ভাবক তথা একমাত্র স্রষ্টা এই আদিম জাতির মানুষেরাই। এরপর লাঙ্গল দ্বারা কৃষিকাজ করে কৃষিজাত ফসল উৎপন্ন করতে থাকে। কৃষিজাত ফসলকে খাদ্যে পরিণত করতে তার প্রক্রিয়া করণ যন্ত্র 'উখইল' নির্মান করে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হয় কুলা, টুপা, ছাকনা, বাউগি, খেঁচলি। তাদের চিন্তা ও মনন শক্তি প্রসারিত হয়। বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। ফলে কাঠ, বাঁশ দিয়ে তারা এগুলি ধীরে ধীরে নির্মান করে ফেলে। বাঁশ এবং ঘাস দিয়ে তারা ঝাঁটা তৈরীর কৌশল ও আয়ত্ত্ব করে। এরপর কৃষিজাত ফসল সংরক্ষণ বিষয় অনুভব করে এবং পুড়া, ডোল, মাচা সৃষ্টি করে।, দিন যায়, চাহিদা বাড়ে। তখন তারা উখই্লকে মেসিনে পরিণত করে ঢেঁকির রূপ দেয়। তাদের সৃষ্টির মধ্যে ঢেঁকিই প্রথম মানবশ্‌ক্তি চালিত যন্ত্র। এরপর তৈলবীজ থেকে তৈল নিষ্কাসন করতে "জাঁত" আবিষ্কার করে ফেলে। শ্রম ও সময় বাঁচাতে তারা দিনের পর দিন ভাবতে থাকে। তাদের ভাবনায় ধরা পড়ে পেশিশক্তি উখইল দন্ডের মাধ্যমে চাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কাজে করে দিচ্ছে। তখন তারা উখইলের বৃহৎ সংস্করণ তৈরি করে ঘুর্ণায়মান দন্ডে ভাবার দ্বার চাপ দিয়ে মানুষে টানা "ঘানি" নির্মান করে। পরে ঘানি পশু শক্তি চালিত করে নেয়। উখইল ও ঘানির প্রযুক্তিগত দিক একই। দিন যায়, নানা রকম ফসল উৎপাদি হতে থাকে। ফলে ডাল জাতীয় শষ্য বীজের খোসা ছাড়ানো এবংভাঙ্গার জন্য পাথরের জাঁতা নির্মান করে। প্রথমে বুনো লতা দিয়ে কাজ হলেও জাঁতে চাপ সৃষ্টির জন্য দড়ি প্রস্তুত করতে শিখে যায় এবং শন, পাট প্রভৃতি অঁশ যুক্ত ছালের উদ্ভিদগুলিও চিনে নেয়। শেষ পর্যন্ত বাবুই ঘাস ও খড় দিয়ে দড়ি তৈরি করে। শিশুও বৃদ্ধদের সহজ খাদ্য প্রস্তুত করতে খাদ্য দ্রব্যের মিহি গুঁড়া পৃথকীকরণ করতে "চালুনি" তৈরি করে নেয়। এ সময় শিকারজীবি যুগ পেরিয়ে মানুব সভ্যতা কৃষিজীবি যুগের

স্বাবলম্বী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। ব্যাপক কৃষিজাত ফসল ঘাড়ে মাথায় বহন করতে না পেরে পরিবহন ভাবনায় ভাবিত হয়। সেই ভাবনায় একদিন "সগড়" (চাকা' তৈরি করে। এই সগড় চাকার কোন যন্ত্রাংশ নাই। একটি মাত্র কাঠের বা মাটির সাহায্যে নির্মিত। পৃথিবীতে প্রথম চাকার আবিষ্কার এই সগড় চাকাই। সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির খেলনা যানের চাকাগুলিও সগড় চাকা। এখানে ইংরাজ আমলের একেবারে শেষদিকেও সগড় চাকার গাড়ির ব্যবহার দেখা গেছে। পশুশক্তি বাহিত সগড় চাকার গাড়ি নির্মান করে পরিবহন সমস্যার সমাধান করে। অতঃপর অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যন্ত্রাংশ সংযুক্তি করণ দ্বারা আশ্চর্য্য রকমের এক সুউন্নত চাকা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই চাকার এবং গাড়ির যাবতীয় যন্ত্রাংশের নাম একটিও হিন্দি বা বাংলা কিম্বা উড়িয়া ভাষার নয়। সমস্ত যন্ত্রাংশের নাম আদিম গোষ্ঠীর কুড়মালি ভাষায়। সেকারণ এই চাকা এবং গাড়ির স্রষ্টা বা উদ্ভাবক এই ভারতীয় আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরাই। খড়গপুর আই.আই.টি-এর মত কোন প্রযুক্তি প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরা নিজেদের মনন শক্তির সাহায্যে বুদ্ধির জোরে উন্নত চাকা ও গাড়ি নির্মাণ করেছিল। সেইসঙ্গে বর্ষাকালে কৃষিক্ষেত্র এবং গোচারণকালে যাতে ভিজতে না হয় তার জন্য বাঁশের ছাতা নির্মান করে নিয়েছিল। বাঁশের ছাতা মাথায় নিয়ে কাজ করা অসুবিধা ছিল। তাই তারা আচ্ছাদন দ্বারা সারা শরীর আচ্ছাদিত করেও স্বচ্ছন্দে কৃষিকাজ করার উপযোগী "ঘং" নির্মান করে নেয়। ঘং বনের "চিহইড়" পাতা কাঠি ব্যতিরেকে সেলাই করে করা হয়। এখনো জঙ্গমহলের জঙ্গল ঘেরা গ্রামের মহিলারা ঘং তৈরি করে ব্যবহার করে থাকে। খাওয়ার জন্য "খালি" ও "খালা" শালপাতা কাঠি দিয়ে সেলাই করে নিত। স্থায়ীভাবে রেখে বারেবারে ব্যবহার যোগ্য খালা, বাটি, পাথর কেটে করে নেয়। বর্ষাকালে স্রোতের জলে মাঝ ধরার কয়েক প্রকার ফাঁদ নির্মান করেছিল এরা। ফাঁদ বাঁশ বা বুনো কাঠি দিয়ে করত। ফাঁদগুলির নাম—সিয়াড়া, ঘুগি, পাটা, ঘুনি, দাঁএঃতাবইসা ঘুগি ইত্যাদি। যে স্থানে ফাঁদ পাতা হত তার নাম দিয়েছিল "জান"। জান থেকে মাছ বয়ে নিয়ে আসতে করেছিল 'খালই'। অতিরিক্ত মাছ শুকিয়ে পরবর্তী ঋতুতে খাওয়ার জন্য মজুত রাখতে (সংরক্ষণ করতে) সৃষ্টি করেছিল 'পটম' জল কাদা এবং বিষাক্ত সাপ ও কীটের থেকে হাঁটার সময় রক্ষা পেতে তারা "খড়ম" (কাষ্ঠ পাদুকা) নির্মান ও ব্যবহার করত। কিছু কিছু দ্রব্য পিঁপড়া ও গৃহপালিত পশুপাখি বা ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করতে সিঁকা নির্মিত হয়েছিল তাদের হাত দিয়ে। এই আদিম জাতির একটি আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কথা অনুমান করা যায়। দুধের মধ্যে ঘি এর উপস্থিতি তারা অনুভব করতে পেরে ঘি উৎপাদনের কৌশল

আবিষ্কার করে (মন্থনদন্ড) "মথনডাঁড়ি" নির্মান করে ঘি উৎপাদন করত। এরা যে ঘি উৎপাদন করতে সে বিষয়ে প্রবাদ আছে। এরা ঘি এর বিনিময়ে নুন কিনত।
"এসন কুড়মিক জিউ, একসের নুনে তিনসের ঘিউ"।
মাথার চুল সুবিন্যস্ত করতে এরা কাঠের "কাঁকই" এবং "মচকা" তৈরি করে। মচকার দাঁতগুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে ব্যবহার করা যায়। সেইসঙ্গে শিশুদের খেলার জন্য কাঠের খেলনা পুতুল নির্মান করতে পারত খুব মসৃন করে। আদিম জাতির মহিলারা "পালই" নামের বুনো খেজুর পাতা দিয়ে "তালাই" বুনন আয়ত্ব করে। তালাই মাটিতে পাতা যায়। প্রবল শীতে গায়ে ঢাকা নিয়ে ঘুমানো যায়।
আদিম ভারতীয়দের সাধারণ-জ্ঞান বিকাশ ব্যবস্থা :- এদের সমাজে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা হতে প্রত্যহ সন্ধ্যায়। প্রত্যেক বাড়িতে না হলেও তিন চার বাড়ির মাঝে কে জায়গায় শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিয়ে দাদু দিদিমা বা জেঠা জেঠি অথবা যে কেউ বয়স্ক ব্যক্তি আসর পরিচালনা করত। চর্চা করা হত জান কহনি/ভাঁগা কহনি,শিক্ষা মূলক গান ও ছড়া যুক্ত ছোট গল্প, ফড়ই, যা অদ্ভুত রকমের হেঁয়ালি/ধাঁধা।সারা সমাজের সর্বত্র এই ব্যবস্থা বেশ মজবুত ভাবেই ছিল। এই আসর থেকে সমাজের কনিষ্ঠ কনিষ্ঠারা বয়স্ক বয়স্কাদের কাছ থেকে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ লাভ করত। বর্ত্তমানে কোথাও কোথাও আসররে সংখ্যা বা সময়ের পরিমাপ কমে গেছে। কোথাও বা আসরটিই উঠে গেছে, আর বসে না। আজ টি.ভি., মোবাইল, ইমেল, ইন্টারনেটের যুগে সাধারণ জ্ঞানের চাহিদা পুরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না সে কথা সমাজ, সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরাই বলতে পারবে।

বৃত্তিজীবিদের বেতন ব্যবস্থা :-

আদিম জাতির বসবাসের এলাকায় বিশেষ করে কুড়মিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নাপিত, ধোপা, ধাই, কামার ইত্যাদি বৃত্তিজীবি জাতিগুলির বৃত্তি পরিষেবার মূল্য হিসাবে যা বেঁধে দিয়ে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত তার কোন রূপ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় নাই। দ্রব্য মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধিতে কুড়মালি পদ্ধতির বেতনে হ্রাস বৃদ্ধি করতে হয় না। এখনো এই বৃত্তিজীবি জাতিগুলি তাদের কাজের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত বেতন পেয়ে তারা যথেষ্ট খুশি হয়। সানন্দে কাজ করে দেয়।

স্বল্প সঞ্চয় নীতি :-

আদিম ভারতীয়দের অলিখিত নিয়মে রান্নারপূর্বে একমুঠি চাল সঞ্চয়ে জন্য তুলে রাখতে হয়। এই নিয়ম কোন সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে তা কেউ জানে না। এইটুকু জানে সে, পরিবারে রান্নার জন্য যে চাল দরকার হয় তার থেকে একমুঠি তুলে রাখলে

কারোরই খাবার কম পড়বে না। এদিকে প্রত্যহ তুলে রাখা চাল জমা হয়ে ভবিষ্যতে সংসারের সহায়ক হবে বা বিপদ আপদে কাজে লাগবে এ বিষয়ে বাংলাদেশের ডঃ মহম্মদ ইউনুস সাহেবের নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার বহু যুগ পূর্ব থেকেই আদিম জাতির মানুষেরা এভাবে স্বল্প সঞ্চয় নীতি পালন করে আসছে। কিন্তু প্রচারের অভাবে তা অনালোকিতই থেকে গেছে। আদিম যুগ থেকে বর্তমান পর্য্যন্তই।

আদিম জাতিগুলির খাদ্যগ্রহণ নীতি ও মনস্তত্ব :-

ভারতীয় আদিম জাতি গোষ্ঠীর যাবতীয় রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন, আচার ব্যবহার অলিখিতভাবে শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তর পুরুষে পেয়ে আসছে ও পালিত হয়ে চলেছে। বাস্তবে দেখা যায়, কুড়মিদের রান্না করা খাবার খেরওয়াড় জাতি গোষ্ঠী যেমন মুন্ডা, মাহলি, সাঁওতাল, কড়া, দেশোয়ালি, আবার নাপিত, ধোপা, ধাই, তাঁতী,কামার,মুচি, বাউরী প্রভৃতি প্রায় সব জাতরি লোকেরাই খায়। অথচ সাঁওতালেরা বামুনের রান্না করা খাবার তো খায়ই না, বামুনের ছোঁয়া কাঁচা জলও সাঁওতালরা খায় না। কিন্তু কেন? যে বামুনরা নিজেরাই নিজেরাকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ বামুনকে সাঁওতালরা এত ঘৃণা করে কেন ? কেন এত অবজ্ঞা ? কারণ তো একটা নিশ্চিত ভাবে আছে, একাধিক কারণও থাকতেই পারে। উত্তরটা এককথায় হবার নয়। সামান্য দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। এই কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সাঁওতাল এবং বামুনের প্রত্যক্ষ আচরণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করার বিষয় হতে পারে। কোন গ্রন্থ থেকে জানা যাবে না। এবিষয়ে কোন প্রত্যক্ষদর্শী গবেষক গবেষণা করে আলোকপাত করে নাই। তাছাড়া উভয় জাতির মূল আচরণ এখনো অটুট আছে।

দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল এবং বামুন ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করছে। তবু এই উভয় জাতির সংস্কৃতির বিন্দুমাত্রও সংমিশ্রণ ঘটে নাই কেবল মাত্র সাঁওতালদের অবজ্ঞার কারণেই। দেখা যায় একটি গ্রামের মধ্যেই কুড়মি, মুন্ডা, মাহলি, সাঁওতাল, কড়া, ভূমিজ, দেশোয়ালি, হাড়ি, বাউরী, ডম ইত্যাদি জাতিগুলি একত্রে মিলেমিশে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছে। তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। বহুপূর্বে তারা যখন এভাবে বসবাস করছিল সে সময় ভারতবর্ষে আর্য্য অনুপ্রবেশ ঘটে। সম্বলহীন আর্য্য বামুনেরা বিনাশ্রমে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য পূর্ব থেকে বসবাসকারী গ্রামবাসীগণকে পূজাপাঠ, যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্মের প্রস্তাব দেয়। কুড়মিরা নিজেদের স্বভাব সারল্যে বামুনের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে তাদের শিকার হয়ে যায়। সাঁওতাল কুড়মির পাশাপাশি ঘর। উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী। হঠাৎ কুড়মি গৃহকর্তা

মারা গেল। ছুটে এলো সাঁওতাল। ঘরে গিয়ে সারা গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে এলো কুড়মির ঘরে। দেখল গৃহকর্ত্রী শোকে মুর্চ্ছাগত। ছেলেটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাথায় হাত নিয়ে নিশ্চুপ বসে আছে। গ্রামবাসীর চেষ্টায় মৃতদেহ সৎকার করে তারা ফিরে এলো। সন্ধ্যায় কিছু খাবার এনে খাওয়াল তারাকে।শোক সন্তপ্ত কুড়মির ঘরে সেদিন উনান জ্বলেনি সারাদিনে। বিপদে পাশে দাঁড়ানো আদিম ভারতীয়দের সংস্কৃতি। পর দিন খবর শুনে বামুন এলো। শোকগ্রস্থ মাকে পাশে রেখে ছেলেকে বলল,তোর বাপ এলাকার গণ্যমান্য লোক ছিল। গ্রামের "মাহাত" (মোড়ল) ছিল। আমাকে বলেছিল আমার শ্রাদ্ধে ভূমিদান নিবে। ঐ জামতলের বহাল ক্ষেতটাই নিবে। ভূমিদান তো করবি। ঐ ক্ষেতটাই দিবি। তোর বাপের কথাটা রাখবি। নইলে বিপদ অনিবার্য্য। কয়েকদিন পর কুড়মি ছেলে বামুনের মতে তার বাপের শ্রাদ্ধ করল। বামুন একে একে ষোলটি মুখ্যদান ও অনুষঙ্গ দান কুড়মির কাজ থেকে নিল। সেগুলি হল-ভূমি, গরু (কাল বকনা), সোনা, রূপা, শয্যা, আসন,সিদ্ধ চাল, আ তপ চাল, চিড়া, মানুষের প্রয়োজনীয় সব রকম কাপড়, প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ। দক্ষিণা দিতে হল দানের বস্তুমূল্যের দ্বিগুণ। কুড়মির গরুগাড়িতে করেই মুন্ডা, সাঁওতাল, কড়া, ভূমিজ প্রভৃতি অন্য জাতির ছেলেরা বামুনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলো। বিষয়টি নেয় তাদের মধ্যে কিছু আলোচনাও হলো যাতয়াতের পথে। সাঁওতাল, মৃত্যুর সময় থেকে কুড়মির ঘরে বেশি সময় আছে বিপদকালে সহযোগীতা করতে। কিছু চাল, ছাগল খাসি, নগদ টাকাও সে দিয়েছে কুড়মিকে। ফলে সেসব কিছুই দেখেছে শুনেছে। ভেবেছেও মনে মনে।

বামুন বলেছিল কালো বকনা গরু দান কেন নিচ্ছি? বৈতরনী নামে একটি নদী আছে। তার পরপারে স্বর্গ। ঐ নদীর জল টগবগ করে ফুটছে, এতই গরম। আবার সে নদীতে হাঙ্গর, কুমির ইত্যাদি নরভূক হিংস্র প্রাণী আছে। এমনিতে ঐ নদী অগম্য। তোর মরা বাপ এই কাল বকনা গরুর লেজ ধরে অনায়াসে বৈতরণী নদী পার হয়ে স্বগে পৌঁছে যাবে। আর আমাকে যে জামতলের বহাল ক্ষেতটা ভূমিদান করলি ঐ জমির মিহি ধানের ভাত স্বর্গে বসে খাবে তোর বাপ। খাবে কি দিয়ে শুন, ঐ যে কাল বকনা ততদিনে গাই হয়ে প্রচুর দুধ দিবে। তোর বাপ স্বর্গে দুধ ভাত খাবে। এইকথাগুলি শুনেছিল সাঁওতাল। এখন ভাবছে। কাল গাইয়ের দুধ অন্য রং এর গাইয়ের দুধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাল রংয়ের রৌদ্র সহ প্রাকৃতিক ঋতু নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ধরে। সেকারণেই ছাতার রং কালো করা হয়। কাল গাইয়ের দুধের পুষ্টিগুণ বেশি। বামুন কালবকনাই নিয়েছে বৈতরণীর দোহায় দিয়ে। আর ভূসম্পত্তি লাভ হতে পারে

রক্ত অথবা অর্থের বিনিময়ে। কাউকে মেরে কেটে তার ভূসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া অথবা কেউ বিক্রয় করলে অর্থের বিনিময়ে ভূসম্পত্তি লাভ করা যায়। বামুনের এ যে একেবারে মুখের কথায়। রক্ত বা অর্থ কোন কিছুই খরচ করলো না বামুন। স্থায়ী ভূসম্পত্তির মালিক সেজে গেল। সেইসাথে ছ-মাস, এক বছরের খাদ্য পরিধেয়। সাঁওতাল ভাবতে লাগল। এভাবে মড়া পিছু একটা করে ক্ষেত দানে নিলে কুড়মিদের জমি একসময় শেষ হয়ে যাবে। এদিকে ঐ জমির মালিক হবে বামুনেরা। রক্ত বা অর্থ কোন কিছুই খরচ না করে বামুন হবে জমিদার এবং কুড়মি হবে যাযাবর। ভূমিদান গ্রহণ করলেও বামুন আবার বলে রেখেছে যে, বামুনকে লাঙ্গল ধরে ভূমি কর্ষণ করতে নেই। যে লাঙ্গল ধরে চাষ করবে না তাকে জমিদান করা মানেই সমাজে খাদ্যশষ্য উৎপাদনে ঘাটতি পড়া। যাকে ভূমি কর্ষণ করতে নেই তাকে ভূমিদান করার পূণ্যের বদলে পাপ হবে। বামুন আবার এলো। এবারে বলল শোন, তোর বাপের মরা একবছর হয়ে এলো তোকে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করতে হবে। নইলে স্বর্গে শান্তি পাবে না তোর বাপ। এই বামুনের মাথায় কুড়মির দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ হলো। দেখল গ্রামবাসী সবাই। এবারেও বামুনেরপ্রাপ্তিযোগ ভালই ছিল। ফসল তোলার পর বামুন আবার এলো। এবারে বলল, শোন তোর মা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এদিকে চাষে তোর ফসলও কম হয়েছে। তোর বাপের আমলে অনেক বড় গাদা হত। এটা গ্রহদোষ। অবশ্যই একটা গ্রহশান্তি যজ্ঞ করতে হবে। তুঁই পাঁচ সের গাওয়া ঘি সংগ্রহ কর। আমি অমুক দিনে এসে করে দিব। সাঁওতাল সমিধ সংগ্রহের দায়িত্ব নিল। নিজের ঘরের একসের ঘি দিল। বামুন এসে যজ্ঞ করল। গ্রামবাসীরা দেখে অবাক। সাঁওতাল ভাবলো শ্রাদ্ধের নামে কুড়মির ধনহানি ঘটিয়েছে। এবারে স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে তার ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলল। যজ্ঞের নামে পাঁচ সের ঘি পুড়িয়ে দিল। আমরা জানি, যুবতী রমণী বস্ত্র না পরে সবরকম অলঙ্কার পরে সাজলে যে শোভা পায়, ঘি ব্যতিত খাবার খেলে ঠিক সেই রকমই হয়। ঘি ছাড়া খাবার খড় খাওয়ার সামিল। সে ঘি পুড়িয়ে দিলে মরা বাপ স্বর্গে শান্তি পাবে আর আমি জীয়ন্তে শাস্থ্যহীন হয়ে মর্ত্তে অশান্তি অস্বস্তি ভোগ করতে থাকব। "দারুন ব্যবস্থা"। সাঁওতালের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। বামুন আবার এলো। বলল যজ্ঞ হয়েছে এবারে তোর ঘরে একটা পূজা করতে হবে। মূর্ত্তি পূজা। তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কুড়মি ঘরে মুর্ত্তি তৈরী হলো। খড় বাঁশ মাটি দিয়ে। রং দিয়ে আঁকা হলো চোখ, মুখ। বামুন এসেই বলল, মুর্ত্তির চক্ষুদান দিতে হবে। পঁচিশ টাকা দে। আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব একান্ন টাকা দিয়ে দে। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং চক্ষুদান হয়ে গেলেই মুর্ত্তি তোকে দেখতে পাবে। তখন জীবন্ত প্রতিমার কাছে যা চাইবি তাই পাবি। প্রতিমা তোকে বরদান

করবে। সবকিছুই হলো। চক্ষুদান,প্রাণ প্রতিষ্ঠা, পূজা অর্চনা। বিসর্জন তাও হলো। কুড়মির কাছ থেকে বামুন ভাল রকম পাওনাও নিল। দুদিন পর সাঁওতাল দেখল বামুন তার স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে বলল, চক্ষু চিকিৎসকরে কাছে যাচ্ছি। আজ কদিন হলো আমার স্ত্রীর চোখে খুব জ্বালা যন্ত্রনা হচ্ছে। বেশ কষ্ট পাচ্ছে। ভাল দেখতেও পাচ্ছে না। ভয় লাগছে। ভবিষ্যতে অন্ধ হয়ে যাবে না তো। তাই চোখের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। সাঁওতাল ভাবল; যে বামুন বিড় বিড় করে মন্ত্র বলে ফুঁ দিয়ে বাঁশ খড় মাটির মুর্ত্তিতে চক্ষুদান করতে পারে সে যাচ্ছে কি না চিকিৎসকের কাছে? তবে কি বামুনের মুর্ত্তিতে চক্ষুদান নিছক ভন্ডামি। প্রতারণা? ভন্ড প্রতারকের টাকা নেওয়ার সভদ্র কৌশল মাটির মুর্ত্তিতে চক্ষুদান ব্যবস্থা। তবে কি প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হয় না মুর্ত্তিতে। সাঁওতাল ভাবে। হঠাৎ একদিন খবর, বামুনের ছেলেটি মারা গেছে। গ্রামবাসী সবাই ছুটে গেল। বিপদকালে পাশে দাঁড়ানো আদিম জাতির ধর্ম। সকলের উপস্থিতিতে ও সহযোগীতায় বামুন তার ছেলের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ করল। সবাই ফিরে এল। সাঁওতাল ভাবতে ভাবতে ফিরল। ফিরে এসেও ভাবছে। বামুনের যে মন্ত্রে বাঁশ, খড় মাটির মুর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে প্রাণবন্ত হয়, বামুন তার পুত্রের রক্ত মাংসের শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল না কেন? নিশ্চয় এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। এটা লোক ঠকানো উপার্জনের একটা প্রতারকি ব্যবসা মাত্র। সাঁওতাল বামুনের আগাগোড়া সমস্ত বিষয় নিয়েই ভাবতে লাগল। গভীরে আরো গভীরে। সাঁওতাল ছিল আধিম ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ববিদ জাতি। তারা তাদের মনেক সর্বদা শুচি শুদ্ধ পবিত্র রাখে। রাখতে চায় সবদিন।তাই ভাবনার গভীরতা। বুঝতে পারল ভূমিদান,গোদান,ষোড়শদান প্রভৃতি বিনা মূলধনে,কায়িক শ্রম ব্যতিরেকে, অন্যের উপার্জনের অংশীদার হওয়া এবং ভবিষ্যতে ভূমিদানের মাধ্যমে জমিদার হওয়া ছাড়া কিছুই নয়। আর চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাতো বামুন তার বাড়ির লোকের রক্তের মাংসের শরীরে করতে পারে না। অথচ মাটির মুর্ত্তিতে করে টাকার লোভে। বামুন নিজের তার আচরণে বুঝিয়ে দেয় যে, আমার মন্ত্রে চক্ষুদান বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্য সত্যই হয় না। হলে বর্তমানে চোখ দেখাতে সাঁওতাল চক্ষুবিশেষজ্ঞ (Eye Spesalist) ডাক্তারের কাছে যেতাম না। বামুন মাটির প্রতিমার চক্ষুদান দেয়ে আর নিজের চোখ দেখাতে সাঁওতাল ডাক্তারের কাছে যায়। বামুনের সবটাই ভন্ডামি। সবটাই প্রতারণা। অতএব নিজের মনকে ঠিকমত শুচি শুদ্ধ পবিত্র রাখতে সে ভাবল তার করণীয়, কি করা যায়।

আদিম ভারতীয় বিজ্ঞান বলছে প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ গুণ তার সারা শরীর থেকে সদাসর্বদা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কোন মানুষের স্পর্শ করলে সেই মানুষটির

গুণের সংস্পর্শে যেতে হয় সঙ্গকারিকে। এবং সঙ্গকারির গুণের সংস্পর্শে আসে অপর মানুষটি। নিজেদের অজান্তেই উভয়ে উভয়ের গুণে সম্পৃক্ত হতে থাকে। তার মধ্যে যার গুণ যত বেশি শক্তিশালী তার গুণ তত বেশি প্রবিষ্ট হয় অপর মানুষটির মনে। ফল স্বরূপ দীর্ঘদিন সঙ্গলাভ করার ফলে স্বল্প গুণসম্পন্ন ব্যক্তি শক্তিশালী গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মানসিকতা প্রাপ্ত হয়। কথায় বলে—"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" আদিম ভারতীয়রা বলে—"সঙ্গ দোষে লুহা ভাঁসে"। সাঁওতাল সিদ্ধান্ত নিল যে, বামুনের সঙ্গ করা উচিত হবে না। যেহেতু মানুষের প্রধান ধর্ম মনুষ্যত্ব। সেই মনুষ্যত্ব বামুনের মধ্যে নাই। তার সঙ্গ করলে ভবিষ্যতে অমানুয হতে হবে। মানুষ হয়ে জন্মে অমানুষ হওয়া মানুষ প্রজাতির কলঙ্ক। অতএব চিরতরে বামুনের সঙ্গ ত্যাগ করার শপথ নিল সাঁওতাল। তাই বুঝি আজও সাঁওতালি জীবন চক্র উদার সারল্যের পথেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। সাঁওতাল অনুভব করেছিল "বিপ্রলিপ্সা"। বিপ্রলিপ্সার অর্থ-বঞ্চনেচ্ছা, নিজজ্ঞাত অর্থ বা প্রকৃত তত্ব প্রকাশ না করা, এবং সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ভুল অর্থ যোজনা করা ইত্যাদি। বিপ্রলিপ্সার সব কয়টি অর্থই মনের ক্রিয়া। সাঁওতালেরা পৃথিবীর প্রথম শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ জাতি বলেই বামুনের বিপ্রলিপ্সা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বামুনের সঙ্গ চিরতরে বর্জন করতে পেরেছিল। যা আজও বংশানুক্রমে অব্যাহত আছে। এক্ষনে আলোচ্য যে, হাজার হাজার বছর যাবৎ একই দেশে সাঁওতাল বামুন উভয় জাতি একত্রে পাশাপাশি বসবাস করেও তাদের এত গরমিল থেকে গেলে কেন? অনুমান করা যায় যে, সাঁওতালগণ সহজ সরল উদারতায় একশত শতাংশই পূর্ণ। এদিকে বামুন ভন্ডামি, প্রতারণা, বিপ্রলিপ্সায় একশত শতাংশই পূর্ণ। ফলে তেলে জলে, আদায় কাঁচকলায়। তেঁতুলে চালভাজায় অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদিম মানুষেরা যা বলে, তা করে। তাদের কথায় ও কাজে মিল আছে। বামুনেরা যা বলে তা করে না। তাদের কথার সঙ্গে কাজের মোটেই মিল থাকে না। মনের মিল না হলে অন্য কোন রকম মিল হতে পারে না। যথা—

গৃহন্তি দন্তে সূতো মাখুমুখু
বসন্তি পুষ্পেষু কাষ্ঠেষু দ্বিরেফঃ।
আলিঙ্গয়তে স্ত্রীং চ সূতা চ
মনুষ্যরেকং মনসি প্রধানম্।।

মনই মানুষের অদৃশ্য চরিত্র। চরিত্রই মানুষের মনের রূপ। সেই মনই আবার মানুষের রূপকার। মানুষের হৃদয় আবা মনের নিয়ন্ত্রক ও সংযতকারি। এ সম্পর্কে ইংরাজিতে একটা কথা আছে— All beautiful things start from the Heart all lead

things start from the mint Never, let the mind rule your heart let the heart rule your mind.

তীব্র বহুবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র অন্য মৃদুবর্ণ দ্বারা পুনরায় রঞ্জিত ও অলঙ্কৃত করলে মৃদুবর্ণ সমূহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। সেইরূপ ক্রুর, কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনে সত্য, উদারতা, সরলতার মত মৃদু গুণ সমূহ অনুপ্রবেশ করলেও প্রতিভাত হয় না। আছে কি না তার অস্তিত্বই বোঝা যায় না। সঙ্গলাভ করলে সঙ্গীর বিচ্ছুরিত গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু গুণের তীব্রতা ও মৃদুতার উপর নির্ভর করে কোন গুণটি জগতবাসী দেখতে পাবে। খাদ্য গ্রহণ বিষয়েও আদিম ভারতীয়গণ অবশ্যই জানত যে, খাদ্যবস্তু সংগ্রহের মানসিকতা উক্ত খাদ্যবস্তুতে নিহিত থাকে। ঐ খাদ্যবস্তু পাক করে খাদ্য প্রস্তু করে সেই খাদ্য গ্রহণ করলে খাদকের উক্ত মানসিকতা সৃষ্টি হয়। আবার খাদ্যবস্তু সংগ্রহের মানসিকতা পবিত্র থাকলেও পাক করার সময় পাচকের মানসিকতা খাদ্য মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই খাদ্যগ্রহণ করলে অনুরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এই সব অনেকগুলি কারণে সাঁওতালগণ আদিযুগ থেকে বর্তমান আধুনিক যুগেও বামুনের সঙ্গ করে না ও বামুনের রান্না করা খাবার বা ছোঁয়া জলও খায় না। সাঁওতালের কাছে বামুন চিরতরে অস্পৃশ্য বর্জনীয়ই থেকে গেছে। ফলে পৃথিবীর প্রথম মনস্তত্ত্ববিদ জাতি বলেই সাঁওতাল সমাজ শঠ, প্রবঞ্চক, ভন্ড, প্রতারক হওয়ার হাত থেকে গোটা জাতিকে রক্ষা করেছে।

আদিম ভারতীয়দের উৎসব অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য :-

রহইন্ পরব :- ইহা বীজ বপন পক্ষ। জৈষ্ঠ্য মাসের ১৩ তারিখ শুরু হয়। চলে জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ পর্যন্ত। নির্ভর করে বৃষ্টি ও মাটির 'জো' বা 'বতর' কিম্বা 'বাতলি' এর উপর।

পাঁচআটি :- ধান্য রোপন শুরু উৎসব। মাঙ্গলিক পূজা, অর্চনা, গো বন্দনা ও পূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঝুমহই্র গাইতে গাইতে মাত্র পাঁচটি ধান চারার আটি তুলে ধান্য রোপন পর্ব শুরু হয়। চলে প্রায় সারা বর্ষাকাল। যে পর্যন্ত না রোপনের কাজ শেষ হয়। কুড়মিদের এই সময়ের একটি মাসের নামও রপা মাস। অর্থাৎ রোপন করার মাস।

করম পরব :- লক্ষ্য উদ্দেশ্য কৃষি সপ্তাহ পালন। বীজ পরীক্ষা, বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা, অঙ্কুরের যত্ন, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি উৎসবের মাধ্যমে সমাজের শিশু কিশোর কিশোরীদের হাতে কলমে শিক্ষাদানের, গবেষণার ও পয়রা চাষের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান। শেষ ভাদ্র শুক্লা একাদশীর দিন।

বাঁদনা পরব :- প্রাণী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ পালন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার চার দিন আগে থেকে শুরু হয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মহা ধূমধামের মধ্য দিয়ে সমাপন হয়। এই

সাত দিন গরুর শিং-এ তেল মাখানো হয়। উত্তম খাবার (কেবল খেড় ঘাস) দেওয়া হয়। শেষ দুইদিন গরুর কপালো ও শিং-এ সিন্দুর দেওয়া হয়। মাথায় ধান শীষের টোপর পরিয়ে মঙ্গলাচারের মধ্য দিয়ে বরণ (চুমান) হয়। গাভী ও এঁড়ে গরু একত্রে সংযুক্ত করে সাজিয়ে বরবধূ চুমান হয়। অশুভ নাশ ও বিদায় জন্য নিমছানো হয়। ফুল ও মালা পরানো এবং সারা শরীরে ছাপ দিয়ে সাজানো হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন কাড়া (পুং মহিষ) ও বলদকে খেলানো হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় বাঁদনা পরব সমাপন হয়।

খলা বা খামার দিবস :- আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন উপবাসে থেকে খামার বাঁধা হয়ে থাকে। যে খামারে ধান্যাদি শষ্য ঝাড়াই মাড়াই করা হবে।

টুসু পরব বা মকর পরব :- পৌষ মাসের প্রথম দিন শুরু হয়ে সারা পৌষমাস চলে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন সমাপ্তি ঘটে। সারা পৌষমাস যাবৎ টুসুগীত গাওয়া হয়। টুসুগীতে প্রশ্ন উত্তর, বর্ণনা, প্রেম, বিরহ প্রভৃতি সর্ববিষয় লক্ষ্য করার মত। প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব কবিত্ব শক্তি আপামর জনসাধারণ এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে আশ্চর্য্য লাগায়।

শিকার দিবস :- পালিত হয় দুইটি। আঞ্চলিক শিকার দিবস চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন 'মেল শিকার' ও কেন্দ্রিয় শিকার দিবস বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য :- আদিম ভারতীয়দের বিভিন্ন বিষয়ে কৃষি সভ্যতার যুগ থেকে পালনীয় দিবস, সপ্তাহ, মাস, উৎসব গুলি লক্ষ্য করেই তথা কথিত সভ্য সমাজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকাল থেকে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শহীদ দিবস, শিশু দিবস, অরণ্য সপ্তাহ প্রভৃতি পালন করতে শিখেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘ যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বই দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা করেছে তাও অনেক পরে। আদিম ভারতীয়দের দেখে রাষ্ট্রসংঘেও শিক্ষা নিয়েছে একথা বললে তা অত্যুক্তি হবে না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস ছিল (মে ডে) । তবে তা শিল্প বিপ্লবের যুগের। কৃষি সভ্যতার যুগ তার অনেক আগের যুগ। সম্ভবত আদিম ভারতীয়দের উৎসবের মাধ্যমে ঐ সমস্ত পালনীয় দিবস, সপ্তাহ, মাস প্রভৃতি বিষয়গুলি আনন্দময় স্মরণীয় করে রাখার চিন্তন মনন ও উদ্ভাবন বিশ্বে প্রথম। বিষয়টি অনুসন্ধান যোগ্য ও স্বীকৃতি পাওয়ার উপযোগী। উচিতও বটে।

কুড়মি এবং সাঁওতালদের বিবাহের পরবর্তী সম্পর্ক :-

বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে স্বামী বা স্ত্রীর মা বাবা সহ প্রত্যেকের সাথে জামাই বা নববধূর নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা পূর্বে ছিল না। বরের ক্ষেত্রে স্ত্রী,শ্বশুর, সাহড়ি,

শালা, শালি, পিসাশ্বশুর, পিসি সাহড়ি, মামশ্বশুর, মামসাহড়ি, সরোজিন, জেটশ্বশুর, জেঠিসাহড়ি, বুয়াসিন, পুতরা নববধূর ক্ষেত্রে স্বামী শ্বশুর, সাহড়ি, ভাসুর, ভাগিনজামাঞ, দেঅর, ভাগিনবউ, জা, ঠাকুরজি, ননদ, জেঠশ্বশুর, জেটিসাহড়ি, মামশ্বশুর, মামসাহড়ি, পুতরা, ঝিয়ারি, ভাইগনা, ভাগনি,ভাজ,ভাগিনজামাঞ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদিম জনজাতির সম্পর্ক ব্যবহারের সঠিক দিনক্ষণ না জানা গেলেও বর্তমানে দেখা যায় সে, এদের বেশ কয়েকটি সম্পর্ক কঠোর নিয়মের বাঁধনে বাঁধা আছে। যেমন ভাসুর, মামশ্বশুর, মামসাহড়ি, ভাগিনবউ, বুয়াসিন, ভাগিনজামাঞ প্রভৃতি সম্পর্কেই ব্যক্তিকেই স্নান করতে হবে। স্নান করারপূর্বে এদের খাদ্যগ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ। এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা দমন সংযম পালনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে তা অনুভব করা যায়। এরা শাশুড়িকে "মা" শ্বশুরকে "বাবা" বলে না। বলার বিধান নাই। বললে একই মা-বাবার সন্তান সন্ততি হয়ে যায় স্বামী এবং স্ত্রী। সম্পর্ক দাঁড়ায় ভাই বোন। তখন মানবিক এবং পাশবিক চরিত্র একাকার হয়ে যায়। প্রকৃত মানুষ তা চায় না।



বাসস্থান সৌন্দর্য্যায়ন ও সৌন্দর্য্য প্রীতি :-

প্রতি বছর সাঁওতাল এবং কুড়মি জাতি তাদের জীর্ণ কুটিরগুলি পরিষ্কার করে সাজিয়ে তোলে। ঘরের দেওয়াল, মেঝে, দাওয়া, উঠান, আঙ্গিনা, গোয়ালঘর, খামার, উনান সহ রান্নাঘরও বাড়ির আশপাশের চতুর্দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে সৌন্দর্য্যময় মনোরম দৃষ্টিনন্দন করে তোলে। এ কাজ তারা কারো নির্দেশে করেনা। অন্তরের তাগিদে নিজ নিজ উদ্যোগে করে থাকে। অলিখিতভাবে এই কাজের সমাপ্তির সময় সীমা বাঁধা আছে, কিন্তু শুরু কবে থেকে তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বাঁধা নাই। শেষদিনকে লক্ষ্য করে আরম্ভের দিন ঠিক করতে হয় নিজেকে নিজের কাজের পরিধি বুঝে। বর্ষাকালে ধান চাষ। ভাদ্রে নিড়ান ও বিভিন্ন পরিচর্যা। আশ্বিনে চাষের কাজ প্রায় থাকে না। এজন্য আশ্বিনের শেষদিকে শুরু করে কার্ত্তিকের অমাবস্যার পূর্বদিন উক্ত ঘর সাজানোর কাজ শেষ করতে হয়। কৃষি প্রধান এলাকায় হেমন্তের প্রারম্ভে ঘরদোর সুচিক্কন করে সাজানোর বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই সময় থেকে দীর্ঘ প্রায় সাত আট মাস বৃষ্টি হয় না। মনের মত করে সাজানো ঘর অবিকৃত থাকে। আবার ঠিক ঐ সময়ে কৃষিজাত ফসল উঠে। প্রতিটি ফসল দানা পরিষ্কারভাবে তুলে নেওয়া যায়। প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাত্রায় শাকপাতা সিদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকলেও আদিমি এই জাতিগুলিকে তাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি সত্য সুন্দরের পূজারীর পরিচয় দেয়। মাটি রং এ আবার রং ছাড়াই শিল্প সৃষ্টিতে এরা খুবই পটু।

নারী পুরুষ প্রত্যেকেই এই সময় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পুরুষেরা বিভিন্ন রকম মাটি জোগান দেয়। মহিলারা সেই মাটি দিয়ে সুচিক্কন করে তোলে সর্বত্র। দেওয়াল মসৃণ করার পর কোনরকম রং ছাড়াই অঙ্গুলের সাহায্যে নানা রকম নকসা অঙ্কন করে, যা জলছবির মত বারমাস দেখা যায়। কালীপূজার পরদিন দ্যুতপ্রতিপদ ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সারা আঙ্গিনায় আতপ চালের গুঁড়ি পাইনহা লতার রস বাইন্ডার হিসাবে মিশিয়ে "চোক পুরা" নামে চিত্রিত করে। চোকপুরা হয় জ্যামিতিক ছকে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় ছকের সংযোগ স্থলগুলিতে সিন্দুর বিন্দু দিয়ে। ভাবায় নিরক্ষর মহিলারা রং ছাড়াই দেওয়াল চিত্রিত করে। জ্যামিতিক ছকে চোকপুরা অনুষ্ঠানে, চোকের উপকরণে বাইন্ডারের ব্যবহার। সর্বোপরি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি। সবকিছু দেখে এই মহিলারাকে মুর্খ ভাবাই যায় না। মনে হয় কোন উন্নত শিল্প চেতনার রক্ত এদের শিরা উপশিরায়। তাই এদের মনের শিল্পানুভূতির এরূপ বহিঃপ্রকাশ।

সাঁওতাল-কুড়মিদের বিবাহ প্রকরণ :

কুড়মি এবং সাঁওতাল সমাজের ছেলেমেয়ের বিবাহ সামাজিক নিয়ম মেনে হয়ে থাকে। বর পক্ষ মেয়ের অনুসন্ধান করে পছন্দের জায়গাতে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কদাচ মেয়ে পক্ষ বরের অনুসন্ধান করতে যায় না এবং বিবাহের প্রস্তাবও পাঠায় না। উভয় সমাজে বিবাহে পণ প্রথা আছে। তবে তা বরপণ নয়, "কন্যা পণ"। কন্যাপণ একটাকা, তিনটাকা, পাঁচটাকা, ও সাতটাকার মধ্যে যেকোন একটি বিজোড় সংখ্যা স্থিরিকৃত হয় উভয় পক্ষের বিবাহে সম্মতি দানের পর একাসনে বসে। পণ কথাটা উভয় সমাজেই কন্যাপণের উর্দ্ধসীমা সাতটাকা মাত্র। যা যে কোন বর বা বর পক্ষের মালিকের ট্যাঁক থাকবেই। না থাকায় বর এবং কন্যা পণের উর্দ্ধমুখী উর্দ্ধসীমা না থাকায় এই জাতিগুলির যুবক যুবতীদের পড়ের টাকার অভাবে বিবাহ হয় নাই এমন ছেলে মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাকথিত সভ্য সমাজ অপেক্ষা আদিবাসী সমাজ কতখানি অসভ্য বা প্রকৃত সভ্য সমাজ কোনটি তা মুখের কথায় নয় আচরণের নিরীখে ভেবে দেখার সময় হয়েছে। আদিবাসী সমাজে বিবাহ কর্ম পরিচালনার জন্য পৌরহিত্য করার দায়িত্ব ভার অর্পিত হয় পদাধীকার বলে "জামাঞ" (জামাতা) এর উপর। ষোল প্রকার প্রক্রিয়া করণের মধ্য দিয়ে বিবাহ পর্ব শেষ হয়। এজন্য বলে "ষোল সগুনে বিহা"। বিবাহ অনুষ্ঠানে স্ত্রী আচার প্রাধান্য পায়। প্রবাদ আছে "বিহাঘরে মায়া রাজা"। বিবাহের তিনদিন আগে থেকে পাত্র এবং পাত্রীকে হলুদ মিশ্রিত তেল মাখানো হয়। প্রথম তেল মাখানোর দিন থেকে মহিলারা বিবাহ বিষয়ক গান করে। এই গানের নাম "বিহাগীত"। প্রতিটি সগুনের (প্রক্রিয়ার) পৃথক পৃথক গান গাওয়া হয়। প্রশ্ন মূলক গানের উত্তর মূলক গান মহিলারা তৎক্ষণাৎ রচনা

করে গেয়ে শোনায়। এদের বিবাহ অনুষ্ঠান সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগের অনুষ্ঠান। বিবাহের নিমন্ত্রণকে কুড়মিরা বলে "উভাল"। সাঁওতালেরা বলে "গিরা"। স্বজাতিতে বিবাহ হয় কিন্তু স্বগোত্রে নিষিদ্ধ। সামাজিক নিয়মে ভিন্ন জাতিতেও নিষিদ্ধ। সেজন্য কুড়মি ও সাঁওতাল জাতির মধ্যে বর্ণ সংকর নাই। উভয় জাতিই তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে, বিবাহে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র যথা, ঢোল, চেড়পেটি, সানাই, কাঁসর প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে বাদ্য শুরু করার পূর্বে "চুমায়" অর্থাৎ ধান, দুর্বা, হলুদ, পান, শুপারি, প্রদীপ দ্বারা বরণ করে। অন্য কোন জাতি বা সমাজে এই ব্যবস্থা দেখা যায় না। এরা যে কতখানি সুর ও সংস্কৃতি প্রিয় তা তাদের এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে পূর্বে বাদ্য ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ন্ত্রক দেবদেবীকে বাদ্যযন্ত্রে অধিষ্ঠান করার আহ্বান ও আমন্ত্রন মূলক (বরণ) "চুমান" দ্বারা অনুমান করা যায়। সেই সঙ্গে নব দম্পত্তির জন্য সুর ও সঙ্গত কতখানি প্রয়োজন এবং তার বিজ্ঞান সম্মত দিক কতখানি অপরিহার্য্য তা অপ্রচারিতই থেকে গেছে। বিধবা বিবাহ এই সমাজে আদিমকাল থেকেই আছে। বিবাহে প্রকারভেদও আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চুমানো হয় নাই। এদের পাত্র পাত্রীর বিবাহের পূর্বে উভয়েরই গাছের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তারপরে হয় পাত্রপাত্রীর বিবাহ। এরা যে কতখানি প্রকৃতি পূজক এবং পরিবেশবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন তা বিবাহে বোঝা যায়। এদের প্রত্যেকটি পুরুষ ও মহিলার সাথে গাছের সম্পর্ক দাঁড়ায় স্ত্রী এবং স্বামী। বর্ত্তমান বিজ্ঞান যেখানে প্রাণ অস্তিত্ব বিলোপের জনক, সেখানে প্রাণ বায়ুর স্রষ্টা গাছ এদের হয় স্ত্রী অথবা স্বামী। এদের বিজ্ঞান চেতনা বর্তমান বিজ্ঞান ও সভ্য সমাজ ভেবে নাগাল পাবে তা মনে হয় না।

সাঁওতাল ও কুড়মি জাতির বিজ্ঞান চেতনা :

'উইলসন' নামে একটা অসুখ আছে। এই রোগে শরীরে অতিরিক্ত তামা জমা হয়ে থাকে। বিদেশে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যা একজন এই রোগে আক্রান্ত হয়। ভারতে প্রতি পঁচিশ হাজারে এই রোগ একজনের হয়। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা আরও বেশি। এই উইলসন রোগের কারণ স্বগোষ্ঠী অর্থাৎ স্বগোত্রে এবং নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাহ হলে ওই দম্পতিদের শিশুর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই রোগে লিভারে তামা জমতে থাকে। তারপর রোগ তার মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ঘনঘন জন্ডিস এবং লিভারে রোগ হতে থাকে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে, অসহায় শিশুটি যতই বড় হয় কথাবার্তা জড়িয়ে যেতে থাকে। এক সময় কাথা বন্ধ হয়ে যায়। বেঁকেচুরে হাঁটে। চোখ নষ্ট হতে শুরু করে। কোনও কাজও করতে পারেনা।

ভারতীয় আদিম জনজাতি সাঁওতাল এবং কুড়মিদের বিবাহ ব্যবস্থায় অলিখিতভাবে আদিমকাল থেকে স্বগোত্রে বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আছে। এই জাতিগুলি আজও যা পালন করে চলেছে। সাঁওতাল এবং কুড়মিদের পূর্বপুরুষগণের এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা প্রমাণিত হয় য়ে, কুড়মি এবং সাঁওতালদের পূর্বপুরুষগণ বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের ন্যায় বিজ্ঞান চর্চা করত বা ততোধিক বিজ্ঞান সচেতনতা তাদদের সমাজে গড়ে তুলতে পেরেছিল। তারা অবশ্যই থ্যালাসেমিয়া, H.I.V. ঘটিত AIDS, হাঁপানি বা এ্যাজমা এবং উইলসন রোগ এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছিল। সত্যকে স্বীকার করলে এ যুক্তি অবশ্যই মানতে হয়। সত্য অস্বীকৃত হলে সূর্য্য ঘুরে পৃথিবী স্থির আছে এটাই চাক্ষুষ করা যেতেই পারে। খ্রীষ্টপূর্ব বিস্মৃত যুগ থেকে যে সব বিধি বিধান কুড়মি এবং সাঁওতাল জাতি পালন করে আসছে ঠিক সেই কথা বলে বিংশ একবিংশ শতাব্দীরবিজ্ঞানীরা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আর কুড়মি এবং সাঁওতালরা অসভ্য জংলি, চুয়াড়। কারণ? এরা বর্তমান বিজ্ঞানের জন্মের পূর্ব থেকেই বিষয়গুলি জানতে পেরেছিল। অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চা করত।

২০০০ খৃঃ একটি খবর :- সংবাদ প্রতিদিন ১০ মে, ২০০০ পৃষ্ঠা-৭ লন্ডন (রয়টার) শিশুদের হাঁপানি এবং অ্যালার্জি থেকে বাঁচাতে গর গেরস্থালির ধুলোর বিস্ময়কর কারসাজি আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। ঘরের ধুলোর মধ্যে এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া থাকে। নাম এনডোটস্কিন। এই এনডোটস্কিন অ্যালার্জি সংক্রমনে বাধা দেয় তার ফলেই হাঁপানি প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় শিশুদের। জানিয়েছে ডেনটার এবং কলোরাডোর ন্যাশন্যাল ডিউইশ মেডিকেল এন্ড রিসার্চ সেন্টার।

আদিম ভারতীয়দের একটি প্রবাদ—কলেক ছা গলে, ধুলা ছা বলে। অর্থ:- কোলের শিশু দুর্বল, শীর্ণ হয়, ধুলার শিশু সবল শক্তিধর হয়। অন্তর্নিহিত অর্থও তাৎপর্য্য:- "কলেক ছা", অর্থাৎ যে শিশুকে বেশির ভাগ সময় কোলে পিঠে করে রাখা হয়। মাটিতে নামতে দেওয়া হয় না। একোল সেকোল করে বল (লালন পালন) করা হয় সেই শিশু "গলে" অর্থাৎ দুর্বল, শীর্ণয় হয়। অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ভবিষৎ এবং জীবনে নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হতে পারে না। আবার কলেক ছা অর্থে যে বয়স পর্যন্ত শিশুকে কোলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। জন্মের পর থেকে সেই বয়সের শিশু প্রবাদের দ্বিতীয় অংশ-"ধুলাক ছা বলে" অর্থাৎ যে শিশু অধিক সময় ঘরের ধুলার সংস্পর্শে থাকে। কোলে নেওয়ার সময় এবং লোকের অভাব হেতু সেই শিশু ঘরের মেঝেতে ধুলায় খেলা করে, ধুলা মাখে, ধুলায় গড়াগড়ি দেয়, ধুলি ধুসরিত অবস্থায় ক্ষুধা পেলে কান্নাকাটি করে, তখন তার মা এসে অগত্যা বুকের দুধু খাওয়াতে খাওয়াতে হয়তো কিছু ধুলা ঝেড়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে গেলে ঐ ধুলিমাখা

অবস্থাতেই মেঝেতে শুইয়ে রেখে আবার কাজে মন দেয়। না ঘুমালে মেঝেতেই ছেড়ে নামিয়ে দিয়ে পুনরায় কাজে যায়। এই শিশুই প্রবাদের "ধুলাক ছা" বলে' অর্থে বলবান হয়। শক্তিধর হয়। অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সঞ্চয় করো। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে।

এক্ষণে বিচার্য্য :- বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে যা জনাতে পেরেছে, আদিম ভারতীয় সাঁওতাল কুড়মিরা খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০/১০০০০ বছর আগেই তা জানতে পেরেছিল। নইলে তারা এরকম প্রবাদবাক্য সৃষ্টি করতে পারত না। আদিবাসীগণ দশ বার হাজার বছর আগে যে বিষয় জেনে বসে আছে বিজ্ঞানীরা আজ সে বিষয় বা বিষয়টির সামান্য অংশ জানতে পেরেছে মাত্র। কারণ প্রবাদটির নিহিত অর্থ কেবল হাঁপানি প্রতিরোধ ক্ষমতাই ঘর গেরস্থালির ধুলোর মধ্যে আছে শুধু তাই নয়। নিরোগ সুস্থ সবল দেহ গঠনের আরও কিছু কিছু বিষয় থাকতেই পারে। যা দীর্ঘ গবেষণার বিষয় বলে অনুমান হয়। এই প্রবাদের জন্মের জন্য আদিবাসীদের গবেষণা কেন্দ্র, গবেষণার সাল তারিখ বা গবেষক মন্ডলী বা একক গবেষকের নাম ঠিকানা আজ বিস্মৃত। তবে যেহেতু খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত্য কোন জাতি বা সমাজ একথা বলতে পারে নাই, কেবল মাত্র আদিবাসীরাই বলেছে এবং বর্তমান বিজ্ঞানীরা তা আজ স্বীকার করেছে। ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের চেয়ে আরও গভীর এবং উচ্চ স্তরের বিজ্ঞান চর্চা আদিবাসী জাতিগুলির ছিল। নিজেদের প্রচার মাধ্যমের অভাবে অন্যদের অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে বিশ্ব মানব কল্যাণকারী বহুবিধ বিষয় প্রবাদে পরিণত হয়ে উত্তর পুরুষে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যা আজও মানুষকে পথ দেখায়। সময়ের ব্যবধান বলছে যে, সাঁওতাল এবং কুড়মি জাতি পৃথিবীর প্রথম উন্নত বিজ্ঞান চর্চাকারী মানবগোষ্ঠী।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাঁওতাল ও কুড়মি জাতির ভূমিকা :-
ইংরাজগণ ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসে। তারা প্রথমে কোলকাতায় পৌঁছায়। সেখানে তাদের থাকার সুযোগ করে দেয় বাঙ্গালীরা। কিছুদিনের মধ্যেই ইংরাজদের ব্যবসা বেশ প্রসারিত হয়। ১২ই আগষ্ট ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাদশাহ এর কাছ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, ওড়িসা, ছোটনাগপুর এবং আসামের দেওয়ানি লাভ করে। তারপরই ইংরাজগণ ভারতবর্ষে শাসনকার্য্য চালানোর জন্য তৎকালীন জঙ্গলমহল জেলায় জমি জরিপ করে খতিয়ান তৈরীর কাজ শুরু করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা আদিবাসীদের জমির উপর কোম্পানির অধিকার (মালিকানা) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মালগুজারি শুল্ক আদায় শুরু করে। ইংরাজদের এই প্রকার জল, জঙ্গল, জমির উপর ষড়যন্ত্রপূর্ণ গতিবিধি লক্ষ্য করে আদিবাসী কুড়মিগণ ১৭৬৯ খ্রীঃ ক্রান্তিবীর রঘুনাথ মাহাতর নেতৃত্বে ইংরাজ বিরোধী বিদ্রোহ শুরু করে। এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষে প্রথম ইংরাজ বিরোধী বিদ্রোহ। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ চুয়াড় বিদ্রোহ নামে

বর্ণিত হয়েছে। বাংলা ইতিহাসকার শ্রমিক সেন তাঁর এক নজরে পুরুলিয়া গ্রন্থে রঘুনাথ মাহাতকে চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। জহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি, এর প্রফেসার ডঃ বীর ভারত তলয়োর তাঁর আদিবাসী এবং আর এস এস গ্রন্থে দশ পৃষ্ঠায় কুড়মিদের বিদ্রোহকে চুয়াড় বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন।

রঘুনাথ মাহাতর নেতৃত্বে কুড়মি আদিবাসী মোর্চা দ্বারা চুয়াড় বিদ্রোহ (কুড়মি বিদ্রোহ) তিন বছর চলার পর সাঁওতাল এবং ভূমিজগণ এই বিদ্রোহে সামিল হতে থাকে। প রবর্তীকালে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিলকা মুরমুর নেতৃত্বে সাঁওতাল (খেরওয়াড়) বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিলকা মুরমুর ফাঁসি হয়। এই তিলকা মুরমুই ভারতের প্রথম শহীদ। তারপর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিধু, কানু, চাঁদো, ভায়রো ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডারি বিদ্রোহ শুরু হয়। দেখা যাচ্ছে যে সময়ে তথাকথিত ভারতীয় সভ্য সমাজ ইংরাজের দাসত্ব করছে এবং ভারত শাসনের সুযোগ করে দিচ্ছে তখন ভারতের আদিম জাতির মানুযজন ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহীদ হচ্ছে। আবার সেই সভ্য মানুষেরাই ইতিহাস রচনা করে আদিম ভারতীয়দের বিদ্রোহকে চুয়াড় বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছে। দেখা যায় ভারতবর্ষে কোন কালেই চুয়াড় নামে কোন জাতি বা সমাজ ছিল না। বর্তমানেও নাই। উক্ত সভ্য সমাজ ইংরাজকে তোষণ করে ইংরাজের গোলামি করে, ইংরাজদের ভারতবর্ষ শাসনের সুযোগ করে দিয়ে নিজেরা বেশি স্বচ্ছল আনন্দিত হয়েছে। তাদের স্বাধীন পরাধীন হুঁস, জ্ঞান, বোধ কোনটাই ছিল না। সেজন্যই তারা তাদেরই দেশের মানুষের ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনকে চুয়াড় বিদ্রোহ বলতে পেরেছে। এজন্য ভারতের ইতিহাস পাঠ করে সত্যের সন্ধান সত্যই দুর্লভ। শহীদ ক্ষুদিরাম বসু যখন বোমা তৈরি করতে গোপন স্থান হিসাবে বাঁকুড়া জেলার গভীর অরণ্যাবৃত ছেন্দাপাথর গ্রামে আসে তখন তাকে কুড়মি এবং সাঁওতালরাই বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছে। বাঘ ভালুকের আক্রমন থেকে বাঁচিয়েছে। খাবারও করে খাইয়েছে। তখন থেকে এখনো অবধি ওই ছেন্দাপাথর গ্রাামে সাঁওতাল এবং কুড়মিরাই বসবাস করছে। স্বাধীনচেতা আদিম সব জাতির প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতীয় ইতিহাসকারগণ সঠিক মর্যাদা দেয় নাই। ভারতবর্ষে স্বাধীন চেতনা ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেই প্রথম দেখা যায়। আদিবাসীরাই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন করে বিদ্রোহী হয়ে শহীদ হয়। এই আদিবাসীদের কাছ থেকেই সারা ভারত স্বাধীন চেতনা শিখেছে একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। অপ্রিয় সত্য বটে, অযৌক্তিক নয়।

কুড়মি এবং সাঁওতাল জাতির ধর্ম :-

ভারতীয় জনজাতি আদিবাসী জাতিগুলির মতই কুড়মি এবং সাঁওতালেরাও প্রকৃতি পূজক। কুড়মিরা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ দেবতা মূল শক্তি সূর্য্যকে 'মাহারাই' বা 'ধরম' মেনে সূর্য্যপূজা করে। যা ধরমপূজা নামে প্রচলিত। কুড়মি সমাজে বিধি আছে যে, ধরম পূজা না করলে কোন ছেলে বিবাহ করতে পারবে না। বিপাকবশত কারও ধরম পূজা না হয়ে থাকলে তাকে তার ঘরের মুধইনে সুপ (কুলা) ঝুলিয়ে রেখে বিবাহ করতে হয়। পূজার ক্ষেত্রে আখাইন, ধরমপূজা, রহইন, পাহাড় পূজা, সারহুল, জাঁতাল, করম, জিতা, বাঁদনার গরইয়া পূজা, ডিনিপূজা,টুসুপূজা, জিরহুড়, গাঁজন, খেত-খামার ইত্যাদি পূজা গুলি প্রত্যেকেই পূজারী হয়ে নিজ নিজ পারিবারিক পূজা করে থাকে। গ্রামের সার্বজনীন পূজা গরামথান, জাহেরথান/সারনা থানে লায়া (আদিবাসী) করে থাকে। কুড়মির এই প্রকার পূজা ও পরব এবং ধর্মীয় বিশ্বাস দেখে বোঝা যায় যে, এরা সনাতন হিন্দুধর্মের লোক নয়। সাঁওতাল এবং কুড়মিদের এই প্রকার ধর্মাচরণ ও সারনা থানের আধারে তাদের ধর্মের নাম দিয়ে রেখেছে 'সারনা'। আবার কিছু পন্ডিতজনের মতে এদের ধর্মের নাম 'সারি'(সত্য) ধরম। সাঁওতালি সংস্কৃতি গবেষক পন্ডিত হেমলেট বাস্কে মহাশয় তাঁর মতে বলেছেন এই ধর্মের নাম সারনা-সারি ধরম। তিনি ২৩ শা আগষ্ট দিনটিকে সারনা-সারি ধর্ম পালনকারী সমস্ত খেরওয়াড় (খেরোয়াল) জাতি গোষ্ঠীর মানুষজনেক "খেরওয়াড় ঐক্য দিবস" হিসাবে পালনের জন্য ডাক দিয়েছেন। হেমলেট বাস্কে মহাশয় প্রথম এই প্রস্তাব ঘোষণার দিন উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সাঁওতাল জাতির সর্বপ্রথম বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার এবং সারা ভারত সাঁওতাল জাতির দিশম গুরু সম্মানীয় নিত্যানন্দ হেমরম মহাশয়ও কুড়মি সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। তিনি বলেন পূর্বে সারনা-সারি ধর্ম পালনকারী জাতিগুলি একমাত্র "খেরওয়াড়" এই একই নামে পরিচিত ছিল।

সাঁওতাল এবং কুড়মিদের সারনা-সারি ধর্মের প্রবর্তক হয়তো ছিল। আজ তা বিস্মৃতির পথে। বর্তমানে এই ধর্মের কোন প্রচারক নাই। ফলে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় গুরু এবং গুরু দক্ষিণাও নাই। সেজন্য এদের ধর্ম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় হয় না। সামাজিক বিভিন্ন নিয়মের বাঁধনে লোক পাঠশালা, লোকবিদ্যালয়, লোক মহাবিদ্যালয় এবং লোক বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ধর্ম শিক্ষার তথা সুর, সঙ্গীত, গীতবাদ্য ও নৃত্য শিক্ষার সুকৌশল বিধি বিধানের সুবন্দোবস্ত আছে। এই জাতির মানুষেরা ভীষণ ভাবে ধর্মভীরু। এদের ধর্মীয় স্থান জাহেরথান বা সারনা থান ও গরামথান খোলা মাঠে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত। কোন রকম ঘর তো নাইই, প্রাচীর তাও নাই। এমন কি কাঠ বা বাঁশের বেড়া তাও নাই। এদের ঠাকুর দর্শন করতে লাইন দিয়ে বা গেটে টিকিট করে ঢুকতে হয় না এবং ধর্মস্থানের কোথাও কোন রকম প্রণামি বাক্সও নাই। ভক্তি সহকারে আন্তরিক প্রণাম নিবেদন করা যায়। তারজন্য টাকা পয়সা লাগে না। এরা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিরাকারে বিশ্বাসী। সেজন্য এদের

ধর্মীয় স্থানে মাটির, কাঠের, পাথরের, ধাতুর বা মিশ্রধাতুর কোন মুর্ত্তি এরা রাখে না। যে সর্বশক্তিমানের কাছে রবি শশী গ্রহ তারা খেলনা সময়। সেই অমোঘ শক্তিধর সারা মহাকাশ ব্যাপী বিরাজমান। যে মহাকাশের কূল কিনারা (সীমারেখা) আজও মানুষের অজানা সেই সারা মহাকাশ জুড়ে এই পৃথিবীর জলস্থল প্রতিটি অনু পরমানুতে যিনি বিরাজমান তাঁকে সঙ্কুচিত করে ছোট্ট একটি ঘরে তালা বন্ধ করে আবদ্ধ করে রাখার মত অহমিকা এই ধর্মের মানুষদের নাই। সর্বশক্তিমানকে মানবশক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে, সকালে তালা খলে জল দিলে সে মুখ ধুতে পাবে, খেতে দিলে খাবে, নইলে উপবাস, সর্বশক্তিমানের চেয়ে মুর্ত্তি পূজারীর শক্তি বড়, সারনা-সারি ধর্মের মানুষেরা এ বিশ্বাস করে না। সেজন্য অহংকার শুন্য মানুষ পরায়ণ মুর্ত্তি পূজা পূজা সম্পর্কে উত্তর গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম থেকে শ্লোকে বলা হয়েছে - "অগ্নিদেবো দ্বিজাতীর্ম মুনীনাং হৃদি দৈবতম। প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধীনাং সবত্র সমদর্শিনাম।।" অর্থাৎ ব্রাহ্মন দিনের দেবতা অগ্নি , মুনিদিগের দেবতা হৃদয় মধ্যে-স্বল্পবুদ্ধি, মনুষ্যদিগের প্রতিমাই দেবতা-আর সমদর্শী মহাযোগীদের দেবতা সর্বত্রই আছেন। অতএব আচরণই বলবে কে স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্য আর কেই বা সমদর্শী মহাযোগী।

সাঁওতাল ও কুড়মি জাতির সমাজ প্রশাসন ব্যবস্থা :-

গ্রাম স্তর থেকে দেশ স্তর পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কার্য্য পরিচালনার জন্য উভয় জাতির শাসন কাঠামো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত আছে। যথা—

১) **গাঁ (গ্রাম)**-গ্রামবাসীদের মতকে বলে ষোলআনা। মালিক/প্রধান- মাহাত মাঝি, পরামর্শদাতা- পরামানিক, পূজারী-লায়া (স্বজাতির), ডাকহাঁককারী/সংবাদ পরিবেশক-গড়াইত।

২) **চাটা**—(দশ বারোটি গ্রাম নিয়ে একটি চাটা)- প্রধান- মাঝি/মাহাত, সমাজের দোষ (পাপ) মোচনকারী-পটলই, সমাজের অপরাধমূলক বিচার সভা বসে গ্রামকে নিয়ে।

৩) **পরগনা**-(চার পাঁচটি চাটা নিয়ে একটি পরগনা)-প্রধান-পরগনইত, পরগনায় ফৌজদারি বিষয় নিয়ন্ত্রন করে-মাঝি, বাকি সব চাটার ন্যায় থাকে।

৪) **মাড়ওয়া/মুলুক** :- প্রধান- মোড়ল, শাসক-দেওয়ান, বিচার সভার মতামতকে বলে -রায়, রায় পাঠক-পঢ়ওয়া, সমাজ দেখাশুনা এবং পরিচালনাকারী -সরকর।

৫) **দেশ**- প্রধান-দিসম পারগেনা বা দেশ মোড়ল , বাকি সব মুলুক মাড়ওয়ার ন্যায় পৃথক পৃথক দায়িত্বে পৃথক পৃথক পদে থাকে।

সাঁওতাল এবং কুড়মি জাতির গোত্র :-

সাঁওতাল জাতির গোত্র-১২ (বারো) টি। যথা—১। মুরমু, ২। মান্ডি, ৩। বাস্কে, ৪। সরেন, ৫। হাঁসদা, ৬। টুডু, ৭। হেমরম, ৮। বেসরা, ৯। কিস্কু, ১০। চঁড়ে, ১১। পাওরিয়া, ১২। ডঁড়ক/গেঁড়ওয়ার।

কুড়মি জাতির গোত্র- ৮১ (একাশি) টি। অনেকগুলি গোত্র সাঁওতালি গোত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আছে। আরও অনেকগুলি প্রায় মিল আছে। আবার মাহলি জাতির গোত্রের কয়েকটি ছাড়া সব কয়টির সাঁওতালি গোত্রের সাথে মিল আছে। মুন্ডা জাতির গোত্রগুলিও সাঁওতালদের গোত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে। ফলে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায় যে, একদা এই সমস্ত জাতিগুলি একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। তখন একত্রে তাদের নাম ছিল খেরহড় বা খেরওয়াড়। যা পরবর্তী সময়ে অনেকেই খেরোয়াল বা খেরওয়াল বলে ধরে নিয়েছে।

পরিশেষ :-

কুড়মি এবং সাঁওতাল জাতি ভারতবর্ষের গৌরব আদি সভ্যতার স্রষ্টা। এতদুভয় সমাজে তাদের যে ভাষা, সংস্কৃতি,সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মদর্শন, সামাজিক দর্শন আছে তা সারা বিশ্বকে সাম্য এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পথ দেখাতে পারে। এই সমাজে যারা জন্মগ্রহণ করছে তারা অবশ্যই ভাগ্যবান।

সূত্র :-

১। কুড়মালি মুলুক (পত্রিকা), প্রকাশক- মুলকি কুড়মালি বাখি বাইসি, পুরুলিয়া। সম্পাদক- সাধন মাহাত

২। কুড়মি সমাজের আগু বাঢ়েক খসড়া আউড়ান (স্মরণিকা)- সম্পাদনা-চারিআন মাহাত, প্রকাশক-পুরবানচল আদিবাসি কুড়মি সমাজের পুরুইলা জেলা কমিটি।

৩। আলোক তীর্থ— শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

৪। একদিন-দৈনিক সংবাদপত্র, ১ লা জুন-২০১৬, পৃষ্ঠা-৪

৫। বর্তমান-দৈনিক সংবাদপত্র, ৫ অক্টোবর-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩ এবং ১৫/৫/১৯৯২ সংখ্যা।

৬। সংবাদ প্রতিদিন- দৈনিক সংবাদপত্র, ১০ মে ২০০০, পৃষ্ঠা-৭

সহযোগী ব্যক্তি:

হেমলেট বাস্কে (শিক্ষক), তরুনকান্তি মাহাত (ছেলে), শক্তিবালা মাহাত (স্ত্রী)।

প্রত্যক্ষ সহযোগীতা :

সাঁওতাল এবং কুড়মি সমাজ, বীক্ষণ ও মনন প্রেরণা :- কিরীটি মাহাত, সম্পাদক-মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি





বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তনে কুড়মালি সংস্কৃতির অবদান

সঞ্জীব মাহাত

কুড়মি জাতি কৃষিজীবি ও কুড়মালি সংস্কৃতি কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষিকাজ এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপজীব্য হলেও তার সুদৃঢ় ভিত্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়েছে বলে প্রায় ৮,০০০-১০,০০০ বছর পরেও কৃষিকেন্দ্রিক কুড়মালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার পরিণতির মধ্যেও এক গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস ও তার সংশ্লিষ্ট অধ্যায় জড়িত রয়েছে। বুঢ়াবাপ (শিব) কৃষি সভ্যতার জনক তা 'অহিরা গিতে' মর্ত্যভূমে সিরিগাই ও সিরিবলদকে প্রেরণ করে এক যুগান্তকারী কৃষিসভ্যতার জন্ম দিয়েছেন। কুড়মি জাতি তার ধারক ও বাহক। তাই যথার্থ বলা যেতে পারে যে, শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর (প্রভাতরঞ্জন সরকার) সংব্যাখ্যান ও তত্ত্ব অনুযায়ী বুঢ়াবাপ দ্বারা প্রবর্তিত ও তন্ত্র আধারিত "পথ চলতে ইতিকথা" বইতে দ্বিতীয় খন্ডে উল্লিখিত কৃষিসভ্যতার ও সংব্যাখ্যান ও তত্ত্ব অনুযায়ী বুঢ়াবাপ দ্বারা প্রবর্তিত ও খন্ডে উল্লিখিত কৃষিসভ্যতার ও সংস্কৃতির অনুমানিক কাল প্রায় ৭,৫০০-৮,০০০ বছর। তিনি "পথ চলতে ইতিকথা" বইয়ের প্রথম খন্ডের ৯১ পৃষ্ঠাতে বলেছেন যে পশ্চিম রাঢ়ে হাল-বলদের সাহায্যে এঁরা কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অন্যেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে 'মহাত্মন' বলে সম্বোধন করতেন যা পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মাহাত'। মাহাত জনগোষ্ঠীর সভ্যতা অন্তঃতপক্ষে ৭,০০০ বছরের প্রাচীন। ২০০০ সালে খড়গপুর আই.আই.টি-এর "Archaeological Survey of India" (ASI) ভূপদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. অনিন্দ সরকার পৃথিবী বিখ্যাত 'Nature'- জার্নালে "Cradles of Civilization" -এ উল্লেখ করেছেন যে কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার জন্ম ৮,৫০০ বছর আগে। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী "নমঃ শিবায় শান্তায়" গ্রন্থে বাংলার ছটি উপগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে পশ্চিমি রাঢ়ের কুর্মী মাহাতকে জাত বাঙালী বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং কৃষিসভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা উচ্চারিত হলে কুড়মি জাতির নাম উচ্চারিত হবে কারণ কুড়মি ছাড়া কৃষিকাজ ও



কৃষিজ সভ্যতার বিকাশ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন সম্ভব নয়। কুড়মি জাতি কৃষিকাজকল্পে এক একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উন্নত চিন্তাধারা দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞান ও দার্শনিক মনস্কতার সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিফলন ঘটিয়ে সামাজিক জীবন উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে এক অনন্য রোল মডেল স্থাপন করেছে।

কুড়মালি সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিম্নে আলোচিত :—

(১) কুড়মি জাতির বাসস্থান ও জনবসতি স্থাপনে বিজ্ঞান:-কুড়মি জাতির বাসস্থান স্থাপন সম্পর্কে একটি কুড়মালি প্রবাদে কথিত আছে যে,—"জঁদে জঁদে পানিক সত্, তঁদে তঁদে কুড়মিক জট" অর্থাৎ যেখানে যেখানে কৃষির উপযুক্ত জলের স্রোতধারা সেখানে কুড়মি জাতির বাসস্থান। জল মানুষের জীবন ও জীবকোষের প্রটোপ্লাজম সজীব রাখার অন্যতম উপাদান। জলের মাধ্যমে জীব ও উদ্ভিদ পুষ্টিলাভ করে। সুতরাং কুড়মি জাতির বাসস্থান জলাশয়ের সন্নিকটে কিন্তু গ্রামগুলি লোকালয় থেকে দূরবর্তীস্থানে যেখানে জনকলরব নেই, মুক্ত পরিবেশে মনের উদারতা, বিস্তৃতি, সরলতা, দাক্ষিণ্য বিরাজমান। কুড়মি জাতির বাসস্থানগুলি বনজঙ্গলের ধারে ও পাহাড়ের কোলে অবস্থিত হওয়ায় সহজ বা সরলতা ও মানবিকতার পরিচয় বহন করে। আবার কুড়মালি প্রবাদে বলা আছে যে—"বাঁধ লইখ্খেঁ চাস, কুটুম লইখ্খেঁ বাস"—অর্থাৎ কুড়মি জাতি বাঁধ বা জলাশয়কে লক্ষ্য করে চাষবাস করে ও প্রাণী উদ্ভিদ সকলের সঙ্গে কুটুম্বিতার মাধ্যমে সামাজিক মেলবন্ধনের সূচনা করে ভারতে কৃষি সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে।

(২) কুড়মিদের খাদ্যদ্রব্য ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রতিফলন :— কুড়মালি প্রবাদে প্রচলিত আছে যে— *"ঢঁড় কুড়মি একাশি*
ভালুক জুকুর বসতি"

কুড়মি জনগোষ্ঠীর ৮১ টি টোটেম ও তার বেশ কিছু উপগোত্র বিদ্যমান। যাইহোক, এরা সম্পূর্ণরূপে আমিষাশী। কুড়মি জাতি কৃষিজীবি হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক বাড়ীতে গবাদি পশু ছাগল, ভেড়া ও বিভিন্ন পক্ষীজাতীয় জীব; যেমন—হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি থাকার জন্য কুটুমদের মানসম্মান বজায় রাখার জন্য ভালো তরকারির (বেসাতি) আয়োজন করত। মাংসের সাহায্যে কুটুমের মনোরঞ্জন করা হতো। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে যারা কঠোর পরিশ্রমী বা শ্রমজীবি তাদের শরীরস্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য আমিষাশী খাদ্যের শরীরে প্রয়োজন। আবার প্রচলিত আছে যে—"কুড়মিক মাঁড় আর ভূমিজেক কাঁড়"—অর্থাৎ কুড়মি জাতি কৃষিজীবি হওয়ার সুবাদে খাদ্য তালিকায় ফ্যান ভাত পছন্দ করে। ফ্যান ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শাক ভাজা (লাউ শাক, কলমি শাক, পালংশাক, কুমড়া শাক, পিড়িংশাক, লইটা শাক, লেটুস শাক, গাঁইটা শাক, সুসনি

শাক, সজিনা শাক, পুই শাক, গানধারি শাক ব্যবহার করে। কুড়মালি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের নমুনা নিয়ে গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে যে, ঢেঁকিছাটা চালের মধ্যে ভিটামিন—D, ভিটামিন—B_1।(থিয়ামিন), ভিটামিন-B_3 (প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড) বিদ্যমান ও সবুজ শাকসব্জিতে ভিটামিন-G, ভিটামিন- A, ভিটামিন-D, ভিটামিন-F, ভিটামিন K বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-B_1 ভিটামিন -B_2, ভিটামিন-B_m, ভিটামিন-B_6, ভিটামিন-C প্রচুর পরিমানে থাকে। ইহা ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, সালফার, তামা, কোবাল্ট, দস্তা, ক্লোরিন, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এবং কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন প্রভৃতি থাকে। দেশী গরুর দুধ, ঘোল, ঘি, ছানা প্রভৃতিতে দেহপরিপোষক খাদ্য ও দেহ সংরক্ষক খাদ্যের উপাদান রয়েছে। গরাম থানে যে পাঁঠা বলি দেওয়া হয় তার যকৃতে ভিটামিন-A, ভিটামিন-D, ভিটামিন-B, রয়েছে যা পরিপাকনালী, স্নায়ুর ক্ষয় রোধ, মেরুদন্ড ও করোটির অস্থিবৃদ্ধি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাসের শোষণ ক্ষমতা, ত্বকের সুস্থতা রক্ষা প্রভৃতি বজায় রাখে। বারি পূজায় হাঁসের মাংস কৃমি নাশ ও যকৃৎ ভালো রাখতে সহায়তা করে। আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে তাল মানব শরীরে পিত্ত দূরীকরণে সাহায্য করে।

(৩) কুড়মালি সংস্কৃতি ও সাধারণ বিজ্ঞান :-

কুড়মালি ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে—

> *"রাউএ চিনহাঁই জাইত*
> *চারিঁই চিনহাঁই পাঁইত।"*

শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে উচ্চারণবিধি নির্ধারণ করে তার জাতিসত্ত্বামূলক শ্রেণী ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জানা যায় সে কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। সংস্কৃতি মানুষের চিন্তাধারা, রুচি, মননশীলতা, ব্যক্তিজীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরিচয় উন্নত মানবিক আচরণ তুলে ধরে। কুড়মালি সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান এক অপরের পরিপূরক। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানচেতনা ও মনস্কতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ধর্মীয় বা বস্তুবিষয়ক সামাজিক সংস্কৃতিকে হাঁটু মুড়ে প্রণাম করার মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে বসমতার সঙ্গে ব্যক্তিসত্ত্বাকে বিশ্বসত্ত্বার সাথে বিলীন করা তেমনি অন্যভাবে রক্তসংবহন ক্রিয়া, যথাযথ স্নায়ুর স্পন্দন, ভারমুক্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ার মধ্য দিয়ে পাচকতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ, পাকস্থলি, অন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয়ে থাকে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে বাচ্চাজন্মের আগে থেকে বিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ধারা চলতে থাকে। গর্ভবতী মাকে সাধভক্ষণের মাধ্যমে গুণগত খাবার দানের মধ্য দিয়ে সব জায়গায় বিজ্ঞানের বর্হিজগতের শব্দব্রহ্মের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য 'ছাঁছা ঢাড়হা' ব্যবহৃত হয় কারণ নবাগত বাচ্চা মাতৃজঠরের উষ্ণতা,

তাপ, অক্সিজেন প্রভৃতির সঙ্গে সাবলীলভাবে একাত্ম ছিল কিন্তু তার কাছে বসমতার পরিচিতি ছিলনা ও সেই সঙ্গে যাতে সে পৃথিবীর সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতাকে জয় করতে পরে সেজন্য শব্দব্রহ্ম দিয়ে হৃৎস্পন্দনের সহনশীলতার ক্ষমতাশক্তি ও প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনের ক্ষমতা যাচাই করা হয়ে থাকে। প্রাণীবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল প্রমাণ করেছেন যে, একধরণের সামুদ্রিক ক্যাটফিস, মাছ, বাচ্চা প্রসবকালে শব্দ উচ্চারণ করে। সন্তান ও ডিম প্রসবের প্রকৃতি অনুসারে প্রাণীজগতের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সুতরাং অ্যারিস্টটলের বহু বছর আগে কুড়মি জাতি বাচ্চা প্রসবের পর শব্দ ব্রহ্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বিষয়টি অতি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়া ছেঠি, চিড়ি/ডাভনা, পহিলা উমেরে বিহা সব জায়গায় বিজ্ঞানের ছোঁয়া বর্তমান। কুড়মালি বিবাহ রীতিতে ছিপা চাউর, রেবাইর, খারছাড়ি, মাড়ুআ বাঁধা, পুঁড়খুখড়ি, আমবিহা, গুআটিকা, ডুভাভাঁজন, অড়হান পিঁড়ান, মহুল বিহা, হাঁড়ি বিহা, সিঁদরা দান, পরছন, চুমান প্রভৃতি জায়গায় সুনির্দিষ্ট যুক্তি তর্কসহযোগে বিজ্ঞানের প্রতিফলন বর্তমান। একইভাবে কুড়মালি মৃত্যু সংস্কার সংস্কৃতিতে ডউর কপিন পিঁধাউন থেকে শুরু করে পিঁড়হি পাড়ন—'রকত পাড়া'-ছাঁহের ঝিঁকা ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান কাজ করে ও তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে ধাপে ধাপে প্রমাণ করে।

(৪) কুড়মালি ভাষা ও বর্ণবিজ্ঞান :- কুড়মালি ভাষায় বর্ণবিজ্ঞান বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে—"সাত কোশে পানি, তিন কোশে বানি।" কুড়মালি প্রবাদটি প্রমাণ করে যে, চৌদ্দ কিমির নিরিখে ভূমন্ডলের মৃত্তিকা ভেদে ও জলস্তরের সাপেক্ষে জলের স্বাদের ভিন্নতা দেখা যায়। একইভাবে প্রতি ছয় কিমি দূরত্বের ব্যবধানে ভাষার উচ্চারণবিধি, শব্দবিন্যাস, প্রয়োগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। দূরত্বের পরিমাপে তারতম্য হতে পারে কিন্তু ভাব ও অর্থের প্রকাশ একই ভাবে বিদ্যমান। কুড়মালি ভাষা প্রাচীনতম ভাষা হওয়ার জন্য তার মধ্যে একপদ বা দ্বিপদ সহযোগে কাব্যিক ছন্দে আহনা/দাঁতকথা/ডাকপুরুষেক কথা যেমন রয়েছে তেমনিভাবে কাব্যিকছন্দে ও সুরে উপমা, রূপক প্রভৃতি সহযোগে লাহনা ও এক গুরুগম্ভীর অন্তর্নিহিত ভাবব্যক্ত রয়েছে। 'অবলাক সঁগে চাব আর অদেখাক সঁগে বাস,' 'অজগইবিক ঘঘি আড়া পেছুবাটে সিঁআড়া, 'আঢ়াক কাম বাঢ়হা' প্রভৃতি আহনা বা দাঁতকথা সংক্ষেপে এক বৃহৎ বা বিস্তৃতভাব ও অর্থ প্রকাশ করছে। আবার, লাহনা সমূহ—

"একক, দুকক তিকক মালা,
দাঢ়ি দুঢ়ি চঁথি ফেলা।

টাঁঞ টুঁঞ টটক ডিম,
হাঁথিক নেগুড় মইসেক সিঁগ।
তাঁতি তুড়ি উনিস কুড়ি।"

লাহনার মাধ্যমে সংখ্যাতত্ব, শব্দব্রহ্ম, রূপক প্রভৃতি প্রকাশিত হচ্ছে। একইভাবে—

"দক্ষিণে সুই,
উত্তরে থুই।
পুবেঁ রাঁধি,
পছিমে বাঁধি।"

উক্ত লাহনার মাধ্যমে কোন্ দিকে কোন্ ধরণের কাজ করতে হবে তার ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তীকালে যখন মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটল ও চিন্তন প্রসারিত হল তখন একটা সমস্যাবহুল বিষয়কে নিয়ে জান কহনি/ ভাঁগান কহনির উৎপত্তি ঘটল। যেমন— 'মামাক ছাগইর ছুলেই মেমাই', 'ছুটু মামাক গটে গাত জামা', 'একটা ঘারেক দুইটা দুআইর, 'এক থাল সুফারি, গনে লারে বেপারি', ইত্যাদি যার পর্যায়ক্রমে উত্তরগুলি—মাদইর, পিঁআজ, নাক, তারা প্রভৃতি অতিসুদর প্রকাশভঙ্গি, প্রত্যুৎপন্নিমতিত্ব, ভাবুক মনোভাব তুলে ধরে। শেষ পর্যায়ে বুদ্ধির বিকাশও চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর সঙ্গে ব্যাপক ভাবনা ও বিস্তৃত পরিধি নিয়ে সুন কহনির আবির্ভাব ঘটল। সৃষ্টিতত্ত্বকথা, করমকথা, রাইত কথা, জাইত কথা, টুসুকথা প্রভৃতির মধ্যে এক সুসংহত, বিস্তৃতভাব বিন্যস্ত রয়েছে। অন্যদিক কুড়মালি ভাষায় জড়িমাছা সাড়া (দ্বৈতবাচক শব্দ) একদিকে ভাবে গভীরতা বহন করছে ঠিক অন্যদিকে এক শব্দে ভাব প্রকাশিত না হওয়ায় শব্দসমূহকে জোর দিয়ে অনুধ্বনিমূলক শব্দের আগমন ঘটছে। যেমন— 'অনা-অনি','অড়হি-পাড়হি', আলা-পালি, 'আঁচা-আঁচি', উঠি-পাঠি, প্রভৃতি জড়িমাছা শব্দগুলি ভাবকে অতি গভীরে নিয়ে যাচ্ছে ও ভাষার নন্দনতত্ত্ব ও মাধুর্য বৃদ্ধি করছে। কুড়মালি, জাউআ গিত, অহিরা গিত, বিহা গিত, টুসু গিত, ডমকচ গিত, ধানরপা গিত, জাড়রি গিত, চাঁচর গিত, ডপ গিত, ঝুমুর গিত প্রভৃতির মধ্যে বর্ণবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও ব্যাকরণ রয়েছে। গিতগুলির মধ্য দিয়ে সামাজিক, আর্থসামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় চেতনার প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। কুড়মালি ভাষার বিজ্ঞান কারণ কুড়মালি ভাষায় ভাষাতত্ত্ব (Philology), ভাষা বিজ্ঞান (Linguistics), ব্যাকরণ (Grammar), ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) ভাষাধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology), ভাষাধ্বনিগুচ্ছ (Phoneme) বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এটি ভাষার সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে এক সমৃদ্ধ ভাষার জননী হওয়ার দাবী রাখে। সাহিত্যের কথা বলতে গেলে কুড়মালি এক সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য আছে—মৌখিক সাহিত্য ও লিখিত সাহিত্য। আহনা, লাহনা, জান

কহনি, জড়িমাছা সাড়া, বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক গিত নিয়ে মৌখিক সাহিত্যের কলেবর দাঁড়িয়ে আছে; অন্যদিকে কুড়মালি কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প,অনুবাদ সাহিত্য, সমালোচনামূলক সাহিত্য নিয়ে তার লিখিত সাহিত্য প্রতীয়মান।

(৫) কুড়মালি সারনা ধরম (প্রকৃতির ধর্ম/হড় ধর্ম) ও আধুনিক বিজ্ঞান :- কুড়মালি ভাষায় এক বহুল প্রচলিত আহনা (প্রবাদ প্রবচন) বিদ্যমান— 'জেনিক মরদ, মরদেক বরদ' অর্থাৎ স্বামীর ক্ষমতায় স্ত্রী সৌভাগ্যসূচিত, তেমনি বলদের ক্ষমতায় কৃষিজীবি মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বিষয়টিকে আরোও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ; আবার বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম খোঁড়া। বিষয় দুটি একই মুদ্রার দুটি পিঠের মতো কাজ করে। কুড়মালি রীতিতে তেজের মাধ্যমে যেমন মানবদেহের অভ্যন্তরীন প্রক্ষোভসমূহ—দয়া, মায়া, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, ভালবাস প্রভৃতির বাহ্যিকপ্রকাশ ঘটে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবতাবাদের জাগরণ ঘটে তেমনি সারনা ধরমের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রতিফলন দেখা যায়। কুড়মালি নেগাচারে 'ধরম পূজায়' ধর্মীয় ভাবনার মধ্য দিয়ে ভাষা সংস্কৃতির জাগরণের জন্য 'মাহারাই গিত' গাওয়া হয়ে থাকে। মাহারাই গিতের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে সামাজিকতা, মানবতাবোধ প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে। কুড়মালি মৃত্যু সংস্কৃতি 'জাগরণ গিতের' মাধ্যমে পূর্বপুরুষকে স্মরণ, বুঢ়াবাপ সহ অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, বর্তমান পুরুষদের প্রতি সহানুভূতি, সামাজিকতা, মানবতা প্রভৃতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বলিপ্রথার মাধ্যমে Matter থেকে শক্তি বিকিরিত (Shooting Particle) হয়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা স্বাধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট অণু (Super Atom Form) গঠন করছে। সুতরাং ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাঁহামাঁঞ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রক্তসঞ্চালকের মাধ্যমে ধনাত্মক ও ঋনাত্মক কণার মাধ্যমে পুনঃসৃষ্টি ঘটে পূর্ণসত্ত্বার সঞ্চার ঘটে।

(৬) কুড়মালিতে খেলাধূলার ভঙ্গিমা ও মনোবিজ্ঞান :- কুড়মি জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সামাজিক জীবনযাপন করে। গোষ্ঠীর মধ্যে তারা তাদের ভাবপ্রকাশ ব্যক্ত করে। কুড়মি অধ্যুষিত জায়গার ছেলেমেয়েরা অসটা, বাঘ-ছাগল, পাঁচ, ডেঁড়া, বৌড়ুড়ু, চলোক(তীর ডান্ডা), কিতকিত, নাম ডাকাডাকি, ভল্টু, পাত লুকা, কঁইড়া, ছুর, ভাড়ু গুডু, কানামাছি, কাঁচগুটি, ডিমচুরি, ডাংহটকা, সাঁড়াটুঁই, সিম খেলা, বৃত্তা পয়সা খেলা, ঘাঁড়ি উড়া, সনা তুঁপা, পাঁচু প্রভৃতি খেলাধূলা বিদ্যমান। এইসব খেলাধূলার মাধ্যমে যেমন উপস্থিত বুদ্ধি, যুদ্ধবিদ্যার রণকৌশল, আত্মরক্ষা, সংখ্যাতত্ত্ব, তৎপরতা, কল্পনাশক্তি, শরীরচর্চা, শিল্পনৈপুণ্যতা, কলাকুশলতা, প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটে। উক্ত

খেলার মধ্য দিয়ে কুড়মি লোকজীবনের ভাবব্যঞ্জনা, সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, আনন্দ বিনোদন সুন্দর ও সুচারুভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি, জীবন সংগ্রামের কলাকৌশল, ছড়া, ধাঁধার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত অর্থপ্রকাশ (যেমন-চুউ...কিতকিত, রণবন বাজে বাঁশি বিজুবন) কুড়মালি অধ্যুষিত মানুষদের কাছ থেকে মানবজীবনের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালাভ করা যায়। এমনি কঁইড়া খেলা থেকে ক্রিকেট খেলার জন্ম হয়েছে কিনা তা বিতর্ক ও গবেষণার বিষয়।

(৭) কুড়মালি সংস্কৃতি ও আচরণমূলক মনোবিজ্ঞান :- কুড়মালি ভাষাতে বহুল প্রচলিত আহনা আছে যে—"অবলাক সঁগে চাস, অদেখাক সঁগে বাস" কথাটির মধ্য দিয়ে মানবীয় আচরণ ও জীবজন্তুর আচরণ ফুটে উঠেছে। অদেখা বা অপরিচিত মানুষ যেমন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে সুনির্দিষ্টভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে সমাজে বসবাস করে; একইভাবে কুড়মি সমাজে বলদ গরু প্রভৃতি জীবজন্তুর ভাষা বা আচরণ বুঝে কুড়মি জাতির মানযজন তাকে কৃষিকাজে ব্যবহার করে। আবার পাখির আচরণবাদের মধ্য দিয়ে কুড়মি সমাজের মানুষের কর্মসম্পাদনার পরিচয় ফুটে উঠে। একটি লাহনাতে কথিত যে—

"মইনঅ মরবেটি,
ছউআ খেলাই দেতি।
রুপু মর ফুফু
ভাত লেগি দেতি।
কউআ সর বেটা,
হার জতি দেতা"।।

অর্থাৎ টিয়াপাখিকে ফুফু বা পিসিমার সঙ্গে রূপকার্থে যুক্ত হয়েছে ও কাউআ বা কাককে সন্তানরূপে ভাবা হয়েছে। মানুষের কাজকর্ম পাখিদের মাধ্যমে করানো হচ্ছে। মানুষ যেমন বাচ্চা খেলানোর সময় মুখে বিভিন্ন রকম মুখের শব্দ ভঙ্গিমার মাধ্যমে বাচ্চা শিশুর প্রক্ষোভগুলি বের করে একইভাবে পাখিদের শব্দের আকর্ষণের মাধ্যমে শিশুর অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

কুড়মি সমাজে জীবজন্তুর আচরণবাদের বহিঃপ্রকাশ: —

১। কাড়া চরার জন্য/জল খাওয়ার জন্য অঁয় অঁয় ডাক দেয়।

২। গরু দৈহিক মিলনের সময় হাম্বা হাম্বা শব্দ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডাক দিতে থাকে।

৩। গাই দুধ দোহার সময় হাম্বা হাম্বা ডাক দিতে থাকে ।

পক্ষীজাতীয় প্রাণীর আচরণবাদের বহিঃপ্রকাশ:—

১। মুরগী ডিম পাড়ার আগের মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে কর কর আওয়াজ করে ও নখ দিয়ে বিভিন্ন জায়গা দাগ কেটে ডিম পাড়ার পরিবেশ তৈরী করে।

২। ডিম পাড়ার পর মুরগী কট কট কটাস আওয়াজ করে।

৩। মুরগী বাচ্চা মাকে খোঁজার সময় চিঅক চিঅক শব্দ করে।

৪। হাঁস খাবার না পেলে প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করে কিন্তু খাবার পেলে আওয়াজের ধরণ অন্যরকম হয়।

৫। পায়রা যখন দলে বসে খাবার খায় তখন বকবকম করে মহানন্দে খাবার খায় ও ঘুরতে থাকে।

৬। গুঁড়ুর/কয়ের/তিতিরে খাঁচার মধ্যে থাকলে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে কিন্তু খাবার দিলে খাদক (উদ্দীপক) এর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

আচরণবাদ মনোবিজ্ঞানের জনক বি.ওয়াটশন (1879-1958) ও পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানরে জনক উইলহেলম উন্ড (1832,16 Aug.- 1920, 31 Aug.)। ওয়াটশন আচরমবাদকে শিশুর বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করেন। আবার বি.এফ, স্কিনার (1904,20 March- 1990,18 Aug.) ১৯৪৬ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Experimental Analysis of Behaviour' প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে Reinforcement ঘটান। ইভাব প্যাভলভ (1849, 14 Sep.-1936,27 Feb.) 'Clasical Conditioning' তত্ত্ব টি উদ্দীপ প্রতিক্রিয়া রে সাহায্য নিয়ে শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া(Conditioned Reflex) নীতি প্রয়োগ করেন। ই.এল.থর্নডাইক (1874,31 Aug.-1949, 09 Aug.) S-R Bond এর মাধ্যমে অনুসঙ্গ ধারণার (Association) উপর ভিত্তি করে সংযোজনবাদ তত্ত্ব (Theory of Connectionism) কুকুর, বিড়াল, মানুষের আচরণের মাধ্যমে প্রচেষ্টা ও ভুল তত্ত্ব (Trial and Error Theory) 'Animal Intellingence' জার্নালে প্রকাশ করেন। সুতরাং উপরোক্ত প্রাণীর আচরণবাদগুলি দেড়শো বছর বা একটু আগে হলেও কুড়মি সমাজের মানুষজন জীবজন্তু ও পাখির আচরণবাদ সম্পর্কে কয়েক হাজার হাজার বছর ধরে পরিচিত ও সচেতন ছিল যে কখন জীবজন্তু বা পাখিদের সঙ্গে কেমন ধরণের আচরণ করতে হবে।

(৮) কুড়মালি দৈনন্দিন কাজ ও শরীর বিজ্ঞান :-কুড়মালি সভ্যতা ও সংস্কৃতি কৃষি আধারিত। কুড়মি জাতি কৃষিকাজের পূজারী। সুতরাং তারাকে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে গেলে বিভিন্ন প্রকার শরীরচর্চার ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

সকালে 'ছড়া দেউআ' এর মাধ্যমে হাতের তালুও আঙ্গুলের ব্যায়াম হয়ে থাকে। 'গরু বের করা' কাজের মধ্য দিয়ে সকালে খালি পায়ে হেঁটে গোয়াল থেকে গরু বের করার সময় কাঁকর ও পাথর রাস্তা দিয়ে হাঁটা ফলে শরীরে রক্তসংবহনক্রিয়া ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া যথাযথ হয়ে থাকে। গরুর গোবর বিভিন্ন রকম চর্মরোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গোয়াল থেকে 'গোবর ফেলার' সময় নুয়ে গোবর তোলার সময় কোমরের ও হাতের আঙ্গুলের পেশীর সংবহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ও মাথায় ঝুড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার রক্ত সংবহন ক্রিয়া যথাযথ থাকে। 'গরুর দুধ দুহার' সময় বসার ফলে কোমরের ব্যায়াম ও দুধ বের করার সময় হাতের পেশী, আঙ্গুল, চোখের পেশী প্রভৃতির ক্রিয়া সঞ্চালন হয়। জমিতে 'হাল করার' সময় হাতের পেশী, হাতের আঙ্গুল, পায়ের পেশী, পায়ের আঙ্গুল, মুখের পেশী, চোয়াল, কানের পেশী, চোখের পেশী প্রভৃতির সঞ্চালন ঘটে। হাল করার সময় হাত পায়ে কাদা লাগলে শরীরের চর্মরোগ, শরীরে কোষের সক্রিয়তা, সজীবতা, উদ্দীপনা পরিবহন করা প্রভৃতি বজায় থাকে। 'ধান লাগানো' 'নিড়ান দেউআ' 'ধান কাটা' 'ধান ঝাড়া, 'ধান উড়া', 'মাচায় তোলা প্রভৃতি কাজে ঘাম নিঃসরণ, হাত , পা, মাথা, চোখ প্রভৃতির কাজ হয়ে থাকে। ধান লাগানোর সময় জল কাদা পায়ের তলার স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে ও কাজে প্রেরণা দান করে। এই সময় মেয়েরা 'ধান রপা' গিতে কাজ করার আনন্দ লাভ করে। ধান জমিতে আগাছা নিড়ানোর সময় জল কাদা লাগার ফলে শরীরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তরঙ্গ সঞ্চালন, ব্যাপ্তি, প্রসারণ প্রভৃতি যথাযথভাবে হয়ে থাকে। ধান ঝাড়া মেসিনে প্যাডেল করার ফলে পায়ের পেশীর সঞ্চালনে রক্তসংবহন ক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। উক্তকাজে শরীরে কয়েক কিলো ক্যালোরি শক্তির ব্যয় হয়ে থাকে।

(৯) কুড়মালি সংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতি খেরওয়াল গোষ্ঠীর সভ্যতা প্রভাবিত। কুড়মি জাতি প্রায় ছত্রিশ রকম জাতির সঙ্গে বসবাস করে। কোল, ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল, ওরাং, হো, মাহলি, প্রভৃতি খেরওয়াল গোষ্ঠীর সঙ্গে তেলি, তাঁবলি, তাঁতি, হাঁড়ি, মুচি, ডোম, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, প্রভৃতি হড়মিতান গোষ্ঠী তাদের সমাজব্যবস্থাকে পূর্ণতা দিতে সাহায্য করে। খেরওয়াল ও হিতমিতান গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্রব্যের লেনদেনে ফলে উভয়ের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি, ব্যঞ্জনা, ভাব প্রভৃতির বিনিময় ঘটে এবং শক্তভিতের উপর ভিত্তি করে এবং সুন্দর সামাজিক কাঠামো সহযোগে সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। কুড়মি জাতি যেমন তাদের জমি থেকে উৎপাদিত ধান, চাল, মুড়ি, পিঠা, প্রভৃতি খেরওয়াল ও হিতমিতান গোষ্ঠীকে সাহায্য করে তেমনি বিনিময়ে তারাও তাদের নিজস্ব বৃত্তির

কর্মসমূহ (সারভার বওয়া, চুল কাটা, তেল দেওয়া, কাপড় কাচা, কাপড় তৈরী করা, লোহার জিনিস পত্র তৈরী) সুচারুভাবে সম্পন্ন করে থাকে। ফলস্বরূপ, উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সামাজিক বন্ধন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কুড়মি সমাজের রীতি অনুযায়ী নতুন কুটুম ঘরে এলে তাঁকে 'জল ঘটি' দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো, বিদায়ের সময় বাড়িতে অতিরিক্ত শাকসব্জি উৎপাদিত হলে তা বিদায়বেলায় সঙ্গে দেওয়া, মেয়েরা বাপের ঘর থেকে শ্বশুর ঘরে এলে সঙ্গে 'পিঠা' সন্দেশ রূপে দেওয়া প্রচলন রয়েছে। উপেন্দ্রনাথ মাহাতর 'কুড়চি ফুল' বইয়ে পাঁতা নাচের গিতে কথিত আছে যে—

"সমাজে জনম দাদা
সমাজে মরণ রে
সমাজ হেকেই দাদা
সুরুজ সমান রে।"

গানের তাৎপর্য এই যে, সমাজ থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি ও সমাজের মধ্যে আমরা মৃত্যুবরণ করব। তাই রূপকার্থে সমাজকে সূর্যের মতো ভাস্বর ও বড় করে দেখানো হচ্ছে।

(১০) কুড়মালি অর্থনীতি ভারসাম্যে বিজ্ঞান :-কুড়মি জাতি চিরকালেই দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য লেনদেনে বিশ্বাসী। এরা কাজের সুবিধার জন্য 'পসরি প্রথা,' 'বেরহুন প্রথা' প্রচলন করেছে। একজন লোক অন্যলোকের বিপদে আপদে কৃষিকার্য ও আনুসাঙ্গিক কাজ করে দেবে ও একই ভাবে অন্যদিক থেকে পরোপকারী ব্যক্তি তাঁকে সমানভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আবার আর্থ সামাজিক সংকটের সময় আগে থেকে বেরহুন (দান আগে থেকে দেওয়া) দিয়ে রাখলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি দাতাকে যথাসময়ে তার কর্মের মাধ্যমে তাকে পরিষেবা দেন। একিভাবে বিহা ঘরের সময় আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপড়সি জিনিসপত্র দেয় ও ঘাট ঘরে বিভিন্ন ব্যক্তি চাল, চিড়া, মুড়ি, টাকাপয়সা, শাকসব্জি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেন। স্যার আইজাক নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারে—"প্রত্যেক ক্রিয়াই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"। অর্থনৈতিক লেনদেন যেমন ব্যক্তিকে সুদৃঢ় করে ও আত্মবিশ্বাস যোগান দেয় তেমনি একইভাবে উক্ত ব্যক্তি অন্তর থেকে মানবতাবোধের খাতিরে জিনিসপত্র লেনদেনের সঙ্গে ভক্তি, সহানুভূতি, অনুকম্পা, প্রভৃতি প্রদর্শন করে। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা যেমন একদিকে মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি সমাজকে ও সমাজের মানুষকে আর্থ সামাজিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

(১১) কুড়মালি সমাজব্যবস্থা ও পদার্থবিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের উপর প্রতি পদে পদে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজ্ঞান ছাড়া কুড়মালি সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা চলতে পারেনা; পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান কুড়মালি সংস্কৃতি ও সমাজব্যতিরেকে থাকতে পারেনা। যাইহোক, কুড়মালি সমাজব্যবস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়। কুড়মি সমাজের মানুষজন ঘরের লম্বা দড়ি (বরহই) ও গরু/ কাঁড়া বাঁধার দড়ি (পাঘা) তৈরীর সময় হাতের মাপের মাধ্যমে দড়ির দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় করত যা পদার্থবিজ্ঞানে 'স্কেলার রাশির' জলন্ত উদাহরণ বহন করে। ভর পরিমাপের জন্য কাঠের তৈরী দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে আসছে। ঢেলা (মাটির/পাথরের টুকরো) দিয়ে গাছে থেকে ফল পাড়ার মাধ্যমে গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। হাতের চেটো ঘষে তাপ উৎপন্ন করতে। সেখানে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং শক্তির রূপান্তর সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল। 'বাঁধে জল আটকানো' এর মধ্য দিয়ে শক্তির সংরক্ষণের প্রমান পাওয়া যায়। বাঁধের জলে স্থিতিশক্তি থাকে কিন্তু জল নিচে পড়ারসময় তা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এই গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ডায়নামো ঘুরিয়ে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। কুড়মি জাতি পদার্থের অবস্থান্তর অর্থাৎ তরলকে বাষ্পে পরিণত করা সম্পর্কেও জ্ঞান ছিল। দুধের সর, মাখন তাপ প্রয়োগ করলে সান্দ্র অবস্থায় আসে যা পদার্থের কঠিনও নয়; আবার তরলও নয় অর্থাৎ গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক নির্ণয় করতে জানত। মাটির কলসির গায়ে যে ছিদ্র থাকে তা দিয়ে কুঁজোর বাইরে এসে লীনতাপ সংগ্রহ করে ও বাষ্পে পরিণত হয়। এজন্য কুঁজোর ভিতরের জল ঠান্ডা থাকে। সুতররাং 'লীনতাপ' সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। বাটুলে গুলি ছোঁড়া, কাঁড়বাশে (তীর ধনুক) কাঁড় ছোঁড়া, বেল /কাপড়ের বলে লাথি মারা প্রভৃতি কাজে বলের প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং তাদের নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র বল সম্পর্কে ধারণা ছিল। কুড়মি জাতি দৈনন্দিন জীবনে কাজের জন্য শাবল, কোদাল, গাঁতি প্রভৃতি ব্যবহার করে যা প্রথম শ্রেণীর লিভারের কাজ করে। এই লিভারে আলম্বের দিকে ভার অন্যদিকে বল প্রয়োগ করা হয়। এখানে বলবাহু রোধবাহুর চেয়ে বড় ও যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর বেশি অর্থাৎ অল্প বল প্রয়োগ করে বেশী ভার তোলা যায়। কোন জায়গায় ব্যাথা লাগলে জলের সেঁক দেওয়ার প্রচলন আছে কারণ জলকে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে বেশী তাপ লাগে ও ঠান্ডা হতেও দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে। বিষয়টির মর্মার্থ এই যে, জলের আপেক্ষিক তাপ 462 J/kgk । ধানসিদ্ধ কড়াইএ বা রান্নার হাঁড়িতে ভুসাকালি থাকে কিন্তু জলে ডোবালে তা চকচকে দেখায় কারণ ওর গায়ে বাতাসের পাতলা স্তর লেগে থাকে। আলোক রশ্মি ঘনতর মাধ্যম জল থেকে বায়ুমাধ্যমে প্রতিসৃত হওয়ার সময় যে রশ্মিগুলি সঙ্কট কোণের চেয়ে বেশী কোণ করে গিয়ে ঐ জল ও বায়ুস্তরের বিভেদতলের

উপর পড়ে, তাই 'অভ্যন্তরীন পূর্ণ প্রতিফলন' ঘটে। সুতরাং আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাদের সম্যক ধারণা ছিল। পরমাণুর কক্ষপথে যেমন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে ইলেকট্রনগুলি আবর্তন করছে তেমনি কুড়মি জাতিকে কেন্দ্র করে হিতমিতান গোষ্ঠীসমূহ (তেলি, তাম্বলি, তাঁতি, হাঁড়ি, মুচি, ডোম, কামার, কুমার, ধোপা) জীবন ধারণ করছে।

(১২) কুড়মালি কৃষিকাজ ভূ-বিজ্ঞান :-কুড়মালি ভাষায় কৃষিকাজ সম্পর্কিত একটি আহনা প্রচলিত যে—

'সোল চাসেঁ মুলা, তাকর অদ্ধেক তুলা
তাকর অদ্ধেক ধান, বিনা চাসে পান'।

উপরের আহনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুড়মি জাতি কৃষিকাজে মাটির প্রকৃতির সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান বিদ্যমান। এইকারণেই তারা জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতিস্থাপন করে কৃষিকার্য করে আসছে। জল কৃষিজ ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এক অপরিহার্য উপাদান। একটি জনপ্রিয় টুসু গিতে আছে যে—

'পানিঞ হেলিস পানিঞ খেলিস পানিঞ তর কন আহউ
মনেক ভিতর ভাভি দেখেঁ পানিঞ সসুর ঘার আহউ"।

শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য জল অত্যাবশ্যক। জল ছাড়া উদ্ভিদ বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। তাই জলকে শ্বশুর ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কুড়মি জাতি ভূ-গর্ভের জলকে ধরে রেখে কৃষিকার্যে সরবরাহ করার জন্য ইঁদারা, কুঁয়া, মাদিগাড়হা, বাঁধ, পখইর, জলহরি, ডভা প্রভৃতি তৈরী করতো। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলকে ধরে রাখার জন্য 'চেকড্যাম' তৈরীর ব্যবস্থা করছে ও 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। আধুনিক যুগে অগভীর নলকূপ (মিনি, সাবমার্সাল পাম্প) মাটির স্তরের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে তাই পৃথিবীকে রক্ষার জন্য এই ধরণের জলপ্রকল্প বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

(১৩) কুড়মালি ব্যবস্থায় গণতন্ত্র রক্ষা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান :- কুড়মালি ভাষায় প্রচলিত আহনাতে কথিত যে—

"ঢঁড় কুড়মি একাশি, পানি জঁখে বসতি।"

কুড়মি জাতি একাশি গোষ্ঠী, বংশ ও ঝাড়ের একটি বিশাল মহাসংঘ (Confedaracy) বিদ্যমান। একেবারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র পরিচালিত। কুড়মি জাতি বংশ পরম্পরা আইন (Customary Rule) যা সমাজকে শৃঙ্খলিতভাবে ও সুন্দর সামাজিক শাসনব্যবস্থায় (Social Administration System) গেঁথে রেখেছে। কুড়মালি সমাজ

শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের রূপ নিম্নলিখিত:-

দেশ মড়ল (২৫ টি পরগণার প্রধান)

পরগণইত (১২ টি গ্রামের প্রধান)

চাঠা/মুইখ্যা (৫টি গ্রামের প্রধান)

মাহাত/মড়ল (গ্রাম প্রধান)

গ্রামবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি 'মাহাত' বা 'মড়ল' গ্রাম প্রধানের সঙ্গে ৫টি গ্রামের প্রধানের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি, 'চাঠা বা 'মুইখ্যা'। পাঁচটি গ্রামের সঙ্গে আরোও বেশী পরিমানে অর্থাৎ ১২ টি গ্রামের প্রধানের সুসম্পর্ক স্থাপন নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি 'পরগনইত' বলে খ্যাত। বারোটি গ্রামের প্রধানের সঙ্গে ব্যাপকতর অর্থে এলাকায় পরিচিতির জন্য ২৫ টি পরগনার নির্বাচিত প্রতিনিধি 'দেশমড়ল' নামে পরিচিত। এটি সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি হলেও বর্তমান রাজ্যগুলিতে এত সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিগত শাসনপদ্ধতি না হলেও গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলা পরিষদ ভাগ আছে যা রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত। দুটির তফাৎ একটি প্রথাগত সামাজিক পদ্ধতি ও অন্যটি সাংবিধানিক গণতন্ত্র আইন। কিন্তু অনেক প্রথাগত আইন (Customary Rules) গণতন্ত্রের সঙ্গে (Democratic Rules) সংযুক্ত।

(১৪) কুড়মালি সমাজ ব্যবস্থা ও মানবীয়বিজ্ঞান :-কুড়মি সমাজ সমাজতান্ত্রিক। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের অভ্যন্তরীন মানুষদের দ্বারা কার্য সম্পাদিত হয় ও হিতমিতান গোষ্ঠীর দ্বারা পরোক্ষভাবে সামাজিক কাজকর্ম হয়ে থাকে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সমাপনের জন্য 'লাইআ' (পূজারী) ও পটলই (গোহত্যা জনিত ক্রিয়াকলাপে দেশমড়লের সাহায্যকারী) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনিক কাজে সংবাদ পরিবেশনের জন্য 'গড়াইত' ও গ্রাম পাহারাদার হিসেবে 'টহলুদার' কাজ করে। এক 'চাঁচর গিতে' কুড়মি জাতির হিতমিতান গোষ্ঠী ডোমের বৃত্তির কথা জানা যায় যে সেও গভীরভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত।

"কাহাল কাহাল কাহাল
ঢাকঅ পিটইতে ডমা মরল রে।
ঢাক ঢোল বহি বহি জাই।।
ভালা বাপেক বেটি হেবে গে ডমিনি
টুপা বেচি খাবে ধারা মাড়।।"

আবার, তাঁতি তাঁর বৃত্তির সঙ্গে কেমনভাবে যুক্ত ও কিভাবে দিনাতিপাত করে তা 'চাঁচর গিতে' জানা যায়।—

“কাহাল কাহাল কাহাল
লুগা বুনউতে তাঁতি মরল রে।
লুগা ফাটা বহি বহি জাই।।
ভালা বাপেক বেটি হেবে গে তাঁতিনি
লুগা বেচি খাবে ধারা মাড়।”

কুড়মালি ভাষা বা শব্দ প্রমান করে যে, উক্ত জাতিসমূহ কুড়মিদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গভীরভাবে যুক্ত। ‘জাউআ গিতে’ জলহা, তাঁতি ও মুচিদের সঙ্গে কুড়মি জাতির সম্পর্কে পাওয়া যায়:-

“ ভেল রে ভিনসইরা রে মুরুগাঞ দেলঅ বাগঁ হো
অগ, জানে সিঁতে, অগঁঅ ভিজি জাই।
কাঁহা হামে পাউঅব, ডেড় পগড়িআ
অগ, কাঁহা পাউঅ, দহরি চাদর।
কাঁহা হামে পাউঅব রেসেমেক জুতা
অগ, বনে বনে খেলহ মইলান।
জলহা ঘারে পাউঅব, ডেড় পগড়িয়া
অগ, তাঁতি ঘারে দহরি চাদর।
মুচি ঘারে পাউঅব, রেসেমেক জুতা
অগ, রনে বনে, খেলহ মইলান।

কিআ বেচি লেউঅব, ডেড় পগড়িআ
অগ, কিআ বেচি দহরি চাদর।
কিআ বেচি লেউঅব রেসেমমেক জুতা
অগ, রনে বনে, খেলহ মইলান।
দুধা বেচি লেউঅব ডেড় পগড়িআ
অগ, দহি বেচি, দহরি চাদর।
ঘিআ বেচি লেউঅব, রেসেমেক জুতা
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান।

সুতরাং কুড়মি জাতির নিত্যপ্রয়োজন সামগ্রী সরবরাহ করত হিতমিতান গোষ্ঠী ও কুড়মি জাতির সঙ্গে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, হাসি,কান্না প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি ভাগ করে নিত।

(১৫) কুড়মালি লোকাচারে কৃষিকাজ ও কৃষিবিজ্ঞান :- কৃষিকাজ সম্পর্কে বলতে গেলে একটি বহুল প্রচলিত আহনায় বলা হয় যে—

"পানি পড়লে গাইদে
ধান লাগাউবঁ বাইদে"।

বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মি জাতি তাদের জমিতে ধান লাগানোর তাকবতর করতে থাকে। এরা কৃষিকাজের দক্ষ কারিগর। খুব শৈশবকাল থেকে বংশ পরম্পরা এরা কৃষিজ ফসল উৎপাদ করে আসছে। চাযবাসে ভালো দক্ষ বলে তাদেরকে বাংলাদেশ, আসাম প্রভৃতি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুড়মি জাতির মাটি পরীক্ষা করে বাতালি (বীজ ফেলার উপযুক্ত পরিবেশ) নির্ণয় করার জ্ঞান রয়েছে। সার ডোবাতে জৈবসার তৈরীর প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেনের আধিক্য বজায়,অম্লতার মাত্রার ভারসাম্য রক্ষা, মাটির নমনীয়তা রক্ষা, মাটির ছিদ্রে বায়ুচলাচল প্রভৃতি কাজ বজায় রাখে। জমিতে পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উনুনের পাঁশ ব্যবহার করে। মাটিকে শোধন করার জন্য নিম খৈল ব্যবহার করে। বীজকে জল থেকে ছেঁকে ভিজা খড়ের উপর বস্তা ঢাকা দিয়ে নির্দিষ্ট তাপ, আলো, উষ্ণতা ও বাতাসের সহায়তায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়। জাউআ প্রণালীর মাধ্যমে গান শুনিয়ে শুনিয়ে ফসলের বৃদ্ধিও বিকাশ সাধন করে।

(১৬) কুড়মালি কৃষিব্যবস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক ভূগোল :- কুড়মালি ভাষায় একটি আহনার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ভূগোলের ইঙ্গিতি পাওয়া যায়—

"মকরেঁ পানিঁ টিকরেঁ ধান"

কুড়মি সমাজে প্রচলিত কথা আছে যে, মকর সংক্রান্তিতে বৃষ্টিপাত হলে সেবছর কৃষিকাজের অসুবিধা হয় না। কুড়মি জাতির অনুমান ক্ষমতা প্রখর ছিল। কুড়মি জাতির মানুষজন দেখেছিল যে, শীতের সময় সূর্য ক্রমশ দক্ষিণ দিকে হেলে পড়ছে ও বৃক্ষাদির ছায়া উত্তর দিকে লম্বমান হচ্ছে। তারা আরোও দেখেছিল যে, পৃথিবী যখন মকর রাশিতে প্রবেশ করছে তখন সে দক্ষিণামুখী যাচ্ছে না ধীরে ধীরে উত্তরদিকে সরে আসছে। একটি পুষ্যা নক্ষত্রে পৌষ সংক্রান্ত/মকর সংক্রান্তি/ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। উত্তরায়নের সময়কাল ১লা মাঘ মাস থেকে আসাঢ় সংক্রান্তি পর্যন্ত এবং দক্ষিণায়ণের সময়কাল ১লা শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত সময়কাল। উত্তরায়ন কাল কৃষিকাজের প্রস্তুতিমূলক কার্য হয়ে থাকে ও দক্ষিনায়ন কাল কৃষিজ ফসলের বিকাশের সময়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বর্ষাকাল ও শীতকালের আগমন ঘটত। সেজন্য

কুড়মি জাতি ধানরোপনের চারা তৈরীর ব্যাপারে বীজ বপনের তাগিদ অনুভব করেছিল। বর্ষার আগমন সুনিশ্চিত করতে কুড়মি জাতির মানুষজন প্রথমে মধ্যগগনে 'রোহিনী' নক্ষত্রের অবস্থান চিহ্নিত করে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখকে 'রোহিন' পরব হিসেবে পরিগণিত করে নক্ষত্র, বার, তিথি প্রভৃতির ভিত্তিতে বীজ বপনের দিনটি ধার্য করেছিল ও সেই সঙ্গে আরোও ২৬ নক্ষত্র আবিষ্কার করেছিল। সূর্যের উত্তর আয়নের সময় পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয় ৫°-১০° উত্তরে সরে আসে ও বায়ুচাপ বলয়ের পরিবর্তনের ফলে নিয়তবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। বায়ু চাপ বলয়গুলি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বলয়গুলিরও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং কুড়মি জাতির মানুষজন 'রোহিন' পরবের দিনকে লক্ষ্য রেখে নিয়তবায়ুর আগমন দেখে বীজতলা ফেলত যে প্রকার আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষিকাজ আরম্ভ হতে চলেছে। এই ধারা বর্তমান সময়ে অব্যাহত আছে কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে প্রকৃতির ঋতুর ও আবহাওয়ার বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং কুড়মি জাতির মানুষের বায়ুরচাপ বলয়ের সম্বন্ধে ধারণা ও কোন্ বায়ুর আগমনকাল কখন সে সম্পর্কে সুস্পষ্টত ধারণা ছিল। আষাঢ় মাসে কৃষিকাজের সময় উত্তর আয়ন সময়কালে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের দিকে হেলে থাকে ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থাকে। এর ফলে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বেশীর কারণে উত্তাপ বেশী, পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগ বেশী। এসময় উত্তর গোলার্ধে দিন ১৪ ঘন্টা ও রাত ঘন্টা হয় ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তার বিপরীত অবস্থান। ৪ ঠা জুলাই এর সময়কালকে অপসূর অবস্থান বলে। এই অবস্থানে সূর্য থেকে দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিমি। এই সময় সূর্যকে অনেকটা বড় দেখতে লাগে। পৌষ মাসে কৃষিজ ফসল তোলার সময় দক্ষিণ আয়ন সময়কালে দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয় ও উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরবর্তী অবস্থানে অবস্থিত। ফলে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল চলতে থাকে। ফলে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা কম হওয়ার জন্য উত্তাপ কম হয়। এইসময় পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগ কম। উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত বড় হয় ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। দিন ১০ ঘন্টা বা তার কিছুটা কম ও রাত ১৪ ঘন্টা বা তার বেশী হয়ে থাকে। ৩ রা জানুয়ারী সময়কালকে অনুসূর অবস্থান বলে। এই অবস্থানে সূর্য থেকে দূরত্ব প্রায় ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিমি। এসময় সূর্যকে অনেকটা ছোট দেখায়। এই সময় কুড়মি জাতির মানুষদের খাদ্যাভ্যাস একটু অন্য রকমের দেখা যায়। তারা উঁধি পিঠা (পুর পিঠা), লাউ পিঠা, শিম পিঠা, কপি পিঠা প্রভৃতি খেতে থাকে।

(১৭) কুড়মালি সংস্কৃতি ও জীবনবিজ্ঞান :-কুড়মালিতে প্রচলিত আহনাতে বলা হয়

যে—

"মানুস বুঢ়াত আঁতে
গরু বুঢ়াত দাঁতে"।

মানুষের শরীরে শিরা ধমনীর অবয়ব দেখলে বয়স অনুমান করায় যায় ও গরুর বয়স সিং-এর দাগ দেখে নির্ণয় করা হয়। সুতরাং জীবের বৃদ্ধি বিকাশের কালের সঙ্গে কুড়মালি সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুড়মি জাতি সাতপুরুষ ধরে বংশ পরম্পরাভাবে জিনতত্ত্ব বহন করে। এই সাতপুরুষকে 'সাতসমুদ্র' বা কাব্যিক ছন্দে 'ক-সে-লা-থো-সা-সু-সি' বলে পরিগণিত করা হতে পারে। সেগুলি যথাক্রমে ককসিজিয়ান, সেকক্রাল, লাম্বার, থোরাসিক, সারভাইক্যাল, সুষুম্নাশীর্ষক ও C.S.F. প্রত্যেকটি সমুদ্রে সুনির্দিষ্ট নার্ভের জোড়া আছে। নিম্নে সাতটি সমুদ্র ও নার্ভ উল্লিখিত হল:—

১) কক্সিজিয়ান সমুদ্র—১ জোড়া নার্ভ।
২) সেকক্রাল সমুদ্র— ৫ জোড়া নার্ভ।
৩) লম্বার সমুদ্র— ৫ জোড়া নার্ভ।
৪) থোরাসিক সমুদ্র— ১২ জোড়া নার্ভ।
৫) সারভাইক্যাল সমুদ্র— ৮ জোড়া নার্ভ।
৬) সুষুম্নাশীর্ষক সমুদ্র— ৮ জোড়া নার্ভ।
৭) C.S.F. সমুদ্র— ৮ জোড়া নার্ভ।

মোট ৪৩ জোড়া নার্ভ

প্রত্যেকটি স্নায়ুর অবস্থান আছে। কক্সিজিয়ান পুচ্ছদেশীয় স্নায়ু, সেকক্রাল শ্রেণী দেশীয় স্নায়ু, লাম্বার কটিদেশীয় স্নায়ু, থোরাসিক বক্ষদেশীয় স্নায়ু, সারভাইক্যাল গীবাদেশীয় স্নায়ু, সুষুম্নাশীর্ষক স্নায়ু সুষুম্নাদেশে, C.S.F. মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকান্ডের অভ্যন্তরে। গুষ্টি ও গুষ্টির দাগ বিচার করে কুড়মি জাতি পাত্র-পাত্রীর বিবাহ স্থির করে। বিবাহে গুষ্টি আলাদা হতে হবে। গুষ্টি একই হলে তাকে 'বঁশে বঁশে বিহা' বলে এক্ষেত্রে গুষ্টির দাগ দেখে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, তখনকার দিনে রক্তপরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু কুড়মি জাতি উক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বিপরীত গুষ্টির উপর ভিত্তি করে হবু পাত্র-পাত্রীর রোগের সম্ভাব্যতা ও বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে জোর দিত। বিবাহের সময় পাত্র ঘর থেকে মাটির হাঁড়িতে 'চ্যাং মাছ' পাত্রীর ঘরে দেওয়ার রীতি বিদ্যমান। গুআটিকার সময় পাত্রী পাত্রকে তা ফোঁটা দেয়। বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, দুটি বিপরীতধর্মী লিঙ্গের মেলবন্ধন। মাছ খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রজনন

তাড়াতাড়ি ঘটে। মাছকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে কুড়মি জাতির একটাই উদ্দেশ্য যে, তাদেরও মাছের মতো যেন বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আবার তখনকার দিনে বিনা রক্ত পরীক্ষায় মহিলা গর্ভবতী কিনা 'বিহা গিতে' তার প্রমান বহন করে—

"জেহ জে দিনে বেটা
তর সিরজন গো,
মাছঅ মছরি না সহায়।"

জেহ জে দিনে বেটা
তর জনম গো,
সেহ দিনে ইজতিআ আঁধরিআ রাইত।

জেহ জে দিনে বেটা
তর জে বিহা গো,
সেহ দিনে সনাকেরি রাইত।"

মহিলারা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁর মুখে জল উঠে, বমি বমি ভাব অনুভূত হয় ও সর্বোপরি পেটে কোন খাদ্য দ্রব্য থাকে না তখন বোঝা যায় যে, সে গর্ভবতী হতে চলেছে।

(১৮) কুড়মালি ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষায় গণিত :- কুড়মি জাতির নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। ঐতিহাসিক উপাদানগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। বিজ্ঞানের মাধ্যমে যুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ সহযোগে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা হয়ে থাকে। কুড়মালি, ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষায় গণিতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান তুলে ধরতে ব্যবহৃত হয়। কুড়মি জাতি কৃষিজীবি। কৃষিজমি পরিমাপের ক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ প্রভৃতি আকৃতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে দিরখার চিহ্ন □ চৌকাঠের চিহ্ন △ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কোণ পরিমাপ করা হয়। পাখুরা বা বাইস কোণের প্রতীক বহন করে। এছাড়া বাঁদনা পরবে 'চউখপুরা' চিত্র তার সুনির্দিষ্ট পরিমাপ ও পদ্ধতি রয়েছে। এটি এক ধরণের জ্যামিতিক চিত্র। ঘরের ভুলগুড়ি 'O' ঢেরা '×' বিভিন্ন গোত্রের দাগ 'i̇L', —≠, ||, #, —,×,= প্রভৃতি বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নের প্রতীক বহন করে।

(১৯) কুড়মালি সংস্কৃতি ও ভূ-রসায়ণবিদ্যা :-কুড়মালি ভাষায় মাটি সম্পর্কিত এক আহনা আছে যে—

"মুলাক মাটি ধূলা
আলুক মাটি তুলা"।

বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, মুলা ও আলুচাষের জন্য ভালো চাষআবাদ করত বলে ভূ-রসায়ণবিদ্যা সম্পর্কে তাদের অগাধ জ্ঞান ছিল। তারা জৈষ্ঠ্য মাসের ১৩ তারিখে রহিন পরবের পর সাতটা 'ডা' মেনে চলত। এই সাত দিনে সূর্যের রশ্মি ভূমিতে পড়ার ফলে তার সাত রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত ও ঐ সময় বীজ ফেলা নিষিদ্ধ ছিল। সেগুলি— 'আমডা', 'নিমডা', 'দাঁতগিজড়া', 'হাইভাত', 'কুহুভাত', 'সুকমইনা', 'হাইসুইনা'। তারপর তারা তিনদিন 'কেতকি বতর' পালন করত। 'মাগন' 'জাচন' ও 'পাউঅন' সেগুলি বীজফেলার উপযুক্ত ছিল। কুড়মি জাতির মানুষজন রজঃসলা, আমাবতী প্রভৃতি দিনগুলোতে লাঙ্গল করে না। সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি মৃত্তিকার উপর পড়ে ক্ষতিকারক করতে পারে। এছাড়া বাঁদনা পরবে হালে তেল দেওয়ার পর লাঙ্গল করেনা।

(২০) বিশ্ব উষ্ণায়নে কুড়মালি সংস্কৃতি ও উদ্ভিদবিজ্ঞান :- কুড়মালি ভাষায় এক সুন্দর জানকহনি আছে যে—

"মাঁঞ ঝাঁপড়ি বেটি সুঁদরি"

কথাটির অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণ এই যে, 'শালুক' ফুল যা মাটির নিচে থাকে তাকে মা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ও 'ফুল'কে বেটি হিসেবে ধরা হয়েছে। আবার আর একটি জানকহনিতে বলা আছে যে—

"টুপটুপানি টুপানি
মুড়ে কাহে গিরিস
হেঁকা রে পেঁকা
রাইতে কাহে ঘুরিস"।

জানকহনির উত্তর 'মহুল' ও 'সাপ'। মহুল যখন পড়ে তখন মাথার উপর টুপ করে পড়ে ও সাপ রাত্রিতে হেঁকে পেঁকে ভাবে ঘোরাফেরা করে। সুতরাং কুড়মি জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে শালুক, মহুল গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শালুক ফুল বিবাহ ঘরের লগ্ন ধরাতে ও গরইআ পূজার সময়ও শালুক ফুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মড়ুআ থানে শাল ও মহুল ডাল ব্যবহার করা হয়। কাঁকনা বাঁধার সময় পাত্রীর হাতে মহুল পাতা ছোট করে বাঁধা হয়ে থাকে। কুড়মি জাতি দেবজ্ঞানে গরাম থানে শাল গাছে, মহুল গাছ, শবদাহের পর অশ্বত্থ গাছকে আলিঙ্গন করা, করম পরবে করম ডালকে পূজা করা, করমে পান্নার সময় ধান গাছি পূজা করা, জিতিআ পরবে বংশবৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে আখগাছকে পূজা করা, শিবপূজায় বেলফুল, আকন্দ ফুল, কলিকা ফুল ব্যবহার করে, সারহুলে

শাল ফুল, বাঁদনা পরবে পাইনা লতা, হালে ধানের শিষের মউড় ব্যবহার করে, ঘাট কামানের সময় কলা পাতায় বসে, শাল পাতা/পলাশ পাতের খালাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সিঁদুর, আতপ চাল, দূর্বা ঘাস, ঘি প্রভৃতি রাখতে ব্যবহৃত হয়। কাঁচিদুআরি সময় সহরই ঘাস, মাড়রা প্রভৃতি ব্যবহার করে। বিঘা করে ও গরু চুমাতে ধান ও দূর্বা ঘাস ব্যবহার হয়ে থাকে। জিলহুর/জিহুড় পরবে কেঁদ ডাল, ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কুড়মি জাতির প্রায় প্রত্যেক পরবে উদ্ভিদকে সম্মান জানিয়ে পূজা করার রীতি বহন করে আসছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে সেখানে গাছপালা, ফুল, ফল নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে কিন্তু কুড়মি জাতি অবলীলায় বিভিন্ন গাছ, ফুল, ফলকে সংস্কৃতির মাধ্যমে পূজা করে তার অস্তিত্ব ধরে রেখেছে ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের সঙ্গে এক সুন্দর ও সুনিপুন মেলবন্ধন স্থাপন করেছে। তারা কোন্ সময়ও কোন্ পরবে কি গাছ, ফুল, পাতা ব্যবহার করতে হবে তা সম্পর্কে সমীচীন ধারণা ছিল। গাছ গাছড়ার সঙ্গে নিবিড় টানের জন্য তাদের নাম অনুসারে গ্রামের পত্তন করেছে। কেঁন্দডাঙ্গা, কেঁন্দকানালি, মহুলবনি, চনলাডাঙ্গা, খড়ইকাশুড়ি, খড়ইকা, ভেলাইডাঙ্গা, ধানশোল, পিংবনি, পলাশবনি, পলাশডি, পিয়ারশোল, আশনবনি, কুড়চিডি, কুড়চিবনি, জামবনি, বহড়ামুড়ি, মহুলঘুটা, বহড়াগড়া, ধবনি, ধবেড়া, কদমপুর, কুলগোড়া, কুলটাঁড়, অর্জুনজোড়া, ধবনি, ধগাজড়া, বাঁশবেড়া, বাঁশগড় প্রভৃতি গাছ গাছড়ার নামে গ্রামের নামকরণ তা জলন্ত উদ্ভিদবিজ্ঞানের নমুনা বহন করে।

(২১) কুড়মালি সংস্কৃতি ও পুষ্টিবিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতিতে জানকহনিতে প্রচলিত যে—

"একটা বুঢ়িক গটা গাত ফুসড়ি"

জানকহনির উত্তরটি হবে 'কাঁঠাল'। কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিভিন্ন পরবে বিভিন্ন রকমের ফলের ব্যবহার হয়ে থাকে যা খেলে শরীরের পুষ্টি, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও শক্তিযোগান প্রভৃতি হয়ে থাকে। ফলের মধ্যে শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামি-এ,বি, সি বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক উপাদান থাকে। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য ৮০-১০০ গ্রাম, গর্ভধারিনী ও স্তন্যদায়িনী মাতাদের জন্য ১৫০-২০০ গ্রাম, ৭-৮ বছরের শিশুদের জন্য ৮০-১০০ গ্রাম, ৯-১০ বছরের শিশুর জন্য ১৫০-২০০ গ্রাম, ১১-১২ বছরের শিশু ও কিশোর কিশোরীদের জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম ফল থাকা প্রয়োজন। কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিবাহের পর নবাগত বধূর ব্যাভার দেওয়ার সময় আম, কাঁঠাল, আঙ্গুর, আপেল, লেবু প্রভৃতি ফল বধূর শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয় ও তারা পাড়া প্রতিবেশীদের বিতরণ করে। সুতরাং পুষ্টিগত ফল সবাই ভাগ করে খাওয়ার প্রবণতা আছে। আর 'সধৌড়ি দেউআর' সময় আপেল,

লেবু, আঙ্গুর ও ঐ সময়ের বাপের ঘর থেকে বিভিন্ন ফল দেওয়া হয় যাতে প্রসূতির পুষ্টির অভাব ও কোন রোগ অসুখ না হয়। করম পরবে বাচ্চাদের পান্নার সময় ডালের সঙ্গে ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, পুই প্রভৃতি দেওয়া হয় যাতে উপবাসকারীর কোন পুষ্টিমূল্য, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের অভাব না দেখা দেয়। একই ভাবে জিতিআ পরবে পান্নার সময় ছোলা, মটর, মুগ, শশা প্রভৃতি ব্যবহার করে যাতে পুষ্টির ভারসাম্য, ক্ষয়পূরণ প্রভৃতি বজায় থাকে। বাঁদনা পরবে গুড়ের পিঠা, ডিম পিঠা, 'গরইআ' পূজার জন্য ঘিয়ের পিঠা করা হয়। কাড়ার দিকের পিঠা ছেলেদের খাওয়ার রীতি আছে। মকর পরবে শিম পিঠা, লাউ পিঠা, উঁধি পিঠা (তিলের পুর, ছাঁচির পুর ও নারকেলের পুর), মাংসের পিঠা প্রভৃতি কুড়মি জাতির মানুষ তৈরী করে। সুতরাং কখন কোন ফল খেতে হবে বা কোন্ পিঠা কোন্ সময় তৈরী করতে হবে এবং তা শরীরের স্বাস্থ্যের কোনদিকে কাজে লাগবে তা কুড়মি সমাজের মানুষ পুষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কে বহু বছর আগের থেকে ওয়াকিবহাল হয়ে আসছে।

(২২) কুড়মালি সংস্কৃতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান :-কুড়মালি ভাষায় এক জানকহনি আছে যে—

"ফুল ফুটলাহেইক তুড়ইআ নাই
মড়ি গিরলাহেইক কাঁদইআ নাই
বিছনা পাতলাহেইক সুতইআ নাই"।

জানকহনির উত্তর হবে- 'তারা', 'চাঁদ' ও 'আকাশ'। ফুল মৃতদেহ ও বিছানাকে যথাক্রমে তারা, চাঁদ ও আকাশের সঙ্গে রূপক হিসেবে ভাবা হয়েছে। আবার, আর এক জানকহনিতে বলা আছে যে—"আকাশ গুড়গুড় পাখরঘাট, সাতশ ডাইরে দুইটা পাত" উত্তর হবে-মেঘ হাড়হিড়ানি, হুল পানি, তারা (চাঁদ ও সুরজ)। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুড়মি জাতির অতিপ্রাচীনকাল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান ছিলও তারা চাঁদ, সূর্য, আকাশ, তারা প্রভৃতি চিহ্নিত করতে পারতেন। ঘড়ি আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে কুড়মি জাতি সূর্যরশ্মির পতিত প্রতিচ্ছবির ভিত্তিতে সময় গণনা করতেন। সকাল, দুপ্রহর, বিকাল, সন্ধ্যা হিসেবে ভাগ করে সময় নির্ণয় করতেন। দিনের উপর ভিত্তি করে তারা মাস হিসাব করতে জানতেন। একটি 'টুসু গিতে' কথিত আছে যে—

"তিরিস দিন রাখলিঅউ টুসু তিরিসটা ফুল দেইএগউ
মকর হেলউ বাদি টুসু আর রাখে লারিঅউ গউ"।

কুড়মালি সংস্কৃতির হিসাব অনুযায়ী অগ্রহায়ন সংক্রান্তি থেকে বাঁউড়ির দিন (সূর্যের বামপার্শ্বে পৃথিবীর পরিক্রমন) পর্যন্ত তিরিস দিন ধরা হয়েছে। যৌবনবতী নারী সাতাশ দিন অন্তর ঋতুস্নান করে। ঋতু স্নানের মেয়াদ তিনদিন। সুতরাং কুড়মালি সংস্কৃতিতে

মাসের হিসাব কত পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমন গতির প্রমান পাওয়া যায় একটি প্রখ্যাত টুসু গিতে—

"আউআ রে ঘুনঘুইনা মাছি দখখিন বাটেক হাওআঁই,
উড়াউলেক সনাক পালখি লেই গেলেক টুসুকে।
টুসু লেগলে ভালই করলে রাখবেসিক টুসুকে যতনে,
হামরাক টুসু ছুটু ছউআ সসুর ঘারেক কিনা জানেই।"

পৃথিবীকে 'ঘুনঘুইনা মাছির' সঙ্গে তুলনা করে বামদিক থেকে ডানদিকে সূর্যের চারিদিকে তার পরিক্রমন গতিকে বোঝানো হয়েছে। জলকে টুসুর শ্বশুর ঘরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জল ছাড়া সে নতুন ভাবে জীবন পায়না বা প্রাণশক্তি জাগে না। কুড়মি জাতি ছয় মাসকে অয়ন হিসেবে চিহ্নিত করেও সূর্যরশ্মির পতন কোণকে মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত উত্তরণমুখীর জন্য 'উত্তরায়ণ' ধরে ও শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণমুখীর জন্য 'দক্ষিণায়ন' ধরে বছর হিসাব করতেন। সূর্যরশ্মির পতণকোণের উপর তাদের গভীর জ্ঞান, ধারণা ও প্রজ্ঞা ছিল। তারা দিন, পক্ষ, মাস, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী, চতুর্দশী, সংক্রান্তী প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ ধারণা ছিল। একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি সহজে অনুমেয় যে, কুড়মি জাতির ক্যালেন্ডার সুনির্দিষ্ট তিথি ও চাঁদের সংক্রান্তি, পক্ষকাল হিসেব করে প্রত্যেক বছর সুনির্দিষ্ট সময় ধরে কুড়মালি সংস্কার সংস্কৃতিগুলি হাজার হাজার বছর পালিত হয়ে আসছে। একটি 'জাউআ গিত' এর সাহায্যে কুড়মি জাতির ছয় মাসে বছরের ধারণা পাওয়া যায়—

"বাপে মরঅ বিহা দেল সাত সমুনদর পার
অগ সমুনদর ভরলঅ ছঅ মাস।
জাউআ জাউআ ডালি উগলই রম ডালি
অগ কহরে ডালি দুখা সুখ বাত।
কিআ কহব ভাইরে দুখাসুখ বাত
অগ, মাঞেক খভর, মাঞ মরলঅ ছইঅ মাস
পাসে আসেঁ রহে তেলঁ রকা বানার পাউঅই তেলঁ
অগ, কিআ গঅ বিধি, কিআ বিধি লিখল কপারে।"

উদ্দিষ্ট জাউআ গিতে 'ছয় মাসের' কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর একটি 'বিহা গিতে' ছয় মাসের প্রমাণ পাওয়া যায়—

"বারঅ বছরে বাবা জামাঞ আউলঅ গউ
কহু জামাঞ দুখঅ সুখঅ বাত।
কিআ কহবঅ সাসু দুখঅ সুখঅ বাতঅ গউ

বেটি তহর মরলঅ ছঅ মাস
হাইরে নিঠুরা ভাইগ ভাগঅল ছতিআ গউ
ছইঅ মাসেঁ বেটিকে খভইর।
রপা মাসেঁ বরিসাঁঞ নদি লালা ভরি গেইল
কেইসে দেবন সাসু বেটিকে খভইর।
ধনি মরঅ মরি গেইল টিঢ়আ সুইননঅ ভেইল
দেহ সাসু দসর বিহা।
কিআ জে দেবেন জামাঞ দসরঅ বিহা গউ
লেলে জাহান ছটকি সালি।

উক্ত গিতে ছয় মাসের মধ্য দিয়ে সম বছরের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

(২৩) কুড়মালি সংস্কৃতি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান :-কুড়মালিতে এক জানকহনি আছে যে—

"পাত চিরিচিরি ফরটি গেঁড়া, জেঁই নি জানই অকর ঘারগুসটি ভেড়া"

উত্তরটি হবে এঁড়রি। এই গাছের সঙ্গে কুড়মি জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এঁড়রির ফল থেকে যে তেল তৈরী হয় তা গাঁট ব্যথা, পা মচকানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম ফলের তেল খোস পাঁচড়ার ঔষধ তৈরী হয়। তুলসী পাতার রস থেকে জ্বর, সর্দি, কাশি প্রভৃতির ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। বাসক পাতা ও শিদ মনসা একইরকম কাজে লাগে। ছোট্টচারা শিমূল থেকে জন্ডিসের ঔষধ তৈরী হয়। সাপে কামড়ানোর বিষক্রিয়া নষ্ট করার জন্য এক ধরনের গাছের ঔষধ তৈরী করা হয়। কুরথি ডালের জল গলব্লাডার স্টোন, কিডনির স্টোন প্রভৃতির জন্য খুব উপকারী। পায়রা ও ঢেবচু পাখির সঙ্গে ঘি ও অন্যান্য গাছ গাছড়া মিশিয়ে বাতের ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। মহিলাদের বিভিন্ন রোগ, পুরানো কাশি প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন গাছগাছড়ার ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। এছাড়া গরু/মহিষের চাম জঁখা, গরু/মহিষের সন্নিপাত, বিজবিজি সন্নিপাত, আউসা, গরু/মানুষের ফুল পড়া, শুকনো সন্নিপাত, গরু/মহিষ/মানুষ প্রভৃতি অন্ত্রে কেঁচো, কুকুর/বিড়াল কামড়ালে বিভিন্ন প্রকার গাছ গাছড়ার ঔষধ তৈরী করে রোগের নিরাময় করা হয়এ থাকে। কুড়মি জাতির প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষজন অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কাজ না হলে কবিরাজির গাছগাছড়ার ঔষধ ব্যবহার করেন।

(২৪) কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্রবিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতির দেহতত্ত্বমূলক 'ধারনি মন্ত্রে' কথিত যে—

"এক সে সুঁড়িন দুঘরে সাঁধনঅ
চিঅন বাকল বারনি বাঁধনঅ

সহজে থির করি বারনি সাঁধে
জি অঁজরা মর হই দিঢ় কাঁধে"।

মন্ত্রটি দেহতত্ত্ব সাধনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিষয়টির গভীর তাৎপর্য এইযে, নারীর যোনির সরু পথ দুভাগে বিভক্ত যা সুরক্ষিত চিকন বাকল দ্বারা অবরুদ্ধ রয়েছে। সহজিয়া তন্ত্র মত জানা থাকলে সেখানে প্রবেশ করা সহজ হবে ও জীবন রক্ষা পাবে। সুতরাং কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে তন্ত্রবিজ্ঞানের যোগসাধন অটুট ও নিবিড়। 'তন্' শব্দের অর্থ বিস্তারিত হওয়া যা বন্ধনমুক্তির সাধনা করতে ও বন্ধন মুক্ত হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। প্রতিটি অস্তিত্বের একটা বীজমন্ত্র বিদ্যমান। জড়তা, নিবিক্রয়তার বীজমন্ত্র '৩' এই '৩' রূপী জড়তা থেকে যা ত্রাণ কের তা তন্ত্র। সদাশিব তন্ত্রমতের প্রবর্তক। তন্ত্রের বৈবহারিক প্রয়োগবিদ্যা রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে তন্ত্রের দর্শণ দাঁড়িয়ে আছে। তন্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মবিজ্ঞানের যোগ রয়েছে। তন্ত্রে ব্রহ্মবিজ্ঞানের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবহারাক বিদ্যা ও ১০ ভাগ তাত্ত্বিক। আনন্দমার্গের সাধন প্রনালী তন্ত্রের উপর প্রতির্ষ্ঠিত। তন্ত্রসাধনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান—

ক) সংগ্রাম মুখরতা
খ) কুল কুন্ডলিনীর উর্দ্ধারোহন
গ) সিদ্ধমন্ত্রের প্রয়োগ

কুড়মি জাতি উপরের বৈশিষ্ট্য তিনটির মধ্যে সিদ্ধমন্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে তন্ত্রবিদ্যা প্রতিফলন করে। লুইপা, হাড়িপা, পঞ্চুআ, বিরুআকে কুড়মিরা সিদগুরু বা সিদানগুরু বলে জানে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে এলাকার মানুষজন সিদগুরুরূপে পূজা করে। এমনকি ময়ূরভঞ্জের চিত্রডাতে পৌষসংক্রান্তির সময় লুইপাদের জন্মদিন প্রত্যেক বছর পালন হয়ে আসছে। মন্ত্রগুরু, মানগুরু, দন্তিগুরু প্রভৃতিরা দেহতত্ত্বমূলক চর্যা বা চাঁচর গিতের রচয়িতা বলে অভিহিত। একটি চাঁচর গিতে ব্যাপারটা সহজে অনুমেয়—

"বিনাহ ঠেঁগেকেরি হরিনি রে
উমকলে ডেগল পাহাড়
মুড় কাটলে নেহি মরএ
নেজ কাটলে মরি জাই"।

চাঁচর গিতের মধ্যে তুলনা, রূপক, উপমা প্রভৃতি সবকিছু বিদ্যমান এবং তা দেহতত্ত্বমূলক একটি অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে। যোগমার্গের সাধনার জন্য তন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে গিত, বাজনা, মুদ্রা, কীর্তন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

(২৫) কুড়মালি সংস্কৃতি ও নৃ-বিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতি ও নৃ-বিজ্ঞানের কথা বলতে

গেলে 'জানকহনিতে' উল্লিখিত যে—

"একটা ঢেলকা ছইটা ডঁড়ু"

বাক্যটির উত্তরটি হবে মুড় অর্থাৎ মাথার মধ্যে চোখ, কান, নাখ, মুখ প্রভৃতি সংযুক্ত রয়েছে। নৃবিজ্ঞানে মানুষের মাথার খুলি, দেহের হাড় ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে। দেহতত্ত্বমূলক সাধনায় দেহের ষঠচক্রের অধিশ্বরী দেবী আছেন যথাক্রমে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, মাকিনী ও হাকিনী তারা মানুষের মাথার খুলি ও হাড় প্রভৃতি নিয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন। এছাড়া রঙ্কিনী, ঝঙ্কিনী, পাঁচবহনি, সাত বহনি দেবীরা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় গ্রামের বাইরে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করতেন। কুড়মিদের দেহের গঠন, নাখ, মুখ প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিকরা বৈশিষ্ট্যাবলী বিশ্লেষণ করে তাদেরকে তপশিলী উপজাতি বলে ভূষিত করেছেন। ঝাড়খন্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার পোটকা ব্লকের বানসিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রোহিনীবেড়াতে রঙ্কিনী দেবীর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। পুরুলিয়া জেলার গড়জয়পুর ব্লকের সিংঘাঘরা, কল্যাণপুর, ডাহিট্যাঁড় ও আড়ষা ব্লকের চিতিডি গ্রামের কাছে জাঁতাড় পরবে পাঁচআটি করার সময় ও ধান কাটার সময় পাঁচবহনির উদ্দেশ্য তেল-সিঁদুর দেওয়া হয়। কোনো কোনো জায়গায় ভেড়া বলি প্রচলিত আছে। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ১নং ব্লকের লছিপুরে ও ঝাড়গ্রাম সদর ব্লকের উপরশোলে সাতবহনির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার গড়জয়পুর ব্লকের কোশাঙ্গি গ্রামের বহালে সাতবহনির উদ্দেশ্যে তেল-সিঁদুর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

(২৬) কুড়মালি সংস্কৃতি ও মানববিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে মানববিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের জীবনে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রনা, সহানুভূতি, ভালোবাসা, স্নেহ প্রভৃতি কুড়মালি গিতের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কুড়মালি সংস্কৃতি সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আবর্তিত। বাচ্চা প্রসবকালে প্রসূতির কাজকর্মের চাপ বেশী অনুভূত হলে তাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ীতে এনে নিরাপদ সহকারে আশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। আবার শ্বশুর ঘরের কাজকর্মে অসুবিধা দেখা দিলে জামাই মাঝে মাঝে এসে কাজের দেখভাল করে দেন। গ্রামের 'মড়ল' গরাম থানে লাইআর ভূমিকা পালন করে। বিবাহ অনুষ্ঠানে জামাই কুটুম 'লাইআর' ভূমিকা পালন করে ও পারলৌকিক ক্রিয়াতে ভাগ্না গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২৭) কুড়মালি সংস্কৃতি ও সঙ্গীতবিজ্ঞান :- নৃত্য গিত কুড়মালি সংস্কৃতির অঙ্গ। নৃত্য ও গিত ছাড়া ভাবা যায় না। নৃত্য ও গিতকে ছন্দোবদ্ধ করতে বাজনা তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। কুড়মালি ভাষায় একটি জানকহনি আছে যে—

'বন লে বাহরাল কাড়া, কাড়াই কহেই মকে দমে ঢাড়হা"।

জানকহনির উত্তর হবে নাগড়া। কুড়মালি সংস্কৃতি ঋতুভিত্তিক ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গিতের সুর, তাল, ছন্দ, নৃত্য, বাজনা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে রিঝামাঠা, ছলকউআ, খেমটা, আড়খেমটা, পঢ়িআমেঢ়া, ছিটকা, উড়াখাড়িআ প্রভৃতি সহ এক শত রকম বা তার বেশী রেগ বিদ্যমান। প্রত্যেক রেগের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সহযোগে সুর, তাল ও ছন্দ আছে। ষদিও বিষয়গুলি বর্তমানে ব্যাপকভাবে গবেষণাসাপেক্ষ। মানুষের শরীরে বিভিন্ন প্রকার চক্র আছে ও সেখানে বিভিন্ন গ্রন্থির অবস্থান দেখা যায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আপাদমস্তকভাবে চক্রগুলি মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মনিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, জ্ঞানচক্র প্রভৃতি অবস্থান করে। মানবশরীরে যৌনগ্রন্থি ও ওভারীতে মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্র, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড স্বাধিষ্ঠান চক্র ও মূলাধার চক্র, সৌরগ্রন্থিতে অনাহত চক্র, পিটুইটারি ও পিনিয়্যাল গ্ল্যান্ডে আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার চক্র প্রভৃতি রয়েছে। নৃত্য, গিত ও বাজনা তন্ত্রবিদ্যার অঙ্গ যা নিয়মিত করলে রক্তসংবহন, স্নায়ুসঞ্চালন, হরমোনের ক্রিয়া যথাযথ অবস্থানে থকে ও মানবশরীরকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক রাখে। শরীরের সঙ্গে মনে সংযোগ নিবিড়। শরীর যথাযথ থাকলে মনের কাজের প্রেরণা বাড়ে অর্থাৎ সম্পর্ক ধনাত্মক হয় ও শরীর খারাপ থাকলে মন পিছিয়ে থাকে অর্থাৎ সম্পর্ক ঋনাত্মক হয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে কৃষিকাজের মাধ্যমে মানবদেহের অসাড়তা, জড়ত্ব কাঁটিয়ে রেগ, তাল ও বাজনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ছন্দে জীবনকে পরিচালনা করে প্রেবণা দেওয়ার কাজে ঋতুভিত্তিক কুড়মালি সংস্কৃতি সমগ্র পৃথিবীতে বিরল দৃষ্টান্তের নজির বহন করে চলেছে। কুড়মালি অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতিতে 'করম' পরবে ও 'বাঁদনা'পরবে যথাক্রমে শষ্য ও গবাদি পশুকে গান শুনিয়ে প্রেষণা দেওয়ার পদ্ধতি এখনও অতিমাত্রায় বিদ্যমান। বর্তমানে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে চীন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে মিউজিক থ্যারাপি নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে। চীনের সাংহাইয়ের এক হাসপাতালে নিউরোসিসের রোগীদের ইয়োহান স্ট্রাউসের "রেড ওয়ালৎজ" শুনিয়ে উপকার পাওয়া গেছে।

*** কুড়মালি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তারিখ, মাস, পরব, গিত ও বাজনার রেগ উল্লিখিত হল:-**

তারিখ	মাস	পরব	গিত	বাজনার রেগ	নাচ
১ লা মাঘ	মাঘ-ফাল্গুন	আখাইন জাতরা			
চৈত্র মাসের সংক্রান্তি তিথি	চৈত্র-বৈশাখ	চড়ক	ঝুমুর, বিহা গিত, ডমকচ গিত (লগ্ন বাঁধার গিত)	উধোআ, চৈতালি, ভাদরিআ, মলহরিআ,বিরহ, ডমকচ	ছৌ নাচ, ডবকা নাচ, ঘোড়া নাচ
১৩ ই জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ	রহিন			
আষাঢ়ের যেকোন দিন	আষাঢ়	জাঁতাড়	ধান রপা গিত/ কবি গিত		
৭ ই আষাঢ়	আষাঢ়	আঁবাবতি	ধান রপা গিত/কবি গিত		
ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি	শ্রাবন-ভাদ্র	করম, করম আখড়া শেষ হওয়ার পর আরম্ভ	(লঘু স্বর) জাউআ গিত (গুরু স্বর) করম গিত, এঢ়েইআ ডাঁইড় নাচ/পাঁতা নাচের গিত	লুঝরি, ডহরআ, ঝিঙ্গাফুলিআ, খেমটা, আড়খেমটা, লুহ্র লুহ্র	জাউআ নাচ, করম নাচ, এঢ়েইআ নাচ, পাঁতা নাচ
ভাদ্র মাসের চাঁদে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, আশ্বিনের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি তিথি	আশ্বিন-কার্ত্তিক	জিতিআ, দেঁসেই, জিরহুল/জিহুড়, (জাঁত/ঝাঁপান উপলক্ষে)	কাঠি নাচের গিত, বিসড়ি মনতরঅ		কাঠি নাচ
কার্ত্তিক মাসের প্রথম চাঁদের অমাবস্যা তিথি	আশ্বিন-কার্ত্তিক	বাঁদনা	বাঁদনা গিত/অহিরা গিত/সহরাই গিত, চাঁচর	ভাদরিআ	
পৌষ মাসের সংক্রান্তি তিথি	অগ্রহায়ন-পৌষ	মকর, টুসু বিসর্জনের পর থেকে চৈত্র সংক্রান্তি	টুসু গিত, উধোআ গিত	কাহারবা, একতাল	কাঠি নাচ

(২৮) কুড়মালি সংস্কৃতি ও Metaphysics :-কুড়মালি সংস্কৃতি ও Metaphysics একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'Metaphysics' এর অর্থ 'beyond nature' প্রকৃতির উর্ধ্বে। Metaphysics অস্তিত্ব, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, স্থান-সময়, কারণ ফল, সম্ভাবনা প্রভৃতির অর্থ অনুসন্ধান করে। ভি.গর্ডন চাইল্ড কৃষি আবিষ্কারের প্রারম্ভিক পর্যায়ে লোকপুরাণ সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। জর্জ লরেন্স গোম লোকপুরাণকে বলেছেন—"দ্য সায়েন্স অব এ প্রিসায়েন্টিফিক এজ"। কুড়মালি সৃষ্টিতত্ত্ব কথায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি অর্থাৎ পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ প্রভৃতির উৎপত্তির কথা জানা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির পিছনে বিগব্যাং ও ব্ল্যাকহোল তত্ত্বের কথা বলেছেন কিন্তু কুড়মালি 'অহিরা গিতে' সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উল্লিখিত যে কুড়মালি-

"নেহি রহে অগি নেহি রহে পবন
নেহি রহে আকাস রসাতল
সবদঁএ তিঠইএ বুঢ়া ভগবান গো
কালি মাঞে পহিল সিরজল।"

গিতটির অর্থ এই যে, তখন আঁগুন ছিল না, বাতাস বা বায়ুমন্ডল ও আকাশ বা রসাতল কিছু ছিল না। ঈশ্বর বা বুঢ়া ভগবান শব্দরূপে বিরাজিত ছিলেন ও কালি মাহামাঞ স্বরূপ ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেন। শিবকে ব্যোম স্বরূপ (সত্ত্বা) ধরা হয়ে থাকে ও ডমরুর ধ্বনি আদি নাদ। মাহামাঞ কালি ব্ল্যাকহোলের ধারণার সঙ্গে সদৃশ্যযুক্ত। শিবের উপরে কালির প্রতিমূর্তি তা ব্যোমে ব্ল্যাকহোলের অবস্থান সূচিত করে। পরবর্তীকালে 'শ্বেতাশ্বতার উপনিষদে" বলা হয়েছে যে—

"যদাহত মস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ ন সন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেন্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী "১৮"

শ্লোকটির মর্মার্থ এই যে, যে সময়ে অজ্ঞান ও অবিদ্যা ছিল না, সে সময় দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, সত্ত্বা ও ছিল না, অভাবও ছিল না, তখন কেবল মঙ্গলময়, নির্বিকল্প ব্রহ্মাই ছিলেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই আদিত্য মন্ডলবর্তী পুরুষের আরাধ্য, তাঁহা হইতেই গুরু পরম্পরাগত জ্ঞান বিবেকী পুরুষগণে প্রকাশিত। আবার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের 'পুণ্য পুঁথি বইয়ের ভাববাণীর দ্বিসপ্ততিতর দিবসে, ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সালে বলেছেন— "না, তখন আলোর সৃষ্টি হয় নাই, অন্ধকার ছিল না, সৌরজগতের উদ্ভব হয় নাই। তিনি একা ছিলেন, ইচ্ছা হলো সৃষ্টি করতে— আর সব সৃষ্টি হলো। তিনি ছিলেন আর আমি ছিলাম। ১

আমিই তিনি, আমিই তিনি, আমিই তিনি।" ২

সুতরাং কুড়মালি সৃষ্টিতত্ত্বকথার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের মিল দেখতে পাওয়া যায়। কুড়মালি লোক পুরাণে সূর্য ও তার চারিদিকে আবর্তিত গ্রহ্ব ও উপগ্রহের সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, মহাকালের কোন এক সময় বুঢ়া ভগবান একটি বৃহৎ পাথরের উপর বসে ধ্যানস্থ ছিলেন। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছিল। অবশেষে দীর্ঘদিন পিপাষার্ত থাকার জন্য যোগীর ধ্যান ভগ্ন হয়। অনাবৃষ্টির কারণে বুঢ়া ভগবান জল না পাওয়ার জন্য পিপাষার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ক্রোধে পাথরের উপর জোরে আঘাত করলেন। ফলত পাথর খন্ডটি আগুন জ্বলে উঠে ও কয়েকটি টুকরোয় পরিণত হয়। এই পাথরের খন্ড সূর্য ও খন্ডিত অংশগুলো গ্রহ ও উপগ্রহ নামে পরিচিত। এভাবে দিন-রাত্রির কথা জানা যায়। একইভাবে লোককথায় কুড়মি জাতির কৃষিকাজের সূচনার কথা জানা যায়। ২০০৮ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ইউরোপীয় পারমাণবিক গবেষণা সংস্থা (CERN) সূর্যরশ্মির তরঙ্গের থেকে অধিক ক্ষমতাশীল LHC প্রোটন কণার সংঘর্ষ ঘটিয়েছিল যাতে মহাবিশ্বে কোনো ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য কিন্তু তারা কোনো খারাপ খবর বা বিপদের সম্ভাবনার কথা প্রমাণ করতে পারেননি। যাই হোক, সারাবিশ্বে এক মহাজাগতিক শৈবশক্তি কাজ করে চলেছে যা সৃষ্টি ও ধ্বংসের বার্তারি প্রতীকি রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এইজন্য সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ২০০৪ সালের ১৮ জুন শিবের তান্ডব নৃত্যের প্রতীকরূপে নটরাজ মূর্ত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শৈবশক্তি বা এক প্রাণময় সত্ত্বা পৃথিবীর উপর ক্রিয়া চলেছে যা থেকে সর্বপ্রাণবাদ (Animism) তত্ত্ব সংগঠিত হয়েছে ও সর্বপ্রাণবাদ (Animism) তত্ত্ব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত বিবর্ধিত হয়েছে।

(২৯) কুড়মালি সংস্কৃতি ও ফলিত প্রাণীবিদ্যা :- কুড়মালি ভাষা প্রবাদে আছে যে—

"ছাগইর চরতেক, ঠরকা বাজতেক"।

কুড়মালি সংস্কৃতি মানুষের সঙ্গে গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'ঠরকা' শব্দব্রহ্মা হিসেবে কাজ করে যা দলের প্রধানে গলায় থাকে। সেটি গরু, বাছুর, ছাগল প্রভৃতি হারালে তার শব্দে জিনিসকে খুঁজতে সাহায্য করে। কুড়মিরা বাড়ীতে মহিষ, বলদ প্রভৃতি প্রতিপালন করে। হাঁস-মুরগী, পায়রা, তিতির, গুঁড়ুর, টিয়া প্রভৃতি পোষ মানায়। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু কুড়মিদের ঘরে গৃহপালিত জন্তুর মতো থাকে।

(৩০) কুড়মালি সংস্কৃতি ও ফলিত উদ্ভিদবিজ্ঞান :- কুড়মালিতে এক প্রচলিত আহনা আছে যে—

"পানি পড়লে গাইদে, ধান লাগাউবঁ বাইদে"।

জল পড়ার সময় জলাজমিতে ধান চাষ করা বিধেয়। সুতরাং উদ্ভিদের সঙ্গে প্রথম থেকেই কুড়মি জাতির সম্পর্ক। তারা বাড়ীর উঠানে লাউ, কুমড়া, পুই, পেঁপে, কুঁদরি, বরবটি, সজিনা গাছ, নটে শাক প্রভৃতি চাষ করে। বিভিন্ন ঔষধ গাছ তুলসী, বাসক, কালমেঘ, সর্পনাশের বনৌষধি, এঁড়রি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে। কুড়মি জাতি বনজঙ্গলকে নিজের মায়ের মতো মনে করে। বাড়ীর কাছে তারা আম, জাম, কাঁঠাল, শাল, পিয়াশাল, গামার, পলাশ, কেঁন্দ প্রভৃতি উপকার করে। ফল দিয়ে সাহায্য থেকে শুরু করে ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরী হয়ে থাকে। বাড়ীর কাছে গাঁদা, গোলাপ, টগর, আকন্দ, কলিকা, নয়নতারা, জবা প্রভৃতি বিভিন্নফুল সারা বছরধরে লাগিয়ে রাখে। এইসব ফুলগুলি বিভিন্ন পূজা করতে কাজে লাগেও মানুষের আনন্দবর্ধন করে।

(৩১) কুড়মালি সংস্কৃতি ও গৃহবিজ্ঞান :- কুড়মালি ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত জানকহনি আছে যে—

"আউএ বে ঢুবকা হুঁড়া তকে লেই ভাত খাব"।

উত্তরটি হবে ঘটি। ঘটি জলের আধার যা জল খেতে সাহায্য করে। কুড়মি জাতির মানুষের ধরে কয়েক বছর আগে মাটির হাঁড়ি, কড়া, পাথরের থালা, বাটি, পাথরের প্রদীপ, পাথরের ফুলদানি, পিঠার সানখি-সরা, মাটির মুড়ি ভাজার খলা প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল কিন্তু সময় ও কালের পরিবর্তনে জিনিসপত্রের বেশকিছু পরিবর্তন এসেছে। কুড়মি জাতি কৃষিজীবি অধিবাসী হওয়ার সুবাদে খাবার বিভিন্নজিনিসপত্র বাড়ীতে তৈরী করে থাকে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে প্রায় ভেজাল থাকে না বললেই হয়ে থাকে। ফলে শিশু থেকে শুরু করে বড়রা পর্যাপ্ত যথেষ্ট পুষ্টিযুক্ত খাবার খেয়ে থাকে।

(৩২) কুড়মালি সংস্কৃতি ও অলঙ্কার বিজ্ঞান :- কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে অলঙ্কারবিজ্ঞানের যোগ গভীরভাবে রয়েছে। অলঙ্কার দেহের ভূষণ। অলঙ্কারের মাধ্যমে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আধুনিক যুগে অলঙ্কার বিজ্ঞানের উপর পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে ও ব্যাপকভাবে পঠন-পাঠন হচ্ছে। কুড়মি জাতি পাথরের গায়ে বা দেওয়ালে বিভিন্ন রকম চিত্র বা নকসা অঙ্কন করে বিভিন্নভাবে ঘরকে সজ্জিত করে। সেখানে লতা পাতা থেকে শুরু করে সূর্যের প্রতীক, বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি, তীর ধনুক প্রভৃতির

ধারণামূলক চিত্র অঙ্কন করে নান্দনিক চিন্তাধারা তুলে ধরে। তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে কানে, নাকে, পায়ে, কোমরে, আঙ্গুলে, গলায় বিভিন্ন ধরণের গহনা ব্যবহার করে আসছে। পোশাক পরিচ্ছেদের দিক থেকে মহিলারা সাধারণত ঠেঁঠি (হাঁটুর থেকে পরা এক শ্রেণির সূতার কাপড়) ও পুরুষরা সাধারণত পাঁচ হাত ধুতি ব্যবহার করতেন। মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন। একটি ঝুমুরে মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে উল্লিখিত যে—

"কাপাসঅ বুনঅলি ধঁপা ধঁপা ফর গঅ,
সুতা কাটি, ঠেঁঠি বনাই দেবঁ তর গঅ, সুতা কাটি
একঅ ফেটি আনঅলি, কাটলি দুইঅ ফেটি টানঅলি,
তিনই ফেটিএ ঠেঁঠি হেইএ জাতউ তর গঅ;
ধারে ধারে দিহা তাঁতি, চাঁদঅ সুরজ তিনই ফেটিআ
মইধে দিহা, মইধে দিহা তাঁতি জড়া সইতিনিআ
কহে বিননদ সিংহের, ঝুমুর বনাই বনে
মইধে দিহা তাঁতি, মইধে দিহা জড়া সইতিনিআ।"

সুতরাং উপরের গিতে কেমন করে কার্পাসি ফল থেকে সূতা বের করে কাপড় তৈরী হচ্ছে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

(৩৩) কুড়মালি সংস্কৃতি ও রিমোট সেন্সিং :- কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানের যোগের সমন্বয় দেখা যায়। বিজ্ঞান যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুচারুভাবে বিষয়কে তুলে ধরে। একইভাবে ভূ-বিজ্ঞানের একটি শাখা রিমোট সেন্সিং এর সঙ্গে কুড়মালি সংস্কৃতির মিল রয়েছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে বৃষ্টির আগে পূর্বাভাষ দেখে অনুমান করা যায় যে, বৃষ্টির সূচনা হবে। সে সময় পিঁপড়ার ভাত/ডিম নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হতে থাকে, মুরগীকে রোদ পোহাতে দেখা যায়, বাঘঢুলু (বড়) উড়তে থাকে। এগুলি সবই পূর্বানুমান। রিমোট সেন্সিং পূর্বের জিনিসকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে তার সম্বন্ধে আগাম বার্তা জানা যায়। কৃষির ক্ষেত্রে কুড়মি জাতি কোন্ মাটিতে কি ফসল হবে কুড়মালি একটি আহনাতে আছে যে—

"ধান ঢহলে গবর
আঁখ ঢহলে দবড়"।

খেতে ধান গাছ যদি পড়ে যায় ও আখ গাছ যদি পড়ে তাহলে আখের ফলন দ্বিগুন হবে।

(৩৪) কুড়মালি সংস্কৃতি ও শ্রুতিবিজ্ঞান (Acoustics) :- কুড়মালি সংস্কৃতি সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান যুক্ত কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান একটি শাখা শ্রুতবিজ্ঞান (Acoustics) ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। শব্দব্রহ্ম শুধু গাছপালার উপর নয় মানবশরীরের উপর গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। করম পরবে ছোট ছোট বাচ্চারা সাউন্ড থেরাপির সাহায্যে গান শুনিয়ে শুনিয়ে শস্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। গানের সঙ্গে শস্যের বৃদ্ধির ব্যাপারটি ধনাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত। গাছ মানুষের মতো সাড়া দেয় ও উদ্দীপনা গ্রহণ করে। শস্যকে গানের সাহায্যে উদ্দীপনা দিলে স্পন্দন ভালো হয়। আবার ভোরবেলার, সকালবেলার, মধ্যাহ্নের সময় ও সন্ধ্যা বেলার ঝুমুরের রেগ মানুষের শরীরের বিভিন্ন রকমের হরমোনে ক্রিয়া করে ও তার ফলবিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়। হালকা ও লঘু সুরের ঝুমুর গিতে মনের উপর একধরণের প্রভাব ফেলেও গুরু সুরে ঝুমুরের গিতে মনের উপর অন্য প্রতিক্রিয়া করে। শ্রুতিবিজ্ঞানের মধ্যদিয়ে মানুষের জীবনধারা, রোগ নিরাময়, সুস্থ ও স্বাভাবিকতা প্রভৃতি নির্ভরশীল। স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমনের শ্রুতিবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে 'On theMechanical Science Theory of vibration of Bowed strings' প্রকাশনা এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

(৩৫) কুড়মালি সংস্কৃতি ও ব্যবস্থামূলক (Management) **বিজ্ঞান** :- কুড়মি জাতি সামাজিক লেনদেনে বিশ্বাসী। সমাজ ব্যবস্থাকে চিরকাল ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস এক জ্বলন্ত উদাহরণ। মানুষের সমষ্টির কল্যাণ ও পরিকাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে।

১। কুড়মি জাতি কাজের বিনিময়ে বেরহুনের সময় 'আগ' রাখার মাধ্যমে ধানবীজের পুনঃসঞ্চিতকরণ করে রাখে যাতে পরের বারের জন্য বীজতৈরী বা দুঃসময়ে কাজে লাগতে পারে।

২। গরাম থানে বৃক্ষে সংরক্ষণ।

৩। করমে 'ধানগাছকে' পান্নার ঠাকুর হিসেবে ব্যবহার করে পুনঃরায় যে স্থান থেকে তোলা হচ্ছে সেইস্থানে লাগিয়ে থাকে এতে জমির ফসলের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে।

৪। জিতিআ পরবে 'আখগাছকে' প্রতীকি করে পূজার পর তাঁর গোড়াগুলি পুনরায় নতুন গাছ সৃষ্টির জন্য লাগানো হয়ে থাকে।

৫। ধান জমি থেকে ধান কাটার পর 'ডিনিমাঞ' আনার পর ধান বিলে ধানের শিষ কুড়ানোর মাধ্যমে ধানবীজের পুনঃসঞ্চয়করণ করা হয়।

৬। রহিন পরবে 'রহিন মাটি' সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সাতদিনের মধ্যে বিহন ফেললে

রোগের বা পোকার আক্রমন হয় না। বীজ ফেলার সময় ঝুড়িতে ধানের সাথে রহিন মাটি ব্যবহার করা হয়। রহিন মাটি ঘরের তিনকোনে দেয় (১টি কোন বাদ থাকে)। অনুষ্ঠান ঘরে রহিন মাটি দিয়ে টিকা করা হয় ও ঘাটে উঠে আসার পর রহিন মাটি দিয়ে টিকা দেওয়া হয়।

৭। কুড়মালি নেগাচারে ভালো প্রজাতির বীজ(ধান) গম, লাউ, কুমড়া, পুঁই, ঢেঁড়শ ও মুরগি, গরু, হাঁস, ছাগল, ভেড়া, মইস প্রভৃতি কুটুম ঘরের মাধ্যমে লেনদেন করা হয় যাতে অন্য একটি পরিবারে ভালো প্রজাতির সম্পদের আগমন ঘটে ও ব্যবহার করে সমাজজীবনে সুফল পাওয়া যায়।

৮। কুড়মি ঘরে দরা চাল (উচ্ছিষ্ট চাল) ছোট মুরগি ছানার খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চালের গুঁড়ি হাঁস বাচ্চার খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাসিভাত বড় হাঁস বা মুরগির খাবারের কাজে লাগে। উঁড়ি মাড়া ধান হাঁস, মুরগি ও পায়রার খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯। ধান ভানা কুঁড়ো, আনাজের খোসা, জল দিয়ে গরম করে গরু, মোষের পুষ্টিগত খাবার তৈরী হয়ে থাকে।

১০। ভাতের ফ্যান ছোট্র বাছুর, কেঁড়ু,গরু, কাড়া (মহিষ) প্রভৃতির খাবার তৈরী হয়ে থাকে।

১১। চালের থেকে তৈরী মুড়ি মজুরদের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১২। ধান থেকে তৈরী চিড়া যা বিভিন্ন পূজাতে ও মানুষের খাবারের জন্য কাজে লাগে।

কুড়মি জাতির ব্যবস্থামূলক বিজ্ঞানে প্রতিমুহূর্তে মানবসম্পদ উন্নয়নের নমুনা বহন করে। আজকের বি. বি.এ, এম.বি.এ, হোটেল মেনেজমেন্ট প্রভৃতি কোর্সের সূচনা কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি থেকে উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে কোন পদ্ধতি বা ব্যবস্থাপনার প্রারম্ভ আছে ও বিবর্তিত হতে হতে অতিমাত্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। পরবর্তীকালে টেলরের 'Scientific Management Theory', ফয়েলের 'Principles of Management', ম্যাসলোর 'Theory of Hierarchy of Human Needs', ডগলাস ম্যাগগ্রেগর 'Theory X and Theory Y' ব্যবস্থামূলক বিজ্ঞানের ইঙ্গিত বহন করে। সে যাই হোক, ব্যবস্থামূলক বিজ্ঞান মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

(৩৬) আবহাওয়াবিদ্যামূলক বিজ্ঞান (Meteorological Science) :- কুড়মালি ভাষায় এক আহনা অর্থাৎ প্রবাদ প্রবচন আছে যে, —

"মাদইরে বাদইর, না গড়াঞ পানি"

প্রবাদটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে, মাদলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে যদি কোদাল দিয়ে কোপানো মাটির মতো মেঘ দেখা দেয় আর সেই সঙ্গে এলোমেলো বাতাস বইতে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে বৃষ্টি আসবে আবার নাগড়ার শব্দব্রহ্মের সাহায্যে একইভাবে আকাশে বৃষ্টির পূর্বাভাষের সূচনা হতে পারে। প্রাচীনকালে বাতাস, মেঘের প্রকৃতি, জলীয় বাষ্পের পরিমান, তাপমাত্রা, জীবজন্তু, পাখি, সাপ, কীটপতঙ্গের আচরণ দেখে বৃষ্টির পূর্বাভাষ পাওয়া যেত। এছাড়া আকাশের রং, সূর্যোদয় ও অস্তগামী সূর্যের প্রকৃতি, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি, সূর্যের দিকে চাঁদের ঘূর্ণন প্রভৃতি যাচাই করে বৃদ্ধির ধারণা পাওয়া যেত। পরিবেশে তাপমাত্রার গুমোট ভাব, একদিকে বৃষ্টি হলে অন্যদিকে ঠান্ডা বাতাস অনুভূত হওয়া, বড় বাগচুলু উড়া, মোরগের রোদ পোহানো, পিঁপড়ায় সাদা রঙের ডিম দেওয়া প্রভৃতি দেখে কুড়মালি দর্শণ ও বিজ্ঞান অনুযায়ী ধরে নেওয়া সতর্কতা জারী আছে। হয় যে বৃষ্টি আসতে চলেছে। আবার আকাশে ভাঁড়ার কোণে (উত্তর-পশ্চিম) মেঘের জমাট বাঁধা দেখলে বুঝতে হবে যে অতিসত্ত্বর বৃষ্টি নেমে আসবে। অন্যদিকে আকাশে যে কোনদিকে রামধনুর সূচনা মেঘ কেটে বৃষ্টি না আসার ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমানে বিশ্বউষ্ণায়ণের যুগে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। একটি পরিসংখ্যআন দিলে ব্যাপারটি সহজেই বোধগম্য হবে যে, ১৯৬৮ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ১২টি নিম্নচাপ হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে সেখানে কমে মাত্র তিন। ১৯৮৮ সালে বর্ষার প্রকোপে সেখানে সংখ্যা বেড়ে ১৫টি হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৫৭ সালে একটিও নিম্নচাপ না হওয়ায় অনাবৃষ্টির কবলে পড়েছিল সারা দক্ষিণবঙ্গ (মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) ও পশ্চিমবঙ্গ। উড়িষ্যায় খরা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জলবায়ুর ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ঘটে আসছে। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড উত্তাপ ও গরম বাতাস 'লু'। বর্ষাকালের ধারা আষাঢ়-শ্রাবনে না হয়ে শ্রাবনের শেষ বা ভাদ্র থেকে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত। আবার শীতকালের ধারা পৌষ-মাঘ না হয়ে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত উক্ত ঋতুর ধারা বজায় থাকে। সুতরাং ঋতুবৈচিত্র্যের দিক থেকে দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল, অনিশ্চিত বর্ষাকাল ও বছর ভেদে তীব্র ও লঘু শীতকাল এই তিনটি ঋতু সারা বছর প্রায় প্রতি মাস হেমন্ত ও কোকিলের ডাকে বসন্তকালের অস্তিত্ব ও কাশফুলের বার্তায় ক্ষীণকাল শরৎ ঋতুর উপস্থিত প্রায় নেই বললেই চলে।

ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৩ সালে ভারতে যেখানে প্রায় দেড় হাজার মানুষ বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন সেখানে২০০৫ সালের পর দেশে

বছরে গড়ে দু হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ২০০৪ সালে সংখ্যাটা ছিল আড়াই হাজারের বেশি। আবার বিভিন্ন সময় বাজ পড়লে বিভিন্ন রকম বৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। সকালে বাজ পড়ার শব্দ বৃদ্ধির দ্রুত আগমনের সূচনা করে, মধ্যাহ্নে ঘন ঘন বাজ পড়লে বৃষ্টি দেরীতে হয়, রাতে মেঘ গর্জন করলে তিন দিন বৃষ্টি স্থায়িত্ব হয় ও শেষ রাত (চতুর্থ প্রহরে) আর ভোর বেলায় বজ্রপাতের সময় বৃষ্টি হলে তা এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে বলা যায়। অন্যদিকে বাজের আওয়াজের উপর বৃষ্টির তারতম্য নির্ভর করে। বাজের আওয়াজ কাটা পাটা কাটা পাটা ধ্বনিযুক্ত হলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, বোমা বিস্ফোরণের মতো বাজ পড়লে বন্যা বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধা ধা ধা ধা ধ্বনি হলে অতিবৃষ্টির সূচনা করে, এই বজ্রপাতের ও জন্য বায়ুদূষণ ও বিশ্বউষ্ণায়নকে দায়ী করা হচ্ছে। মেঘে কার্বনের দূষিত কণার মাত্রা বেশী হলে মেঘের ঘর্ষণে বেশী বজ্র বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হবে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের অ্যানেক্স দুই ভবনের ছাদে 'লাইটনিং ডিটেক্টর' বসানো আছে যা বাজ পড়ার পনেরো মিনিট আগে লাল আলোর মাধ্যমে সতর্কতা জারী করে।

সুতরাং বজ্রপাতের হাত থেকে ও বিশ্বউষ্ণায়ণের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে একমাত্র পথ 'গাছ লাগানো ও বাস্তুতন্ত্র' বজায় রাখা। কুড়মালি গরাম থান/জাহিরা থান বড় বড় বৃক্ষের নমুনা দেখে বোঝা যায় যে উক্ত জাতির মানুষ কত গভীর বিজ্ঞানমনস্ক ও পরিবেশ সচেতন ও আবহাওয়ার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন। এছাড়া করম গাছ, শাল গাছ (সারহুলের সময় ফুল নিবেদন করা হয়), আমগাছ (বিবাহের সময় আমগাছের কাছে বা পাতা তুলে আম্র খাওয়ানো হয়), মহুল গাছ (বিবাহে স্ত্রীলিঙ্গের প্রতীকি রূপে ব্যবহৃত), অশ্বত্থ (মরখি নেগাচারে যুক্ত), বটগাছ (ষষ্ঠীমায়ের প্রতীকি), কুড়মালি দর্শন ও বিজ্ঞান সারা বিশ্বে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাম্প্রতিককালে সুইজারল্যাল্যান্ডের জুরিখে 'সুইজ ফেডারেলে ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ই.টি. এইচ. জুরিখ) একটি গবেষণায় বলেছেন যে, ১০০ বছর আগের স্নিগ্ধ বাতাস ফিরে পেতে গেলে অন্তত এক লক্ষ কোটি গাছ লাগাতে হবে এবং এ কাজ দ্রুত গতিতে করতে হবে। গাছ বসানোর জন্য ৩৫ লক্ষ বর্গ মাইল বা ৯০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পড়ে রয়েছে। এই পরিমান গাছ বসালো বায়ুমন্ডলে যে পরিমানে কার্বন জমা হয়েছে, তার ২৫ শতাংশ সরে যাবে।

(৩৭) প্যারাসাইকোলজি (Para-Psychology) :- প্যারাসাইকোলজি মনোবিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা এক ধরণের সারভাইভাল সিস্টেম যা এসিসি (অ্যান্টিরিয়াল

স্টিম্যুরিয়াল কর্টেক্স) অঞ্চলে মানুষের ব্রেনের মাঝখানে একটি সেন্টার থাকে। এটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সেন্স বা প্রো-প্রোয়োসেপশান সঙ্গে সম্পর্কিত ও মনের সঙ্গে সংযুক্ত। এব্যাপারে $PIEZO_2$ জিন প্রো- প্রায়োসেপশান-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়যুক্ত মানুষের বৈশিষ্ট্যাবলী :

১। ছোটবেলা থেকে চাইল্ডহুড ট্রমা বিদ্যমান (নেগেটিভ ঘটনার স্বীকার)।

২। সাইকোপ্যাথলজিক হতে পারে।

৩। নিউরোটিক ট্রেডের সম্ভাবনা (অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা)।

৪। সিলেকটিভ অ্যাটেনশন (অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা)।

৫। রেফারেন্সিয়াল ফিলিং বেশি (খারাপ অনুভূতি)।

৬। ইগোসেন্টিসিজন (আত্মকেন্দ্রিক) বেশী হতে পারে।

৭। Co-incidence থাকতে পারে (নিজেকে বিশেষ ব্যক্তিভাবা)।

৮। Unreliable হতে পারে (সবার থেকে আলাদা প্রতিপন্ন)।

৯। সাইফোফাইনেসিস (বিহেভিয়ার ট্রেড)।

১০। একটি সুনির্দিষ্ট ছকে বিশ্বাসী।

১১। ওবিই (আউটসাইড বডি এক্সপিরিয়েন্স) যাবে।

১২। কর্টিকল হাইপার এক্সাইটেবল (অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রবল)।

১৩। র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ (দ্রুত চোখের পাতা সঞ্চালন)।

১৪। ইনসটিংটি বা ইমপালস থাকে (জন্ম থেকে)।

১৫। ইনটুইশন থাকে (লোকালাইজেশন অব সাউন্ড কোন শব্দ কোথা থেকে আসছে তা বুঝতে পারে জন্ম থেকে বিদ্যমান)।

*** প্যারাসাইকোলজির চারটি পর্যায় :-**

১। Clairvoyance (অত্যাশ্চর্য অন্তদৃষ্টি) :

ইহা উনিশ শতকের শেষদিকে ও বিংশ শতকের প্রথমদিকে বিদেশে গবেষণার সূত্রপাত ঘটে। যাদের অতিমাত্রায় মানবদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ কি ঘটছে তার বিষয়ে প্রখরজ্ঞান যেসব মানুষের তারা এই পর্যায়ে পড়ে। এই বিষয়টি জৈনতত্ত্বের (Jainism) সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জৈনতত্ত্ব আবার শৈবতত্ত্ব বা সর্বপ্রাণবাদ (Animism) তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন কুড়মি সহ অন্যান্য খেরওয়াল ও হিতমিতান গোষ্ঠীর মানুষদের শ্রেষ্ঠ কৃষি উৎসব 'করম' পরব। এই পরবে শস্যের

অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকভাবে শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে গিত সহযোগে 'জাউআর' উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। ডঃ বীনাপানি মাহাত গবেষণার মাধ্যমে করম পরবে প্রায় ৩০ প্রকার রেগ (সুর) ও নাচের নমুনা খুঁজে পেয়েছেন। এই ৩০ প্রকার নাচের পদ্ধতি অনুসরণ করলেও সুর সহযোগে গাইলে গর্ভবতী মহিলাদের স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা প্রসব হবে বলে ধরা হয়ে থাকে। এই করম পরব কুড়মি সহ অন্যান্য খেরওয়ালও হিতমিতান গোষ্ঠীর মানুষজন না করলে যেমন সৃষ্টি বিনাশ হবে; অন্যদিকে সৃষ্টিশীল জিনিসের উৎকর্ষতা ঘটবে না। সুতরাং ফলাফল আমরা থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় সজাগ ইচ্ছা ও বুঝতে পারছি অন্তরের অনুভূতির মাধ্যমে।

২। Psychokinesis (শরীরের সংযোগ বাদে মানসিক প্রভাবে গতি) :

১৯১৪ সালে আমেরিকা মহাদেশে শব্দটি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল কিন্তু ভারত তথা ছোটনাগপুর মালভূমির কুড়মি জাতির মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই পর্যায়টি অনুসরণ করে আসছে। যেমন-কুকুর কাঁদলে অমঙ্গলের সূচনা হয়, বড় বাগচুলু (একপ্রকার পতঙ্গ) উড়লে, মোরগে রোদ পোহালেও পিঁপড়া সাদা ডিম দিলে বৃষ্টির সূচনা হবে। ইহা এক প্রকার 'Psychokinesis' যা শরীরের সংযোগ বাদে মানসিক প্রভাবে গতির সঞ্চার করে।

৩। Telepathy (ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এক মন থেকে আর এক মনে সংযোগ) :

১৮৩২ সালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শব্দটি নিয়ে বিদেশে প্রথম গবেষণার সূত্রপাত ঘটে কিন্তু কুড়মি সমাজের ক্রিয়ামূলক সংস্কৃতির (সধৌড়ি দেউআ) মাধ্যমে প্রায় ৮,০০০-১০,০০০বছর আগে বা তারও আগে এর ব্যবহারিক বিদ্যার সূত্রপাত ঘটেছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে তার রহস্য উন্মোচন করা হচ্ছে। কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্য খেরওয়াল গোষ্ঠী ও হিতমিতান গোষ্ঠীর মানুষজন 'Telepathy' গভীরভাবে অনুভব করে। যেমন- পা চুলকালে কেউ উক্ত ব্যক্তির নাম করা বা বাম চোখ নাচলে কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে।

৪। Pre-Cognition (পূর্বজ্ঞান) : সপ্তদশ শতাব্দীতে বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শব্দটি নিয়ে গবেষণা বিদেশে শুরু হয়েছিল। পাশ্চাত্যের মনোবিদরা এই পর্যায়কে 'Pseudo-Science' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৭৮ সালে ৩৭ শতাংশ আমেরিকানরা একে বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে এটি এক ধরণের বিজ্ঞান। ২০০৭ সালে

মহাবিদ্যালয়ের মহিলাদের উপর সমীক্ষা করে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে ও গভীরভাবে প্রমান করেছেন। কিন্তু Pre-Cognition জ্ঞান কুড়মি সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে বা মহিলাদের মধ্যে হাজার হাজার বছর আগের থেকে ব্যবহারিক বিদ্যার মাধ্যমে প্রয়োগ হয়ে আসছে। যেমন- হাত থেকে ঘটি পড়লে কুটুম আসার লক্ষণ প্রকাশ মহিলাদের ডান হাত কাঁপা বিপদের সংকেত বহন করে। মহিলাদের পায়ের মাঝে চুলকালে কোন জিনিস প্রাপ্তির সম্ভাবনা ইত্যাদি Pre-Cognition এর নমুনা বহন করে চলেছে। এছাড়া প্রাণীদের আচরণের মাধ্যমে Pre-Cognition বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জাগে। যেমন-কুকুর/বিড়ালের কাঁদা অমঙ্গলের সূচনা, রাতে মোরগের ডাক অমঙ্গল, ঘরের চালে জোড়া শালিক শুভ, ঘরের উঠানে কাক ডাক আত্মীয় স্বজন আসার ইঙ্গিতবাহী, ভোরবেলায় মোরগ ডাকলে সকাল হওয়ার ইঙ্গিতবহন করে।

*** সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ :**

১। ক্রাস্টা বোনম্যান, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট, আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ (এন.আই.এইচ)।

নমুনা ঃ ৯ বছরের মেয়ে ও ১৯ বছরের তরুণীর চোখ বেঁধে প্রতিক্রিয়া লক্ষন।

২। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি- ব্রেনের মাঝে এসিবি (অ্যান্টিরিয়াল স্টিম্যুরিয়াল কর্টেক্স) বিদ্যমান।

৩। জাসন ব্রেথ ওয়েলট, ইউনিভার্সিটি অবক বার্মিংহাম

নমুনাঃ- ওবিই (আইটসাইড বডি এক্স পিরিয়েন্স থাকলে হাইপার এক্সাইটেবল)।

৪। রম্ভা বার। নমুনা ঃ- উইশ থিংকিং এর সাহায্যে চোখের দৃষ্টিশক্তি ও ওজন বৃদ্ধি।

মন্তব্য ঃ ১৯৩০ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন- “The only red Valuable thing is intution” মানুষের বুদ্ধি, মেধা, পরিশ্রম থাকলেও ইনটুউশন (সিক্স সেন্স) জরুরী যা একজনের সঙ্গে তার আর একজনের পার্থক্য সূচিত করেও সাফল্যের অধিকারী।

কুড়মি জাতি আদিম। তাদের সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা নিজস্ব পদ্ধতি ও প্রণালীর মাধ্যমে পরিচালিত। সুতরাং সুশৃঙ্খলভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থা আবর্তিত করার জন্য ঘরবাড়ী, কৃষিকাজ, জলসেচ, তেল নিষ্কাশন, ধান চাল ভাঙ্গা, জল /রোদ নিবারণ, শীত নিবারণ, খাবার আসবাবপত্র, মাছ শিকারের প্রযুক্তি, জীবজন্তু ও পাখি রাখার জায়গা প্রভৃতির উদ্ভাবন করেছেন। কুড়মালি ভাষায় একটি জানকহনি আছে যে—

“ঘার গেলে মঁই কনাঁই ঠেসঁ”

উত্তরটি হবে ঠেঁগা। ঠেঁগা দৈনন্দিন জীবনে জীবজন্তুকে মারার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এক অকটি বিষয়ের জন্য কুড়মি জাতি এক একটি প্রযুক্তির সৃষ্টি করেছে। নিম্নলিখিতভাবে সেগুলি উল্লিখিত হল:—

১। গৃহস্থালীর প্রযুক্তি :- তরাইল, ছাউনি, ভাগটান, মুধইন, নাইগল, বুকপাইড়, ছাঁচপাইড়, রলা, টুই, হাঁসকল, ডুমনি, ছাঁচা, কপাট, খাট, টপনা, টানগা, সিঁড়ি, সগড়গড়ি সিনদুক, বিংড়া, পিঁড়হা, সিঁকা, হাঁসুআ, থলি(সুতরি শনের), সাবল, গাঁতি, কদাইল, কহিসতা, কাটারি, কুড়হার, টাঁগি, ছরা, চামচ (বাঁশের তৈরী), বাঁশি(বাঁশির তৈরী), ভেঁপু (তাল পাতার তৈরী), কাঁড়, কাঁড়বাশ, মাচা (বসার/ঘুমাবার), ঠেরা, চাকি, জাটা (খুঁচি/সর/বেনা/বইরালি উঁগা, দিয়ে তৈরী), কাঁইড়া, তেল কাঁইড়া, কাঁকই, পালখি, কুলা, সাহার খখড়া, তালাই/চাটাই বঠিন, ঠেকা, ছাকনা, টুপা, ডালা, ঝড়া ইত্যাদি।

২। কৃষিকাজের প্রযুক্তি :- হাল, মই, জুঁআল, ইস, আঁদ, জালি/মুখাড়, জুহা, সারিসুগা, পাই, চাখা, চিপাখাড়ি, পাটা(ধান ঝাড়ার), পুড়া, করই, গুজি মরাই, ডেলি, ঝাঁপি, কুঁচড়ি, মাচা, বাঁক, পইনা/সাইটকা/চাবকা, হুপডাং (মাটি সমতল), দন, বাইন, হাঁড়া, গউজ, জরকা, ঠরকা, আঁকুড়সি, তাড়া (ধানের গাড়ির উপরে চাপা দেওয়ার) ইত্যাদি।

৩) জলসেচের প্রযুক্তি :- কুঁআ, টেঁড়া, সিমনি, ইঁদারা, মাদিগাঢ়া, ডবকা, উঁগাসিনি ইত্যাদি।

৪) তেল নিষ্কাযন ও ডাল ভাঙ্গা প্রযুক্তি:- ঘানি (তেল), জাঁতা (ডাল)।

৫) জল নিবারণ প্রযুক্তি :- ঘঙ (জল আটকানো), বাঁশের ছাতা (রোদ ও জল)

৬) শীত নিবারণ প্রযুক্তি :- কাঁথা (গায়ে) ও কানপাগড়ি (কানে)।

৭) ধান-চাল ভাঙ্গা প্রযুক্তি :- উখইল (উদুখল), ঢেঁকি, পাথর রগড়ান, ডাঁং ছেঁচো।

৮) খাবারের প্রযুক্তি :- পাথরের থালা, পাথরের বাটি, জল রাখার মাটির হাঁড়ি, কলসি, পাথরের জামবাটি।

৯) মাছ শিকার প্রযুক্তি :- বঁড়সি, ছাঁকি জাল, চাপ জাল, চট জাল, পাটা, ঘুনি, খালই।

১০) জীবজন্তু ও পাখি রাখার প্রযুক্তি :- গহাল/গুহাল, খঁহাড়, টঁঙ, খাঁচা, পিঁজরা ইত্যাদি।

১১) গাছপালা বৃদ্ধির প্রযুক্তি :- মাচা, ঝাঁক ইত্যাদি।

১২) পরিমাপের প্রযুক্তি :- দসান (তেল), মান, সের, পাই, কনা, চৌঠি(চাল/ধান), আগ ঠেকা (ধান ঝাড়ার পর পরিমাপ)।

১৩) গায়ে মাখা ও মুখ ধোওয়ার প্রযুক্তি :-মচড়া ফল (গায়ে মাখা), নিম দাতন, শাল দাতন, আঁকুড়া দাতন, বাবলা দাতন, সাদা/লাল ভেঁড়রা, লোহা জাংঘ।

১৪) ঘরের নজরদোষ থেকে রক্ষার প্রযুক্তি : সাদা/লাল ভেঁড়রা।

১৫) মাচার উপর গাছপালার নজরদোষ থেকে রক্ষার প্রযুক্তি : চাটুমনসার কাঁটা।

কুড়মালি সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে। কুড়মালি সংস্কৃতির কথা আলোচনা করলে বিজ্ঞান যেন সহোদর ভাই অর্থাৎ কুড়মালি যাই প্রযুক্তিবিদ্যা হোক না কেন তাতে কিছুনা কিছু বিজ্ঞানের ছোঁয়া থাকে। সংস্কৃতি মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পারিক আলাপচারিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, উদারচেতা, উন্নত রুচি ও চিন্তামনস্কতা, মানবিকতা, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা প্রভৃতি প্রকাশ করতে সহায়তা করে। কুড়মালি সংস্কৃতি এমন একটি খেরওয়াল গোষ্ঠীর উপাদান যে তার কথা আলোচনা করতে গেলে কুড়মালি ভাষা ও সারনা ধরম (সত্য ধর্ম/প্রকৃতির ধর্ম) আলোচনা প্রসঙ্গে এসে যায়। কুড়মালি ভাষা,সংস্কৃতি ও ধরম তিনটি উপাদান ত্রিভুজাকৃতিভাবে সংযুক্ত। আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভরশীল হলেও মানুষের অন্তরের ব্যাপকতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করতে সাংস্কৃতিক উপাদান বিশেষভাবে সহায়ক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে যেখানে যান্ত্রিক বা জড়বাদের জন্ম দেয়; সংস্কৃতি সেখানে কুড়মি তথা আপামর জনসাধারণকে সামাজিক আদর্শের পথ ধরে ভাববাদের জন্ম দেয়। সংস্কৃতি মনকে বিস্তারের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু পক্ষান্তরে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মনকে গবেষণামুখী ও গতিশীল করলেও সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। পরিশেষে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কুড়মালি সংস্কৃতির অবদানে বলা হয় যে, মন যত গভীর ও উচ্চ চিন্তাধারা তত উন্নতও উর্ধ্বমুখী অর্থাৎ উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা ভাবতে গেলে তার খাবার দিতে হবে। সংস্কৃতি মনে ঘনীভবন ঘটিয়ে একটি সুউচ্চতায় মনকে নিয়ে গিয়ে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। আজকের যে আই.আই.টি., পলিটেকনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স তা সমাজজীবনের উপর প্রায়োগিক হতে হতে এক উচ্চ চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করেছে। একথা স্বীকার্য যে, আমরা বর্তমান জীবনে বাঁচার জন্য অনেক কিছু কৌশল অতীত থেকে বা আদিম জাতির জীবনধারার প্রযুক্তি থেকে ধার করেছি।

* তথ্যসূত্র :

১। মাহাত বঙ্কিমচন্দ্র (২০০০), ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য, বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কোলকাতা-৭০০০০০।

২। মাহাত অনাদিনাথ (২০১৩), কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস, পুরুলিয়া,

পিন- ৭২৩১৩৬।
৩। মাহাত ভরতচন্দ্র (২০০১), আদিম ভারতীয় সারনাথানী ধর্মশাস্ত্র স্টার প্রিন্টিং প্রেস, ২১/এ রাধানাথ বোস লেন, কোলকাতা-৬।
৪। মাহাত সঞ্জীব (২০১৪), কুড়মালি সংস্কৃতি ও সারনা ধর্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক সমাজের উপর প্রভাব কল্যানী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
৫। মাহাত উপেন্দ্রনাথ (২০০৭), কুড়চি ফুল, আশুতোষ অফসেট, প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চাঁইবাসা, পুরুলিয়া।
৬। মাহাত কিরীটি (২০১৫), জাউআ ডালি, বি.টি, সরকার রউড, মিউনিসিপাল কমপ্লেক্স, পুরুলিয়া।
৭। পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজ (২০১৬), কুড়মি জাতি নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি ও সামাজিক আন্দোলনের রূপরেখা।
৮। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তি (২০১২), তন্ত্রই সাধনা সাধনাই তন্ত্র, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর, কোলকাতা-৭০০০১০০০।
৯। শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার (২০১১), পথ চলতে ইতিকথা (প্রথম খন্ড), আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর, কোলকাতা-৭০০১০০।
১০। শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার (২০১৮), পথ চলতে ইতিকথা (দ্বিতীয় খন্ড), আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ, ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর, কলকাতা-৭০০১০০।
১১। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তি (২০১৩), নমঃ শিবায় শান্তায়, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর, কলকাতা-৭০০১০০।
১২। সগড় পত্রিকা (২৫,২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫)।
১৩। সাপ্তাহিক বর্তমান (২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮)।
১৪। শক্তিপদ বঁসরিআর, যুধিষ্ঠির মাহাত ও আনন্দ খুঁটদার প্রভৃতির সাক্ষাৎকাল (গৌণসূত্র)।
১৫। সেন অতুল চন্দ্র, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (২০০০), উপনিষদ হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭।
১৬। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (২০১৪), পূণ্যপুঁথি, নব প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৬, প্রেস স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০০৬।
১৭। CERN সংক্রান্ত তথ্য সমূহ- ওয়েবসাইট।
১৮। ড. পাল দেবাশিষ, ড. ধর দেবাশি, ড. দাশ মধুমিতা, ড. ব্যানার্জী পারমিতা (২০১৫), পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা-৭০০০০৯।
১৯। সাপ্তাহিক বর্তমান (২৫ আগষ্ট, ২০১৮, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ও ১লা জুন, ২০১৯)।
২০। মাহাত কিরীটি (২০১৩), ঝুমুর ও চর্যাপদ, কালী প্রেস, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা।
২১। গুহ, দাশগুপ্ত, সাঁতরা (২০০২), জীববিদ্যা, মৌলিক লাইব্রেরী, ১৮ বি. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০৭৩।
২২। প্যারাসাইকোলজি ও ই.এস.পি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ- ওয়েবসাইট।



প্রসঙ্গ : সাঁওতালি-কুড়মালি বিবাহ

মনশ্রী মাহাত

ভাষার ভিত্তিতে কিংবা নৃতাত্ত্বিক বিচারে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক পরিবারভুক্ত। কিন্তু কুড়মি জনগোষ্ঠীর আদিবাসী অস্তিত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলেও এরা দ্রাবিড়িয়ান,নাকি অস্ট্রিক পরিবারভূক্ত এবিষয়ে পন্ডিতরা আজও একমত হতে পারেননি। একইসঙ্গে কুড়মালি ভাষা অস্ট্রিক, নাকি দ্রাবিড়িয়ান ভাষা পরিবারের, সেবিষয়েও পন্ডিতদের মধ্যে ঐক্যমত নেই।

তবে সাধারণভাবে সবাই একটা বিষয়ে একমত যে কুড়মি জনগোষ্ঠীর সামাজিক আইন, ধর্ম, ভাষা এবং যে সাংস্কৃতির পরিচয় এখনও বর্তমান, তাতে তাদের আদিম অস্তিত্ব নিয়ে কোন সংশয় নেই। স্মরনাতীত কাল থেকেই তারা ট্রাইব বা আদিবাসীচ। ১৯০১ সালে একজন বিচারকের ভাষায়, “Tribel Custom is definite and time from immemorial.”

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমাজ, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং যেসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রচুর স্মৃতি নির্ভর গীতের কথা আমরা প্রথম লিখিতভাবে পাই, এল-ও-স্ক্রেফসরুড, পি-ও বোডিং, জি-এ গ্রিয়ারসন, এইচ রিজলে সহ বেশ কিছু ইংরেজ গবেষক প্রশাসকের সংগ্রহ থেকে। স্ক্রেফ্‌সরুড ১৮৮৭ সালে রোমান হরফে ‘হড়কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা’ নামে সাঁওতালি ভাষায় যে পুস্তকটি প্রকাশ করেন, তা ছিল কোলেয়ান হাড়াম নামে সাঁওতাল সমাজের এক প্রবীণ জ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। তিনি কোলেয়ার হাড়ামের স্মৃতি, শ্রুতি এবং ভাষা থেকে যা যা সংগ্রহ করেছিলেন, সবই পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। যা কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি বলে বহু চর্চিত এবং সুপরিচিত।

সাঁওতাল সমাজের বর্তমান যে জীবনচর্চা আমরা লক্ষ্য করি, তার

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দিকগুলির রীতি রেওয়াজ কিংবা গীতগুলির কথা সেই কালে কোলেয়ান হাড়াম যেমন বলেছিলেন, দেখা যাচ্ছে, তার প্রায় সবই এখনও অনুসৃত হচ্ছে সাঁওতাল সমাজে। এজন্য কোলেয়ান হাড়ামকে কিন্তু ধর্মগুরু সাজতে হয়নি বা সামাজিকস্তরে সামাজিক আইন প্রবর্তনের জন্য সংগঠন গড়ে আন্দোলনও করতে হয়নি। কোলেয়ান হাড়াম তাঁর স্মৃতি এবং শ্রুতি থেকে যা জানতেন তাই L.O. Skrefsroud- এর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং Skrefsroud তা যথাযথ লিপিবদ্ধ করে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন। ঠিক এই কারণেই সাঁওতাল সমাজ কোলেয়ান হাড়ামের উক্তিকে শিরোধার্য করে মান্যতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, স্মৃতি, শ্রুতি এবং ভাষা যেহেতু ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান, সেজন্য কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি বর্তমান এবং আগামী দিনের কৌতুহলী, গবেষক, ইতিহাসকার সবার কাছে মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান।

এই প্রেক্ষিতে কুড়মি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ইতিহাসটি ভেবে দেখার মত। খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাস বলতে গিয়ে কোলেয়ান হাড়াম বলেছেন, " Up to Champa, we and the Mundas, the Birhor, the Kurmbis and other were called by the name of Karwar."[2] কোলেয়ান হাড়াম আরও বলেছেন, "In Champa they sojourleed many genarations and the present instiotion of the tribe were formed."[3]।

প্রশ্ন হল, এই খেরোয়াল গোষ্ঠীর মধ্যে কোলেয়ান হাড়াম কুড়মিদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করে 'others' কথাটা ব্যবহার করেছেন। তাহলে বাকিরা কারা? ইতিহাস গবেষক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে লিখেছেন, "ভাষার বৈশিষ্ট্য ধরে বিচার করলে দেখা যায়, নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলি একসময় খেরোয়াল জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল— (১) অসুর, (২) মুন্ডা, (৩) সাঁওতাল, (৪) হো বা লাড়কা কোল, (৫) বিরহড়, (৬) খাড়িয়া বা খেড়িয়া, (৭) শবর, (৮) কোরওয়া, (৯) কোড়া বা কোডা, (১০) করকু, (১১) করমালি বা কলহে, (১২) মাহালি বা মাহলি, (১৩) ভূমিজ, (১৪) গদব, (১৫) তুরি, (১৬) কুড়মি এবং (১৭) জুয়াং।"[4]

সাঁওতালি পুরাণ কথায় খেরোয়াল গোষ্ঠীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক মঙ্গল চন্দ্র সরেন লিখেছেন, "সেদায় মিৎ হড়ে বার এরা লেনা। কুঁড়বি আর মুন্ডা, আর ছুটকি হপনগে (১) হড় (২) মাহালে (৩) কড়া (৪) দেশওয়ালি (৫) বিরহড়। উনকু বাত মিৎ ঠেন গেক তাঁহেকানা, মিৎ ঠেন গেক বঁগাঃআ।' ভাষতাত্ত্বিক Sir G.A. Grierson- ও খেরোয়াল জনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "All

these tribes are aconding to santal tradition descended from the same stock and were once known as Kharwars or Kherwars."[6]

পৃথিবীর বর্তমান ভৌগোলিক মানচিত্রে তখনকার চাম্পা বা চাই-চাম্পা দেশটির অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল, তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেননা তার কোনও লিখিত ইতিহাস নেই কিংবা প্রামান্য কোনও তথ্য বা কোনও প্রামানিক উপাদান আজো আবিস্কৃত হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে স্মৃতি, শ্রুতি এবং ভাষা নির্ভরতা যেমন ইতিহাসকারদের কাছে একমাত্র ভরসা, তেমনি খেরোয়ালদের ইতিহাসও ওই কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি নির্ভর। J. Troisi- র ভাষায় " The santal have no recorded history and one of them told me 'the mouth is our printed book.' Like other human beings, they have tried to explain the mystrics of creations, history and life by means of myths and legends. The needs which santal folktales, like other folklore, serve are very important sanction to tribel custom. They emphasis standards and asert values and above all, they create solidarity and inspire Confidence."

তাহলে কুড়মি জনগোষ্ঠীর স্মৃতি, শ্রুতি এবং ভাষার মধ্যে তাদের প্রাচীন ইতিহাস হাতড়ে বেড়ানোর সঙ্গে 'কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি' কে যুক্ত করে মান্যতা দিতে কুড়মি জনগোষ্ঠীর অসুবিধা কোথায়? কোলেয়ান হাড়াম তো স্পষ্ট ভাষায় কুড়মি জাতিকে খেরোয়াল জনগোষ্ঠীর অন্যতম শরিক হিসেবে উল্লেখ করে গেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে, ছোট্ট একটি শব্দবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হল KHOJ-KAMAN (খজ কামান)। P.O. Bodding সাঁওতালদের মাইগ্রেশান প্রসঙ্গে। L.O.Skefsroud- এর ইংরেজি অনুবাদে লিখেছেন, "From Hihiri pipiri they went to Hohoro Bomboro; from there to Ayare payare, then to Jhal dak (Long water); from there to Dudumul, and then to Aere Kalnde: from there to Haradata and then to Khoj Kaman...and through Tore pokhori Baha Bandele to Cal-champa."[৮] এই চাই-চাম্পা পর্যন্ত খেরোয়াল জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে,সাঁওতাল-কুড়মি একসঙ্গে ছিল। একসঙ্গে বসবাস করত, একই ধর্ম অনুসরণ করত। তারপর এখানেই তারা আর্য্য আক্রমনে পরাজিত হয়ে আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এবারে 'খজ কামান' প্রসঙ্গে আসা যাক। P.O. Bodding লিখেছেন, "Living there mankind

became very bad, they became like buffaloes and buffalo-cows, they did not respect each other. Seeing all theis THAKUR became very angry and he firmly made up his mind to destroy mankind, if they did not return to his. So he called them to come: 'Come mankind, come back to me.' But they did not need his word. Therefore Thakur call to him whether it was pilchu haram and pilchu budhi or another holy pair and said to them; 'Mankind does not listen to my word; therefore I will make an end of them. But you to go into the cave in the Harata mountain, there you two will be saved.'

These Two listened to (obeyed) Thakurs's word. They went into the mountain cave. When they had gone in there, for seven days and seven nights Thakur let fire-rain (some guru's says, Sky rain) stream down from the sky and destroyed mankind and animals.everyone of them, only the two who were in Harata mountain cave were saved and left alive."[9]

অর্থাৎ, 'খজ কামান'-এ এসে পিলচু হাড়াম-পিলচু বুড়ি ছাড়া মানব সমাজের মৃত্যু হয়েছিল। এইক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়টি হল, এখনও কুড়মি সমাজের কারও মৃত্যু হলে যে অশৌচ পালন এবং পারলৌকিক ক্রিয়ার শ্রদ্ধানুষ্ঠান হয়, তাকে 'কাজ কামান' বলে। স্পষ্টতই, কাজ-ঘর, কামান-ঘর, কামান খাওয়া শব্দগুলি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়। বিশেবত, 'খজ-কামান' শব্দ থেকেই কুড়মিদের 'কাজ-কামান' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা দৃঢ় হয় কাজ-কামান শব্দবন্ধটি খজ-কামানের মৃত্যুর স্মৃতিকেই জাগরূক রেখেছে আজও। কেননা, কুড়মিদের শ্রদ্ধানুষ্ঠান, মৃত পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর অর্থ, কুড়মি জনগোষ্ঠী খজ-কামান-এ খেরোয়াল তথা সাঁওতালদের সঙ্গে একসঙ্গেই অবস্থান করত এবং সেই প্রাকৃতির দুর্যোগে তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল। কুড়মিদের 'কাজ-কামান' সেই ঐতিহাসিক মৃত্যুরই স্মৃতি চারণা। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দূর্যোগে মৃত্যুকে 'অপঘাতে মৃত্যু' বলে ধরা হয়। খজ কামানে সাতদিন ধরে অগ্নিবর্ষণে মানবসমাজের মৃত্যু হয়েছিল। অর্থাৎ সেই ঘটনাও ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করেই কি কুড়মিরা আজও অপঘাতে মৃত্যুর শ্রদ্ধানুষ্ঠান করে সাতদিনে মধ্যে?

এই 'কাজ-কামান' শব্দবন্ধ এবং মৃত্যু সংস্কারটি আরও ইঙ্গিত দেয়, কুড়মি জনগোষ্ঠী আদিমানব গোষ্ঠীর এক অন্যতম প্রবহমান ধারা এবং সেক্ষেত্রে কোলেয়ান হাড়ামের উক্তি মত খজ-কামানের ইতিহাস তথা খেরোয়াল সমাজের ইতিহাস

কোনও গল্প কথা নয়।

(২)

এই ভাবনায় জারিত হয়েই কুড়মি এবং সাঁওতাল বিবাহ প্রথার মৌলিক দিকগুলি নিয়ে চর্চা করা যেতে পারে।

সারণী-ক

(সমাজ স্বীকৃত প্রথা)

সাঁওতালি	কুড়মালি
১। দেখাশোনার বিয়ে।	১। দেখাশোনার বিয়ে।
২। ভালবাসার বিয়ে।	২। ভালবাসার বিয়ে।
৩। জোরপূর্বক বিয়ে।	৩। জোরপূর্বক বিয়ে।
৪। ঘরজামাই বিয়ে।	৪। ঘর জামাই বিয়ে।
৫। বদল বিয়ে।	৫। বদল বিয়ে।
৬। সাঁঘা।	৬। সাঁঘা।
৭। ভাজ রাখা।	৭। ভাজ রাখ।
৮। বিধবা বিয়ে।	৮। বিধবা বিয়ে ইত্যাদি।

সারণী-খ

(সগুন মোতাবেক বিয়ে)

সাঁওতালি	কুড়মালি
১) আমবিহা।	১) আমবিহা।
২) মহুল বিহা।	২) মহুলবিহা।
৩) কদইল বিহা নেই।	৩) কদইল বিহা আছে।
৪) সাহড়া বিহা।	৪) সাহড়া বিহা।
৫) কুকুর বিহা।	৫) কুকুর বিহা। ইত্যাদি

সাঁওতালদের মত কুড়মি বিবাহ প্রথাতে বহুরকমের প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করা হয়। এগুলি উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সগুন বা নেগ নামে পরিচিত।যে কারণে কুড়মি বিবাহকে 'সরসগুনে বিহা' নামেও আখ্যা দেওয়া হয়।

দুটি ক্ষেত্রেই বিয়ের কোনও মন্ত্র নেই। গান-ই এর মন্ত্র। সেজন্য প্রতিটি সগুনেই ভিন্ন ভিন্ন গান এবং সে গান কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সগুনের ক্ষেত্রেই গাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সমস্ত গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। তবে কখনও এককভাবেও কেউ কেউ গেয়ে থাকে। মেয়েদের কণ্ঠে গীত এসব গানের সঙ্গে কোনও বাজনা থাকে না। তবে কুড়মি বিবাহে বরযাত্রীদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র থাকে। সানাই-ঢোল সহযোগে প্রচলিত বিবাহ গীতির সুর বাজে এক্ষেত্রে। কুড়মি বিবাহে সাম্প্রতিককালে বিয়ের গানে কোনও নাচ লক্ষ্য করা যায় না। তবে অনুমান, এরকম একটি আনন্দে অনুষ্ঠানকে ঘিরে সুদূর অতীতে নিশ্চিত নাচের অনুষ্ঠান হত। যেমনটি আজও রয়েছে সাঁওতাল সমাজের মধ্যে। সাঁওতালি বিবাহও সগুন অনুযায়ী বিস্তর গান গাওয়া হয় কিন্তু তখন বাজনার ব্যবহার নেই। তবে বিয়ে উপলক্ষে নারী পুরুষ নির্বিশেষে নাচ গানে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বেয়াই-বেয়ান সম্পর্কিতদের বিশেষ নাচ-গানের অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

সাঁওতালদের মত কুড়মি সমাজেও পণপ্রথার রীতি আছে তবে তা বরপণ নয়। কন্যাপণ। কন্যা চূড়ান্ত পছন্দ হলে কন্যাপক্ষকে পণ বাবদ তিন/পাঁচ/সাত টাকা দিয়ে বিয়ে নিশ্চিত করতে হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কন্যা পক্ষ কখনও বরপক্ষের বাড়ি গিয়ে প্রথমে বিয়ের প্রস্তাব দেয় না। মেয়ে পছন্দ হলে তখন ব রপক্ষ মেয়ে পক্ষকে 'বর দেখা'-র আমন্ত্রণ জানায়। রীতিটি মাতৃতান্ত্রিক আদিম রীতি, যা উভয় সমাজ আজও অনুসরণ করে।

সাঁওতাল এবং কুড়মি সমাজের বিবাহে কোনও মেয়ে বা ছেলের বাবা একক আলোচনায় বিয়ের সিদ্ধান্ত পাকা করে না। কনে দেখা বা বরদেখা থেকে শুরু করে বিয়ে সমস্ত নেগ-আচার, অনুষ্ঠান সংগঠিত করা বা রূপায়িত করা, সবক্ষেত্রে গাঁওলা/মড়ে হড় সহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না। ঘটনাটি সাঁওতাল কুড়মি জাতির দৃঢ় সামাজিক কাঠামোর অন্যতম দৃষ্টান্ত। সুখের কথা, এই প্রাচীন প্রথাটি আজও অনুসৃত হয় উভয় সমাজে।

সাম্প্রতিক সময়ে, বিয়েতে নিমন্ত্রণ করার রীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন

এসেছে। বর্তমানে ছাপানো রঙিন কার্ডে মার্জিত ভাষায় আত্মীয় কুটুম গ্রামবাসীদেব নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে প্রাচীন রীতিটি হল আমপাতায় মোড়া গোটা হলুদ, গোটা সুপারী, নিমন্ত্রিত বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বাহক বর-কনের পরিচিতি মুখে মুখে জানিয়ে দেয়। এই প্রথাটি সাঁওতাল সমাজে এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে কুড়মি সমাজে লুপ্তপ্রায়। সাঁওতাল-কুড়মি বিবাহ প্রথায় বোন-ভগ্নিপতির সম্মান সর্বাধিক। সেজন্য নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবারের মালিক এবং বোন-ভগ্নিপতির জন্য আলাদা আলাদা নিমন্ত্রণ পত্র কিংবা সুপারী দেওয়া হয়। এখনও এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে, যেখানে বোন-ভগ্নিপতীর জন্য(একান্নবর্তী পরিবারে থাকলেও) আলাদা নিমন্ত্রন না থাকলে বোন-ভগ্নিপতি সেই বিয়েতে অনুপস্থিত থাকে। ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্রে এবং 'পাওনা' হিসেবে যে নতুন কাপড় দেওয়া হয় তাতে কুড়মি বিবাহে হলুদ লাগিয়ে দেওয়া হয়। অনুমান, সাঁওতালদের মতই বিয়েতে হলুদ-ছাপানো নতুন কাপড় দেওয়ার রীতি কুড়মি সামজেও প্রচলিত ছিল।

শুধু তাই নয়, বিবাহ অনুষ্ঠানের সমস্ত আচার-রীতি বা সগুনগুলি অনুসরণের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উভয়সমাজে পুরুষদের কাজ হল, মেয়ে খোঁজা, পছন্দ করা, মতামত চুড়ান্ত করা, বিয়ের আয়োজন করা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা। অন্যান্য ক্ষেত্রে (সগুন অনুসরণ) পুরুষ গুরুত্বহীন। তবে এক্ষেত্রে বিধবাদের কোন স্থান নেই। যা করণীয়, সবকিছুই করে সধবা এবং কুমারী মেয়েরা।

সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, সাঁওতাল-কুড়মি সমাজে সগুন প্রথা মেনে 'আম-মহুল' বিয়ের প্রচলন সর্বাধিক। তবে সবকটি বিয়ে (সারণী-ক,খ) সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত।

সর-সগুনে, অর্থাৎ হরেক রীতি-আচারের বেড়াজালে এই যে বিবাহ প্রথা, তার মধ্যে প্রধান আচারগুলি হল,-ধরম সগুন বা ধরমসাগুন গনন গাঁথন বা গনপণ, দুয়ার মাড়া বা দুয়ার লেবেদ, টাকা বস্যা বা টাকা চাল ছামড়া বাঁধা বা ছামড়া তল, মাড়ুয়া পূজা বা মাডওয়া বঁগা, তেল, হলুদ বা সুনুম সাসাং, আমবিহা বা উলদারে বাপলা, মহুল বিহা বা মাতকম দারে বাপলা, আভড়া ভাত বা আভড়া জম, সালাধুতি বা সালা বহনয়, সিঁদরা দান বা ইতুদ সিঁদুর, চুমান বা বাঁদাপন এবং বর রুসান, সংছাড়ান, ননদ রুসান, খঁচল ঝাড়া, দুয়ার ছেঁকা, কনিআ রুসান, বর কন্যা সিনান, আমপাতা বদল, জাঁতি লুকা, ঘটি লুকা, বাঁদাপণ, পা ধুআন, খাঁকড়ি ধরা, বঁহরতা, বেহাইন দেখা ইত্যাদি। সর-সগুনের এই প্রথাগুলি অত্যন্ত প্রাচীন এবং উভয় সমাজের মানুষ আজও অনুসরণ করে।

অন্যদিকে, বরযাত্রী যখন বিয়ের পর বর-কনে নিয়ে বরের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, সেসময় সাঁওতাল-কুড়মি উভয় সমাজের গ্রামবাসীরা তাদের আটক করে। গ্রামবাসীদের সম্মানার্থে এসময় আর্থিক দন্ড বা পাওনা দিতে হয় গ্রামবাসীকে। প্রথাটি অত্যন্ত প্রাচীন। সম্ভবত সুদুর অতীতে গ্রামের মেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জরিমানা দিতে হত। এই প্রথাটিই কালক্রমে 'পাওনা'হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে আজ। একইরকমভাবে,বরের বাড়ির যাত্রাপথে কোন গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় বর-কনের গাড়ি ঘিরে ফেলে গ্রামবাসীরা। এখানে বর-কনেকে গাড়ি থেকে নামিয়ে গুড়-জল বা মিষ্টি বা গুড় চিড়ে খাওয়ানো হয়। কুড়মি সমাজে এখনও কোথাও কোথাও গান গাওয়া হয় এসময়। সম্ভবত অতীতে নাচও হত। তবে বর্তমানে নাচ-গান দুটিই লুপ্ত প্রায়। সাঁওতাল সমাজে ওই দুটি প্রথা এখনও জীবিত এবং প্রাণবন্ত। বর-কনেকে নাচ-গান সহ চিড়ে গুড় খাওয়ানো অত্যন্ত আকর্যনীয় অনুষ্ঠান ভিন্ন গ্রামবাসীর। মনে করা হয়, শ্বশুর বাড়ি যাতায়াতের পথে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় হল। এজন্যই গুড়-জল বা চিড়ে গুড় খাইয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয় এবং বর-কনেকে শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ জানানো হয়। মনে রাখতে হবে, গুড় জল খাওয়ানোর আগে সাঁওতাল সমাজের মানুষ গাড়ি থেকে কোলে চাপিয়ে বর-কনেকে পরিস্কার চাটাই পেতে তার ওপর বসায়। তারপর বর-কনের পা ধোয়ায়। এরপর মিষ্টিমুখ করানো হয়। জল খাওয়ার পর সেই ভিন্ন গ্রামের অচেনা এক বধূ তার আঁচল দিয়ে বর-কনের মুখ মুছে দেয়। এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আন্তরিক এবং হৃদয়গ্রাহী। এক অপরিচিত নব-দম্পতিকে এভাবে হৃদয় দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর রীতি পৃথিবীর আর কোন্ সমাজে আছে কে জানে! গুড়-জল খাওয়ানোর পর বরযাত্রীদের বাজনা এবং অচেনা গ্রামের মহিলারা মিলেমিশে বর-কনেকে ঘিরে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় নাচ-গানের মাধ্যমে। এই দৃশ্যও বিরলতম এবং নিঃসন্দেহে হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তবে বিশেষ কিছু আচার-রীতি দুটি সমাজের এক নয়। যেমন, কুড়মি বিবাহে বড়ি পাড়া, থুভড়া সিনান, লগন, সিনই বাঁধা, কাঁকন বাঁধা, গুআটিকা, ছামানি, এগুলি সাঁওতাল বিবাহে দেখা যায় না। পাশাপাশি কুড়মি সমাজের বেহাই দেখা এককভাবে দুই বেহাই-এর মধ্যে, কিন্তু সাঁওতালদের বেহাই দেখা স্বামী-স্ত্রীর জোড়ে ছাড়া হয় না। এক্ষেত্রে সম্পর্কিত বেয়াই-বেয়ানদের জোড়ে উপস্থিতি দরকার এবং বেয়াই -বেয়ানদের জোড়ে যে নাচ-গানের অনুষ্ঠানটি হয়, অত্যন্ত আকর্যনীয়। যা

'বালায়া এনেচ্' নামে পরিচিত। কুড়মিদের এই অনুষ্ঠানটি নেই। সাঁওতালি বিবাহে 'বরসিনান' সগুনটি ঠাকুরজি, অর্থাৎ কনের দিদি করায়, কিন্তু কুড়মিদের ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্টভাবে ভগ্নিপতিদের অধিকার। কুড়মি বিবাহে বর-কনেকে আলতা পরানোর জন্য নাপিত নির্দিষ্ট, কিন্তু সাঁওতাল বিবাহে তা নেই। সাঁওতালি বিবাহে নিকট আত্মীয়দের হলুদ-গোলা জলে হলুদ রঙের নতুন কাপড় সম্মানজনক 'পাওনা'। পাশাপাশি কুড়মি বিবাহেও নতুন কাপড় দেওয়ার নিয়ম, তবে এখন আর হলুদ জলে রাঙানো হয় না। হলুদ লাগানো নিমন্ত্রণ পত্র, নতুন কাপড়ের কোনায় হলুদ লাগিয়ে দেওয়া হয়। কুড়মিদের পরিবর্তিত প্রথাটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে সাঁওতালদের মতই একসময় হলুদে রাঙানো কাপড় দেওয়ার প্রচলন ছিল।

উল্লেখ করতেই হয়। কুড়মি বিবাহের এসব মূল আচার বা সগুনগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণের কোনও সম্পর্ক আগেও ছিল না এবং এখন নেই। এক্ষেত্রে, বোন ভগ্নিপতি, বৌদি, কাকিমা এবং নাপিত-ধোপাদেরই মুখ্য ভূমিকা আছে। এমনকি আশীবার্দ সূচক 'বাঁদাপণ' সগুনটিতে কেবলমাত্র মহিলাদেরই 'চুমান' এর অধিকার রয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরুষরা 'চুমান'-এ অংশ নিলেও তা মহিলাদের বিশেষ অনুমতি ছাড়া হয়নি।

হিন্দু ধর্মের প্রভাবে কোনও কোনও এলাকায় কুড়মি বিবাহ প্রথায় ব্রাহ্মণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বটে, তবে নিবিড় অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখনও কুড়মি বিবাহে প্রাচীন প্রথাগুলি সর্বত্রই সঠিকভাবে অনুসৃত হয়। বিয়ে সংক্রান্ত বিভিন্ন কুড়মি সগুন বা ক্রিয়া পদ্ধতির ফাঁকে ফাঁকে ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহেশ্বর ইত্যাদি হিন্দুদেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নমস্কার-প্রণাম জানায় সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে। অর্থাৎ, মূল বিয়ের অনুষ্ঠান হয় কুড়মি প্রথা মেনেই। উদাহরণ হিসেবে, আমবিহা, মহুলবিহা, সিনই, কাঁকন, গুআটিকা, সালাধুতি, বিহাই-বজড়, ডুভাবদল, বাঁদাপণ, সিঁদুরঘষা, আমপাত বদল ইত্যাদি ইত্যাদি সগুনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা আজও নাক গলাতে পারেনি। কিন্তু এসবই হল কুড়মি বিবাহে প্রাচীন সগুন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়, কুড়মি বিবাহে মন্ত্রের কোন স্থান নেই। গান আর সগুন-ই এর মন্ত্র। যেখানে হিন্দু বিবাহে সংস্কৃত মন্ত্র বাধ্যতামূলক।

পাশাপাশি, সাঁওতালি বিবাহে ব্রাহ্মণের অনপ্রবেশ ঘটেনি বলে বিবাহের মূল প্রথাগুলি শিরোধার্য্য করে তাদের সামাজিক বিয়ে আজও অ-বিকৃত অবস্থায় টিকে আছে। বিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক আইন-কানুনের ক্ষেত্রে সাঁওতাল-কুড়মি

সমাজের নীতিগুলি একইরকম এবং অবিকৃত রয়েছে। যেমন—

সারণী-গ
(বিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক আইন)

সাঁওতালি	কুড়মালি
১) একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।	১) একই গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।
২) দ্বিতীয় বিবাহ শর্তসাপেক্ষ।	২) দ্বিতীয় বিবাহ শর্তসাপেক্ষ।
৩) বিধবা বিবাহ বৈধ।	৩) বিধবা বিবাহ বৈধ।
৪) বড় ভাই-এর অবর্তমানে ছোট ভাই বৌদির সংসার পাততে পারে। ঔরসজাত সন্তানও সামাজিকভাবেবৈধ। সম্পত্তির অধিকারও আছে।	৪) বড় ভাই অবর্তমানে ছোট ভাই বৌদির সঙ্গে সংসার পাততে পারে। ঔরসজাত সন্তান বৈধ। সম্পত্তির অধিকার আছে।
৫) রক্ত সম্পর্কিত বোন, ভাইজি, ভাগ্নী এবং মাতুল বংশে বিবাহ নিষিদ্ধ।	৫) রক্ত সম্পর্কিত বোন,ভাইজি, ভাগ্নী এবং মাতুল বংশে বিবাহ নিষিদ্ধ।
৬) ভিন্ন জাতিতে বিবাহ সমাজ অনুমোদন করে না।	৬) ভিন্ন জাতিতে বিবাহ সমাজ অনুমোদন করে না।
৭) ভাদ্র-পৌষ-চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ।	৭) ভাদ্র-পৌষ-চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ।
৮) আদালত ছাড়াও আলোচনা সাপেক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিকভাবে স্বীকৃত।	৮) আদালত ছাড়াও আলোচনা সাপেক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিকভাবে স্বীকৃত।
৯) কন্যাপণ সমাজ স্বীকৃত, কিন্তু বরপণ সমাজ অনুমোদন করে না।	৯) কন্যাপণ সামাজিক। বরপণ সমাজ

অনুমোদন করেনা।

১০) হিন্দু বিবাহ আইন-১৯৯৫(শেষ সংশোধন, ২০০৩), সাঁওতালি বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আইনে বলা আছে, তফসিলি জনজাতির বিয়ে তাদের নিজস্ব প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী হয়।

১০) কুড়মিরা তফসিলি জনজাতি তালিকাভূক্ত না থাকায় হিন্দু বিবাহ আইন প্রযোজ্য।

পরিশেষে বলা যায়, সাঁওতাল-কুড়মিদের বিবাহ বিষয়ক সর-সগুন তথা সামাজিক আইনগুলির সাংবিধানিক আইনি স্বীকৃতি নেই। আইনি স্বীকৃতি না থাকায় সাঁওতাল-কুড়মি ছাড়াও অন্যান্য খেরোয়াল গোষ্ঠীগুলির বিবাহ প্রথাতে প্রচুর হিন্দু সামাজিক আগ্রাসন ঘটছে। কুড়মি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বরপণ প্রথা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ যার অন্যতম উদাহরণ। দেশের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম খেরোয়াল জনগোষ্ঠী বিভাজনের যাঁতাকলে চরম সংকটে পড়ে আজ অস্তিত্বলোপের মুখে। এই পরিস্থিতিতে প্রাচীনতম খেরোয়াল জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে হলে সর্বসম্মত Kherowal Customary Law যেমন জরুরী, তেমনি Kherowal Marriage Act., Kherowal Succession সহ খেরোয়ালী ভাষাগুলির সুরক্ষাও অত্যন্ত জরুরী।

—ঋণ স্বীকার —

১। Ruhi Mahato and others Vs Haradhan Mukhopadhyay and others Title suit No. 70 of 1909, Midnapur Judge Court.
২। Tribes and Castes of Bengal-H Risley
৩। বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক বৈদিক প্রভাব— ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
৪। জমসিম বিন্তি লিটা- মঙ্গল চন্দ্র সরেন
৫। Linguistic Survey of India- G.A. Grierson, Vol-iv, page-21
৬। হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কথা-P.O. Bodding (English versoion from L.O. Skrefsroud)
৭। ডঃ বিভূতি ভূষণ মাহাত- গ্রাম ও পোঃ- ধূমসাই, পশ্চিম মেদিনীপুর।
৮। শ্রীমতী চপলা মাহাত- গ্রাম: জড়াআম, পোঃ- ভাভারু, জেলা-পূর্ব সিংভূম

ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় তার সময়কাল ৮-১০ হাজার বছর প্রাচীন বলে দাবী করা হচ্ছে। প্রত্নবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ যাকে সিন্ধুঘাটি সভ্যতা বা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে চিহ্নিত ও অভিহীত করেছেন। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষকদের পক্ষ থেকেও দাবী উঠেছে কুড়মি ও সাঁওতাল জাতির মানুষ সরাসরি এই সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে নাকি যুক্ত ছিল।



মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি